বসবাস

প্রবোধকুমার সান্যাল

সাহিত্য সংস্থা
১৪এ, টেমার লেন, কলিকাতা-৯

প্রকাশক
রণধীর পাল
১৪এ, টেমার লেন
কলিকাতা-৯

প্রথম সংস্করণ
৭ই জুলাই, ১৯৬৪

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু

মুদ্রক
কমল মিত্র
নব মুদ্রণ
১বি, রাজা লেন
কলিকাতা-৯

হালকা নীল রঙের গাড়ি ধীরে ধীরে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। বাতাসে কৃষ্ণচূড়াব পাতা ঝিরিঝিরি কাঁপছে। মেঘলা আকাশ। আলোর আয়োজনে আজ বড় কৃপণতা। বহু দূরে, বহু দূরে একটা পাপিয়া করুণ সুরে ডেকে ডেকে সারা। বারান্দায় চেয়াবে বসে আছেন শিবপদ। স্থির। পাথরের মূর্তি। দমকা বাতাসে মাথার শুভ্র কেশ এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। অপসৃয়মাণ গাড়িটির দিকে একবার মাত্র তাকিয়েছিলেন। দৃষ্টি এই মুহূর্তে বস্তুজগতের কোথাও নেই। উদ্দেশ্যহীন, লক্ষ্যহীন পথের মত পড়ে আছে প্রাণীশূন্য প্রান্তরে। চোখ যেমন কিছু দেখছে না, মন তেমনি কিছু ভাবছে না। সাধনজগতে থাকলে শিবপদব এই অবস্থাকে বলা যেত সমাধি। বাড়ির পেছন দিকে ছিটকিনি খোলা একটা জানলা মাঝে মাঝে শব্দ করছে। নির্জন, নিস্তব্ধ বাড়িতে জানলাটিই এখন একমাত্র প্রাণী। বাতাসে দুলছে, শব্দ করছে। ধ্বনি তরঙ্গ ভেসে আসছে। বৃষ্টি আসছে। বিশাল বৃষ্টি। দক্ষিণ আকাশে কালো মেঘ ঘোঁট পাকাচ্ছে। সমুদ্রের নিম্নচাপ তেড়ে আসছে স্থলভাগের দিকে।

গেটের ছিটকিনি খোলার শব্দ হল। মৃদু সুরেলা। শিবপদ জানে কে আসছে। অন্যদিন হেঁকে বলতেন, আয়, কৃষ্ণ আয়। আজ নীরব। নিজেকে মনে হচ্ছে বাইরের সিঁড়িব পাশে পড়ে থাকা পরিত্যক্ত পাদুকার মত। সম্পূর্ণ পরাজিত এক যোদ্ধা। বাগানের পথ ধবে এগিযে আসছে আর এক বৃদ্ধ। বড় ভাই কৃষ্ণপদ। দীর্ঘদেহ। গৌর বর্ণ। পক্ব কেশ। দুপাশেব কাঁধ অবধি নেমে এসে পাঞ্জাবি স্পর্শ করেছে। বড় শৌখিন মানুষ। পরনে চওড়া পাড় দিশি ধুতি। সাদা, ফিনফিনে, ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি। পায়ে চটি। বয়েসের তুলনায় অনেক বেশি চঞ্চল। আসার পথে পাশের কাঞ্চন গাছ থেকে একটা ফুল সংগ্রহ করা হল। এইটাই তার নিত্যদিনেব অভ্যাস। ফুল সামনে রেখে কথা বলা।

কৃষ্ণপদ এখন ঘেরা বারান্দায়। শিবপদর পাশের শূন্য চেয়ারে ধীরে ধীরে উপবেশন। কৃষ্ণ জানে আজ শিবুর মনেব অবস্থা কেমন। দীর্ঘকালের একটা আয়োজন নিমেষে চুরমার হযে গেল। শিবপদ পূর্বের মতন স্থির। দৃষ্টি পড়ে আছে সামনে সমান্তরাল রেলপথের মতো। কৃষ্ণ হাতের ফুলটি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখছে। বড় কোমল। বিন্দু বিন্দু জলের স্পর্শ লেগেছে পাপড়িতে। মৃদু সুগন্ধ ভেসেছে বাতাসে। ফুলের নয়। প্রাতঃসন্ধ্যার সময় কৃষ্ণপদ সামান্য আতরের স্পর্শ লাগায় শরীরে। গুরুর নির্দেশ। মূল্যবান সুগন্ধি। সুগন্ধে মনের প্রসার হয়। পরিচ্ছন্নতায় পবিত্রতার ভাব আসে। অপুত্রক কৃষ্ণপদ। স্ত্রী উন্মাদিনী। কী হবে সঞ্চয়ে! কে ভোগ করবে! ডাকহরকরা আসার সময় হয়ে গেছে। প্রিয়তমের পত্র এল বলে।

ফুল নিরীক্ষণ বন্ধ করে কৃষ্ণ ভাইকে জিজ্ঞেস করল, 'চা খেয়েছিস? সকালের চা?'

ভাইয়ের দিকে না তাকিয়ে শিবপদ ঠোঁটের কোণে হাসির রেখা টেনে বললে, 'এখনও সুযোগ হয় নি।'

'খুব ভেঙে পড়েছিস?'

'তোর কী মনে হচ্ছে ?'

'একটু আহত হয়েছিস।'

'এমন কোনও যুদ্ধ আছে, যে যুদ্ধে মানুষ আহত হয় না!'

'তাহলে চায়েব ব্যবস্থা করি। তুই চা-খোর মনুষ, বেলা নটা প্রায় বাজল!'

'তোব অপেক্ষাতেই ছিলুম। এসে গেছিস, এবার জল বসানো যেতে পারে।'

'শেষ মুহূর্তে তোব বাধা দেওযা উচিত ছিল। রেগে যাসনি। একেবারে সব ফাঁকা হয়ে গেল। বেশি কষ্ট তোবই হবে। ওদেব বয়েস আছে। বেঁচে থাকার নেশা আছে। তোর কী আছে! নিজেব অহঙ্কারকে সামান্য খাটো করলে সংসাবটা এভাবে ভেঙে যেত না।'

শিবপদ ভাইযেব দিকে মুখ ঘোবাল, 'তুই কী বলতে চাস ? যে কখনও ভাগ্যের পায়ে ধবেনি, সে মেয়ের বযসী এক মহিলাব সামনে নতজানু হবে ! জগদানন্দের ছেলে হয়ে তুই একথা বলতে পাবলি ? যে মানুষ বারো বছর বযসে বিষয়সম্পত্তিব মুখে লাথি মেরে একবস্ত্রে গৃহত্যাগ করে নিজের চরিত্রেব জোরে সম্মানিত পুরুষ হয়েছিলেন। আজও যাঁর নামে মানুষ শ্রদ্ধায় হাত জোড় করে!'

'যুগ অনেক পাল্টে গেছে শিবু। মানুষ আর সে মানুষ নেই!'

'আমরা আছি কৃষ্ণ। আমরা এখনও বেঁচে আছি। তুমি আর আমি। লাস্ট অফ দি মহিকানস।'

'তা আছি। তবে আমরা এখন স্থবির। নখ, দন্তহীন ব্যাঘ্র। গর্জন আছে গতর নেই। ধাক্কায় আমরা কেঁপে যাই।'

'আমি কাঁপি না। তোর চেয়ে আমার জগৎ অনেক বেশী বাস্তব। আমি জানি যে দরজা খোলে সে দরজা বন্ধও হয। আমি জানি শীতের পেছনে গ্রীষ্ম আসে। তুই শিল্পী, রঙ-তুলি আব বেহালা হল তোর অস্ত্র। রাজা-মহাবাজার পোরট্রেট এঁকে কাটিয়েছিস যৌবন। মডেলকে বিয়ে কবে সংসার পাততে গিযে হাত পুড়িয়েছিস। মডেল-মেয়ে যে মডেল-স্ত্রী হতে পারে না, সে সত্য বুঝেছিস চুলে পাক ধরার পর। আমি ছেলে চরান শিক্ষক। তেত্রিশটা বছর আমার এ হাত কলমও যেমন ধরেছে, সমানে খুন্তিও নেড়েছে। সুধা তো আমার জীবনে মাত্র ছ'বছরের অতিথি হয়ে এসেছিল। আমার স্বভাব কেড়ে নেবার সুযোগ সে পায়নি। আমাকে ঠুটো জগন্নাথ বানাতে পারেনি। আমি শিবপদ। আমি কারুর স্বামী নই। পিতা নই। আমি দীন-হীন-শিক্ষক শিবপদ। ঈশ্বর জগদানন্দ আমার পথপ্রদর্শক, আমার গুরু। আমার জন্য তোমরা কেউ ভেবো না। জীবনে আমি সবচেয়ে বেশী ঘৃণা করি মানুষের অনুকম্পাকে। সহানুভূতিকে। এসেছি একলা, যাবো একলা। কিছুকাল এই ঘৃণার পৃথিবী, এই প্রেমের পৃথিবীতে বসবাস।'

কৃষ্ণপদ আর কথা বাড়াল না। বললে, 'চল, একটু চা-বিস্কুট খাওয়া যাক।'

রান্নাঘর এতদিন বেদখল হয়ে গিয়েছিল। কাল রাতে অবশ্য আর রান্না হয়নি। কালকের রাত বিদায় নিয়ে গেছে ভাঙচুরের পরিকল্পনায়। শিবপদ একপাশে বসে দেখেছে যৌবনের তর্জন-গর্জন-আস্ফালন। মনে মনে হেসেছে। যে পা নৃত্য করে বেশি সেই পা অবশ হয় তাড়াতাড়ি। যে কণ্ঠ গর্জন করে বেশী, সেই কণ্ঠ নীরব হয় দ্রুত। শিবপদ দূরে বসে দেখেছে, দুটি মোহাচ্ছন্ন তরুণ-তরুণীর খেলা। অংশ গ্রহণ করেনি। ভিক্ষার বিরোধী। এমন কী শান্তি-ভিক্ষাতেও আপত্তি। একটি কথা সে মনে রেখেছে অটলেরও টল আছে। যা গড়ে তা একদিন ভাঙে। যার জন্ম আছে তার মৃত্যুও আছে। অস্তির নাস্তি, নাস্তির অস্তি।

গ্যাস জ্বালানর প্রক্রিয়াটি ভারি মসৃণ। অসংখ্য নীল শিখা কেটলি জাপটে ধরেছে। রান্নাঘরের বাইরে কৃষ্ণপদ পায়চারি করছে, এধার থেকে ওধার। গুন গুন গান চলেছে। বেশ ভাবে আছে। শিবপদের চেয়ে বয়েসে বছর দুই বড়। প্রথাসম্মত বিবাহ হল না বলে স্বেচ্ছায়

বউ নিয়ে আলাদা সংসার পেতেছিল। সে সব অনেক কালের বোস পুরনো কথা। পাড়াপ্রতিবেশীরা পাঁচ কথা বলেছিল। আত্মীয় স্বজনেরা প্রায় এক ঘরে করে দিয়েছিল। প্রেমের তোড়ে সব ভেসে গিয়েছিল। নেশা কেটে যাবার পর পৃথিবীকে মনে হয়েছিল বিবর্ণ হলুদ। অনেক দিন জ্বর ভোগের পর জিভের যেরকম স্বাদ হয়, জীবনের স্বাদ হয়ে গিয়েছিল সেইরকম। সারাটা জীবন একের পর এক মেয়েদের উৎপাতে কম ভুগতে হয় নি। ঈশ্বর এমন একখানা চেহারা দিয়েছেন! মেয়ে-ধরা ম্যাগনেটের মতো। কোথাও গিয়ে শান্তি ছিল না। স্ত্রী-হাঙরে ছেঁকে ধরত। ভোগের সুযোগ জীবনে অনেক এসেছিল। শরীরে জগদানন্দের রক্ত বইছে। মন ভোগ ছেড়ে দুর্ভোগের দিকেই টেনে নিয়ে গেছে। সব ত্যাগ করতে করতে এখন একেবারে সন্ন্যাসীর জীবন। স্বপাক আহার। রাতের দিকে দুগ্ধ সহযোগে সরষে পরিমাণ আফিং। রাত ভোর মৌতাত। সুন্দর সুন্দর স্বপ্ন।

দেওয়ালে একটা ছবি ট্যারা হয়েছিল। শিল্পীর চোখে বড় বেমানান। কৃষ্ণপদ ছবিটাকে সোজা করতে করতে বললে, 'বাড়িটায় এবার একবার হাত দে রে ভাই। রঙটঙ ধরা। পুজো এসে গেল।'

চা ছাঁকতে ছাঁকতে শিবপদ বললে, 'দাঁড়া। রেস্ত দেখে ব্যবস্থা।'

'তোব একার জন্যে এত বড় বাড়ি কী হবে! ভালো একঘব ভাড়াটে বসিয়ে দে।'

'ভাড়াটে? পাগল হয়েছিস। তেমন বুঝলে বেচে দোব। ভাল দাম পাওযা যাবে।'

'তাবপর?'

'টাকাটা ফিকস্‌ড করে দিয়ে সুদের টাকায় মনের আনন্দে ডাল ভাত।'

'আর বসবাস?'

'কোনও তীর্থে ধর্মশালায়।'

'তাব মানে সেকেলে বিধবাদের মতো কাশীবাসী হয়ে যাবি?'

শিবপদ ভাইকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিল। নিজের চায়ে চিনি গুলতে গুলতে বললে, 'না ভাই কাশীবাসী হবার ইচ্ছে নেই। ধাতে সইবে না। তবে আমার একটা আশ্রম জানা আছে। সেখানে মাসে মাসে কিছু টাকা ধরে দিলে থাকতে দেবে। মনোরম পরিবেশ। যেদিকেই তাকাও সেই দিকেই পাহাড়।'

চায়ের কাপ নিয়ে দু'জনেই আবার বাবান্দার চেয়ারে এসে বসল। আকাশ আরও ঘোর হয়ে এসেছে। ফুলে ফুলো সাদা কাঞ্চন গাছ যেন আরও সাদা। পাতা বাহারের পাতা চকচক করছে।

কৃষ্ণপদ চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'তোর খাওয়ার ব্যবস্থা আমার ওখানেই করি।'

'কেন রে?'

'আমার একজন রান্নার লোক আছে।'

'বাজে বকিসনি। তোর সম্বল একটা ইকমিক কুকার।'

'ভুল বলিনি রে ভাই। কুকের বাঙলা কী, রাঁধনী। দ্যাখ ভাই, ব্যাচেলারদের সব চেয়ে বড় সহায় কুকার। এই তো চাপিয়ে এসেছি। কাঠকয়লার সোহাগী আগুনে ব্যাপারটা কী দাঁড়াবে জানিস? রাজভোগ। গব্যঘৃত সহযোগে তোফা। এই বুড়ো বয়েসেও জিভে জল এসে যাচ্ছে।'

'ব্রাহ্মণের স্বপাকই ভালো। আমার প্রেসার কুকার আছে। আধঘণ্টার ব্যাপার।'

'কেন আমার সঙ্গে গেলে তোর জাত যাবে?'

'তোর পইতে নেই। নিষিদ্ধ মাংস ভক্ষণ করো।'

'হায় রে আমার কোনও খবরই রাখিস না। সায়েব কৃষ্ণপদ এখন কৃষ্ণগত কৃষ্ণপদ। ত্রিসন্ধ্যা না করে জলগ্রহণ করি না। সহস্রবার জপ। নিরামিষ আহার। আর এই দ্যাখ গলায়

কাছির মতো পইতে।'

কৃষ্ণপদ টেনে পইতে বের করে ভাইকে দেখাল।

শিবপদ বললে, 'যাক এতদিনে তাহলে সুমতি হয়েছে। দাঁত খুইয়ে বৈষ্ণব !'

'আজ্ঞে না। এই দ্যাখ আমার দাঁত। ঠিক যেন বিজ্ঞাপনের হাসি। টুথপেস্ট কোম্পানী টের পেলে কাগজে ছবি বেরিয়ে যাবে। নাঃ, উঠে পড়ি। বৃষ্টি এল বলে।'

'আমাব ছাতাটা নিয়ে যা।'

'নাঃ, হন হন করে চলে যাই। ছাতা আর স্ত্রী বুঝলি শিবু, ওয়াইফ অ্যাণ্ড আমব্রেলা দুটোই আমার সহ্য হল না। জীবনে কম করে শখানেক ছাতা হারিয়েছি। সন্ধ্যেবেলা বসবি ?'

'তা বসা যেতে পারে।'

'সেদিন একটা বিলিতি দাবার বোর্ড আর ঘুঁটি দেখলুম—আহা কী জিনিস ! রোজগার থাকলে কিনে ফেলতুম।'

'কী হবে ? লোভ যত বাড়াবি তত বেড়ে যাবে। দিশিই আমাদের ভাল। খেলা নিয়ে কথা।' কৃষ্ণপদ চলে গেল। দূরে মেঘ-গর্জনের শব্দ হল। ভিজে উঠেছে বাতাস। শিবপদর সামনে শূন্য দুটি চায়ের কাপ। চায়ের তলানিতে ধীরে ধীরে সাদা সর জমছে। বর্ষা আসছে দেখে সাবধানী পিঁপড়ের দল ডিম সবাবার কাজে ব্যস্ত। দীর্ঘ সারি দেয়ালের গা বেয়ে এঁকে বেঁকে চলেছে। তীর্থযাত্রীর মতো। প্রত্যেকের মুখে একটি করে ডিম। শিবপদ একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে। বড় সুন্দর দৃশ্য। ক্ষুদ্র প্রাণীর জগতে অনুভূতি এখনও বেঁচে আছে। মানুষ এখন অনুভূতি শূন্য যন্ত্র-দানবের মতো। মন নেই, আছে মতিভ্রম। না, এসব ভাবার অধিকার তার নেই। সৃষ্টির পেছনে যে বিশাল শক্তি, সেই শক্তিরই এই খেলা। মানুষ নিজের ইচ্ছেয় কী করতে পারে ? তাঁর ইচ্ছে না হলে গাছের একটা পাতাও নড়বে না। সন্তানের ওপর অধিকার বোধ থেকে এইসব ভাবনার উদয়। হতাশা যেন না আসে। এই পৃথিবীতে কে কার ! কাকে বাঁধা যায়, কাকে ছাড়া যায় ! সময় হলে সবাই চলে যাবে। কেউ দূরে। কেউ জগতের বাইরে। শূন্যতাই পূর্ণতা।

শিবপদ খালি কাপ দুটো কলের তলায় রাখলেন। কলের মুখ দিয়ে জল পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা। এই এক কল, শত চেষ্টাতেও যার অশ্রু বিসর্জন বন্ধ করা যায় না। মানুষের মতো। ওপর দেখে বোঝা যায় না। সব মানুষই মনে মনে আজীবন কেঁদে চলেছে। মানুষ তো কোন ছার। অটল পর্বতও রাত্রির মধ্যযামে অশ্রু বিসর্জন করে। পাথর চুঁইয়ে নেমে আসে। শেষে জমে যায়। পর্বত আশ্রুর অনেক দাম। শিলাজতু নামে বিক্রি হয়। কবিরাজী ওষুধ।

ভেন্টিলেটারে পাখির বাসা হয়েছে। বাসা মানেই বাচ্চা। চিঁ চিঁ করছে। দুর্যোগ আসছে। মাটা আবার কোথায় গেল বাসা ছেড়ে। পেছনের বারান্দায় এসে শিবপদ আকাশের দিকে তাকাল। পাখিরা সব নেমে পড়েছে। একবার বাজারে যাওয়া দরকার। সংসারে কী আছে কী নেই আর দেখতে ইচ্ছে করছে না। নতুন পত্তনি হওয়াই ভালো। খরচপত্তর সব কমাতে হবে। বাড়ি করে সর্বস্বান্ত।

'বাবা।'

শিবপদ চমকে উঠেছে। এত মধুর স্বরে কে তাকে বাবা বলে ডাকতে পারে ! ঘুরে দাঁড়াল।

'আপনি অমন চমকে উঠলেন ? কী ভাবছিলেন ? সামনের দরজা হাটখোলা। সামনের ঘরে জিনিসপত্তর রয়েছে। কেউ যদি ঢুকে পড়ে !'

শিবপদ হাসল, 'কী আর নেবে মা ! নেবার মতো কিছু নেই। তুমি হঠাৎ এই সময়ে ! আজ বেরোওনি।'

'বেরতে গিয়েও বেরনো হল না। মেয়েটার হঠাৎ খুব জ্বর এসেছে । আপনি একবার দেখবেন বাবা !'

'তাই তো। তোতা তো সকাল থেকে একবারও আসে নি আজ ! জ্বর মানে কত জ্বর ?'

'থার্মোমিটার নেই। কপালে হাত দিয়ে মনে হল দুইটুই হবে। মুখটা ভীষণ লাল হয়েছে। থম থম করছে। আপনি একবার চলুন।'

'আমার হোমিওপ্যাথি কী কাজ করবে মা ! বাঁকা বাঁকা অসুখের যুগ পড়েছে। ভালো কোনও ডাক্তার ডাকলে হত না ? বলো তো আমিই ডেকে আনতে পারি।'

'আগে আপনি একবার দেখুন। সকাল থেকে দাদু দাদু করছে। একবার উঁকি মেরে গেছি আপনি ব্যস্ত ছিলেন। আপনার ওষুধে ওর খুব কাজ হয়।'

'চলো, চলো, আমার তোতামণির অসুখ।'

সামনের দরজায় এসে মহিলা শিবপদর হাত থেকে তালা আর চাবি নিয়ে বললে, 'দিন আমি লাগিয়ে দিচ্ছি, আপনাকে আর নিচু হতে হবে না।'

মেয়েটির নাম দেবী। সুন্দর ছিপছিপে চেহারা। মিষ্টি করুণ মুখ। চুলে তেল পড়েনি অনেকদিন। তাই যেন কেমন একটু দুঃখী, দুঃখী ভাব। পরনে আটপৌরে শাড়ি। পায়ে প্লাস্টিকের চটি। শিবপদ মেয়েটিকে দেখছে আর মনে একটা সাহসের ভাব আসছে। এই দাঁতালো ধারালো পৃথিবীতে একটি ফুলের মত মেয়ে নিয়ে দেবীব মত দেবী যদি বেঁচে থাকতে পারে, আমি শিবপদ কেন পারব না। বয়েস হয়েছে, তা হোক না ! এখনও তো শুয়ে পড়িনি। সেদিন এক ফলওলাকে দেখলুম আমার চেয়েও বয়েস বেশী। আপেল চাই, আপেল চাই বলে হেঁকে যাচ্ছে। মাথায় ফলের ঝাঁকা। পায়ে ছেঁড়া জুতো।

'আপনার এই তালাটায় একদিন একটু তেল দিতে হবে। কলে জং ধরে গেছে।'

'তালাটা পড়েছিল মা। কত বছর পরে দরজায় তালা পড়ল।'

'নিন চাবিটা পাঞ্জাবির পকেটে রাখুন। হারাবেন না।'

'দাও।'

শিবপদ চাবিটা পইতেতে ঝোলালেন। সাবধানের মার নেই।

সিঁড়ির ধাপ একটু আগের ঝিরি ঝিরি বৃষ্টিতে ভিজে গেছে। দেবী নামতে নামতে বললে, 'সাবধানে নামবেন বাবা। জুতো স্লিপ না করে। হাত ধরব ?'

'না মা। আমি সাবধানেই নামছি।'

শিবপদর ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। ভালবাসা শ্রদ্ধা এখনও বেঁচে আছে ! সভ্যতার প্রখর সূর্যে শিশিরের মতো শুকিয়ে যায় নি। সাদা একটি গোলাপ ফুটেছে। শিবপদ নিচু হয়ে তুলে নিলেন।

'তুললেন কেন বাবা ? বেশ তো গাছে ছিল !'

'এর স্থান আরও ভাল জায়গায় হবে। আমার তোতামণির বিছানায।'

দেবীর সব গেছে। দুর্ঘটনায় স্বামী চলে গেছে বছর তিনেক আগে। কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু। তাই সরকার নিয়ম অনুসারে স্ত্রীকে একটি চাকবি দিয়েছেন। সামান্য মাইনে। সামান্যতেই চালাতে হয় টেনেটুনে। স্বামীর সঞ্চয় কিছু ছিল না। অবকাশ পায়নি মানুষটি। সাজিয়ে গুছিয়ে বসতে না বসতেই খেলা ভেঙে গেছে। দেবীরও তিনকুলে কেউ নেই। থাকার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ডিগ্রি আছে। অচল আধুলির মত। আছে একটি মেয়ে, যাকে ধরে বাঁচার চেষ্টা। একটা উদ্দেশ্য এনেছে শূন্য জীবনে। আর এই বৃদ্ধ যাকে দেবী পিতার মতই শ্রদ্ধা করে, ভালবাসে। কোনও আত্মীয়তা নেই। সম্পর্ক গড়ে উঠেছে ধীরে ধীরে। হঠাৎ ছেড়ে যেতে হলে কষ্ট হবে। বৃদ্ধের মুখে এমন একটা মায়া আছে, যেন আপন জনের থেকেও আপন।

ছোট্ট একটা একতলা বাড়ি। ফাঁকি দিয়ে তৈরি। দুটি মাত্র ঘর। একটি মাঝারী, আর একটি খুবই ছোট। এক চিলতে রান্নাঘর। অপরিসর বাথরুম। ছটাকখানেক বারান্দা। বাড়িটার একটাই ভালো, চারপাশে খোলা। আলো-বাতাসের অভাব নেই।

চাকরি করতে হয় বলে দেবী একটি চোদ্দপনের বছরের মেয়েকে রাখতে বাধ্য হয়েছে। মেয়েটি সুশ্রী, ভদ্র। তোতাকে ভালবাসে। ঈশ্বর মানুষকে যেমন বিপদে ফেলেন, তেমনি বিপদ থেকে বেরোবার রাস্তাও করে দেন। তা না হলে ঈশ্বর হয়েছেন কেন? লোক জল্লাদ বলত। মেয়েটি জুটে না গেলে দেবীকে আর চাকরি করে খেতে হত না।

শিবপদ মাঝে মধ্যেই এ বাড়িতে আসে। এলেই তার মনটা অন্যরকম হয়ে যায়। কেমন ছিমছাম, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। দেবালয়ের মতো পবিত্র। সব সময় মৃদু ধুপের গন্ধ ভাসছে বাতাসে। অভাবের সংসার তবু স্বভাবটি এমন, চারপাশে একটা প্রাচুর্যের ভাব। ফুলদানিতে ফুল রাখার ব্যবস্থাও করা হয়েছে। একেই বলে দেবীর সংসার। কোথাও সামান্য ধুলো নেই। দেয়ালের কোণে ঝুল নেই। আয়নার কাঁচ ঝাপসা নয়। চিরুনি বুরুশের ওপর হেলে নেই। তোয়ালের জায়গায় পাট করা ধবধবে তোয়ালে। যেখানে সেখানে দড়ি খাটিয়ে জামা, কাপড়, অন্তর্বাস ঝোলানো নেই। জুতোর র‍্যাকে জুতো এমন ভাবে সাজানো যেন জুতোর দোকান। পাশাপাশি নিখুঁত পরপাটি অবস্থান। দক্ষিণপন্থী, বামপন্থীর যুগপ্রচলিত লাঠালাঠি নেই। এমন একটি মেয়ে যদি তার সংসারে বউমা হয়ে আসত। ফুল ফুটিয়ে ছেড়ে দিত। শিবপদ তাকে আরও লেখাপড়া শেখাত। নিজের তত্ত্বাবধানে রেখে ডক্টরেট করিয়ে দিত। শাস্ত্র পড়াত। ন্যায়, সাংখ্য, বেদান্ত। জীবনের শ্রেষ্ঠ যা কিছু সব উজাড় করে দিত শিবপদ। তারপর একদিন পরম শান্তিতে চোখ বুজতো। পৃথিবীর শেষ দেখাটা হত, ঠিক যেমনটি তার কল্পনায় আছে। উজ্জ্বল একখণ্ড আকাশ, মিষ্টি একটি মুখ, কপালে সিঁদুরের ফোঁটা, যেন আদিত্যবর্ণ। চলে যাবার অসহ্য ব্যথা, ফিরে আসার প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা নিয়ে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ। তারপর পুত্রের সন্তান হয়ে পিতার ফিরে আসা। তেমন জননীর কোলে মানুষ বারে বারে ফিরে আসতে চায়। পৃথিবী যতই দুঃখ কষ্টের হোক না কেন?

'তোতা।'

শিবপদ দরজার সামনে থেকে ডাকল। কী হয়েছে বন্ধু তোমার?'

দাদুর গলা পেয়ে তোতা চট করে পাশ ফিরে বালিশের তলায় মাথা পুরে দিল। লুকোচুরি। খরগোসের মুখ লুকনো। পেছনটা উল্টে আছে। গায়ে সুন্দর একটা ফুল ফুল ফ্রক। দেবীর হাতে তৈরি।

শিবপদ মজা করে বললে, 'বউমা তোতা নেই বুঝি। এই তো ছিল। এরই মধ্যে মেয়েটা গেল কোথায়? পাখি হয়ে উড়ে গেল না কী জানালা দিয়ে?'

দেবী মৃদু হেসে বলে, 'তাই তো, কোথায় গেল মেয়েটা। বিছানায় শুয়েছিল না এইমাত্র!'

'সেই রকমই তো মনে হয়েছিল বউমা। আমার কী মনে হয় জানো, ওর সেই পোষা পক্ষীরাজে চেপে সাতসমুদ্র তেরো নদীর পারের, রাজপুত্রের দেশে বেড়াতে গেছে। যেখানে রূপোর গাছে সোনার ফল ঝোলে। যে দেশের রাস্তা তৈরি হয় মণিমুক্তো দিয়ে। যে দেশের পাখি মানুষের ভাষায় কথা বলে। ও এখুনি ফিরে আসবে। এলে বোলো আমি দেখা করতে এসেছিলুম। বলবে সাদা দৈত্য এসেছিল। কিছু দেবার ছিল। যাক পরেই না হয় আসব।'

বালিশের তলা থেকে মুখ বের না করে, তোতা ডান হাতটা বাড়িয়ে দিল। দাদুর আনা জিনিসটা চাই।

শিবপদ বললে, 'ও মা ওটা কার হাত গো!'

গোলগাল সাদা টুকটুকে একটা হাত। ছোট্ট একটি সোনার বালা হাত নাড়ার তালে তালে দুলছে।

শিবপদ বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে বললে, 'ওমা এটা তো আমার তোতামণির হাত। দুষ্টু মেয়ে এরই মধ্যে ফিরে এসেছে। কই মুখ দেখি মুখ।'

'তোতা। মুখ খোলো। দ্যাখো দাদু তোমার জন্যে কী এনেছেন?'

বালিশের তলা থেকে মুখ বের করে মেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগল। হরিণের মত ছলছলে দুটি চোখ। মা দুর্গার মত মুখ। বহু রাতে শিবপদ স্বপ্নে এই মুখ দেখে। ফুলে ফুলে ভরা বাগান। সবুজ ঘাসে ঢাকা পথ। চাঁদের আলোর ফিনিক ফুটছে। রুপোর চুমকি বসান সাদা সিল্কের ঝলমলে ফ্রক পরে তোতা ছুটছে আর বলছে, দুয়ো, তুমি আমায় ধরতে পার না। এই স্বপ্ন শিবপদ রোজ রাতে দেখতে চায়। ভোরে নিজেকে বড় পবিত্র মনে হয়। পাখির মতো পাখি জীব নয়। একটা রূপক। ডানা-মেলা আনন্দ, ভাসমান প্রার্থনা, উৎসারিত সঙ্গীত।

সাদা গোলাপটি তোতার হাতে দেবার সময়, সামান্য স্পর্শেই শিবপদ বুঝল মেয়ের বেশ জ্বর। বিছানার একপাশে বসে কপালে হাত রাখল। ভীষণ উত্তাপ।

'দিদিভাই জ্বরটা কী ভাবে বাঁধালে ? লুকিয়ে লুকিয়ে কাঁচা তেঁতুল খেয়েছ। তাই না ?'

তোতা মাথা ঝাঁকাল। রেশমের মত চুল কপালে দুলে উঠল, 'না তো ! আমি কী দুষ্টু মেয়ে ?'

'তবে তুমি খুব চান করেছ ?'

'সত্যি না। আমার জ্বর হয়েছে কেন জানো, কাকে আমার মাথায় অ্যা করে দিয়েছে।'

'তাই না কী ?'

শিবপদ নাড়ী ধরল। নাড়ী যেন টগবগ করে ছুটছে। তিনের ওপর।

'দেখি জিভ দেখি।'

গেলাপী রঙের ছোট্ট এতটুকু একটা জিভ বেরিয়ে এল। না পেটের সমস্যা নয়। গরম ঠাণ্ডার জ্বর।

'দেখি তোমার পেটটা আমি প্যাঁক প্যাঁক করে টিপব এবার। দেখবো তুমি হংস না মনুষ্য !'

ছোট্ট প্রাণীর ছোট্ট এতটুকু উদর। নরম তুলতুলে। মানুষের উদ্যানে সদ্য ফোটা একটা মানুষ। শিশিরের গন্ধ। না পেটে কিছু নেই। লিভার ঠিক আছে।

পাঞ্জাবির পকেট থেকে ছোট্ট একটা ব্যাগ বেব করল শিবপদ। মোটামুটি সব ওষুধই আছে। একটা শিশি বের করে কপালে ঠেকাল। দেবার আগে ওষুধে প্রাণ সঞ্চার করতে হয়।

'তোতামণি আবার তোমার জিভ বের করো।'

জিভের মাঝখানে টুপটুপ করে চারটে গুলি ফেলে দিল।

'কী বুঝলেন বাবা ?' মেয়ের মাথার কাছ থেকে দেবী প্রশ্ন করল।

'বেশ ধুম জ্বর। সাবধানে রাখতে হবে। খাওয়া দাওয়া সামলে।'

'চলুন হাত ধোবেন চলুন। তারপর ভালো করে এক কাপ চা খান।'

'হাত ধোবো কেন ? আমার দিদিভাই তো ফুল। পৃথিবীর সব ফুল এক করলে যে ফুল হয় সেই ফুল। না বউমা, এবার আমি যাই। গিয়ে আবার রান্না চাপাতে হবে।'

'আমার হাতের চা এক কাপ। আমি সাহস করে একটা কথা বলব বাবা ?'

'বলো না। আমাকে কিছু বলার জন্যে সাহস, দুঃসাহসেব প্রয়োজন নেই। আমি কী এমন মানুষ ?'

'আপনি কী মানুষ, কেমন মানুষ সে আর আপনি বুঝবেন কেমন করে ? বোঝেন না বলেই আপনি মানুষেব মতো মানুষ। আমি যা বলছিলুম, আজ আপনি এখানেই খাওয়া দাওয়া করুন।'

'না মা, আজ থাক সে আর একদিন হবে। দিন তো পালাচ্ছে না। তোতামণি সেরে উঠুক। ও যেদিন মাছের ঝোল দিয়ে পথ্য করবে সেইদিন আমার নিমন্ত্রণ।'

'আপনাকে যখনই খাবার কথা বলি, আপনি এড়িয়ে যান, আমাকে আপনি ঘৃণা কবেন, পাপী ভাবেন, তাই গরমজল ছাড়া আমার হাত থেকে কিছু গ্রহণ করেন না।'

'না গো পাগলী মেয়ে। এ তোমার ভুল ধারণা। মুখে তোমাকে দেবী বলি, মনে মনেও

তোমাকে দেবী বলি। মানুষের মন যে দেখা যায় না। যদি দেখান যেত তোমার আসন দেখতে পেতে। হৃদয়ের কথা ভাষায় যে বলা যায় না!'

'তাহলে কথা দিলেন, তোতার পথ্যের দিন।'

'হ্যাঁ কথা দিলুম।'

দেবী চা করতে গেল। শিবপদ চুপচাপ বসে। তোতা য়কটা হাত ধরে আছে। মেয়েটা জ্বরে হাঁসফাঁস করছে।

'তোতা'।

'উঁ।'

'খুব কষ্ট হচ্ছে দিদিভাই?'

'একটু। একটু। দাদাই?'

'বলো।'

'তুমি পেরেছ?'

'কী বলো তো?'

'এত ভুলে যাও কেন গো? তুমি আমাকে একটা কাঠবেড়ালী ধরে দেবে বলেছিলে। কিচ্ছু তোমার মনে থাকে না। তুমি একদম বুড়ো হয়ে গেছ।'

'কাঠবেড়ালি! সে তো আমার মনে আছে। দাঁড়াও শীত পড়ুক, তারপর একটা ফাঁদ তৈরি করে একটা দুটো, তিনটে, কতো কতো ধরব। রোজ ধরব। রোজ রোজ ধরব।'

'কোথায় আমি রাখব?'

'এই বিরাট এক খাঁচা তৈরি করব।'

'এই ঘরের মত?'

'এর চেয়েও বড। তার মধ্যে একটা নারকোল গাছ, একটা তাল গাছ থাকবে।'

'হিহি, কী মজা!' তোতা চোখ বুজিয়ে আছে। ছাড়ানো লিচুর মত নিটোল গোলাপী মুখ। জ্বরে তপতপে হয়ে আছে। 'দাদাই কাঠবেড়ালী কী খায়?'

'বাদাম খায়, মুড়ি খায়, গাছের ডাল চিরে সাদা সাদা পোকা বের করে খায়।'

'চীনে বাদাম?'

'চীনে, কাগজী, কাজু।'

'দাদাই, কবে তাহলে বলবে?'

'কাকে তোতামণি?'

'তোমার মিস্তিরিকে।'

'এই পুজোর পর।'

'পুজোতে তুমি আমাকে জলের ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যাবে?'

'নিশ্চয় নিয়ে যাবো।'

'জলের ঠাকুর কী দাদাই?'

'চারপাশে জল, মাঝে একটা দ্বীপ। সেই দ্বীপে মা দুর্গা।'

'আমরা কাছে যাবো কী করে?'

'একটা পোল থাকবে। সেই পোলের ওপর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে।'

'অনেক দূর? অনেক অনেক দূর!'

'তা একটু দূর তো বটেই।'

পরিষ্কার ঝকঝকে কাপে দেবী চা নিয়ে এল। আর একটা প্লেটে গরম চারখানা ডালের বড়া। গায়ে তেল পুটপুট করছে।

'এর মধ্যে তুমি এত সব বানিয়ে ফেললে?'

'কাল রাতেই ডাল ভেজানো ছিল। দুর্গা বাটছিল। চট করে চারখানা ভেজে ফেললুম। আপনি ডালের বড়া ভালবাসেন।'

শিবপদর চোখে জল এসে যাবার মত হল। মানুষ মানুষকে চায়। প্রেমে চায়, ঘৃণায় চায়, স্নেহে চায়, বিতৃষ্ণায় চায়। বড়া খেতে খেতে শিবপদ বললে, 'চুলে তেল দিচ্ছ না ? বড় রুক্ষ হয়ে আছে।'

'কদিন মাথায় জল দিই নি।'

'কেন ?'

'শরীরটা ভাল যাচ্ছে না।'

দেবী মুখ নামাল। শিবপদ ব্যাপারটা বুঝলো। এর আগে একবার ওষুধ দিয়েছিল। দেবী মৃদু গলায় বললে, 'আমাকে একটু ওষুধ দেবেন ?'

'সেই আগের মতোই !'

'হ্যাঁ।'

শিবপদ হাত ধুয়ে ওষুধের পুরিয়া কবতে বসল। নিজের বউমার কথা মনে পড়ছে। সেও মা হতে চলেছে। আর কী মাস ছয়েক পরেই কোল ভরে যাবে। নাতিই হবে। হোক। তাতে তার কী। লোকে বলে সুদের সুদ।

সাত মোড়া ওষুধ দেবীর হাতে তুলে দিতে দিতে বললে, 'ঠাণ্ডা লাগিয়ো না। ঝাল খেও না।'

দেবী কপালে ওষুধ ঠেকিয়ে আঁচলে বাঁধল।

'আমি এখন আসি বউমা।'

'আমি যাবো।'

'না না, আমি ঠিক চলে যাব।'

'দাদাই ?'

'কী রে দিদি ?'

'এই নাও। এই ফুলটা তুমি দিদাকে দিও। বলবে তোতা দিয়েছে। রোজ তো আমি দি। তুমি দেবে, অ্যাঁ ঠিক দেবে তো ! কালও দেবে, পরশুও দেবে, বোজ রোজ দেবে।'

শিবপদর হাতে সেই সাদা গোলাপটি।

'সাবধানে ধরো দাদাই। পাঁপড়ি যেন ছিঁড়ে না যায়।'

শিবপদ নিজের বাড়ির তালায় চাবি লাগাতে লাগাতে চারপাশে একবার তাকাল। বৃষ্টি ধোয়া সবুজ। ফিসফিস করে বৃষ্টি নামল। এলোমেলো বাতাসে জলকণা উড়ছে। বৃদ্ধের সাদা চুলে, মুখে জড়িয়ে গেছে বৃষ্টির ছাট। ভারি অদ্ভুত দেখাচ্ছে। চাবি লাগাতে আজকাল হাত কাঁপে।

॥ দুই ॥

'অ কেষ্ট, কেষ্ট।'

কৃষ্ণপদ জুতোয় পালিশ লাগাচ্ছিল। পাশেই বন্ধ ঘর। জানলার গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে তার উন্মাদিনী স্ত্রী। এক সময় যার নাম ছিল কুমকুম। সে কখনও ডাকত কুমু, কখনও কুমি বলে। এখন আর কোনও নাম নেই। পাড়ার লোকে বলে পাগলি। আগে বলত কৃষ্ণবাবুর বাড়ি। এখন বলে পাগলির বাড়ি।

'অ কেষ্ট, কেষ্ট।'

কৃষ্ণপদ ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল। লাল পাড়, সাদা শাড়ি। অবহেলার আঁচল মাটিতে লুটোচ্ছে। জামা-কাপড় গায়ে রাখতে চায় না। খুলে ফেলে দেয়। খুলতে না পারলে ছিঁড়ে ফেলে রাগে। কাঁচা পাকা এলো চুল। পাকা পেয়ারাব মত মুখ। অস্বাভাবিক দুটি চোখ। তাকাতে ভয় করে। নীরব নালিশের মত। সময় সময় বিচারকের মত। যা দেখেছে তা যেমন জানে, যা দেখেনি তাও তেমনি জানে। যা ঘটবে তাও যেন দেখে বসে আছে।

'অ কেষ্ট, কেষ্ট।'

জুতোয় বুরুশ চালাতে কৃষ্ণপদ বললে, 'বলো।'

'তোমার রাধা কোথায়?'

'তুমিই তো আমার রাধা।'

'কাঁচের শার্সি ভাঙ্গা ঝনঝনে হাসি, 'ঝ্যাঁটা মার, ঝ্যাঁটা মার।'

জুতো আর বুরুশ যথাস্থানে রেখে কৃষ্ণপদ উঠে দাঁড়াল। এইবার তাকে কাজের ভেলকি দেখাতে হবে। এতক্ষণ দম নিচ্ছিল। রাতে ভাল করে একটু ঘুমোতে পারলে শরীরটা সকালের দিকে তাজা লাগত। আফিমের মৌতাত পাগলির জন্যে বারে বারে ছিঁড়ে যায়। জোড়া লাগাতে লাগাতেই আকাশ ফরসা।

কৃষ্ণপদ আয়নার সামনে থেকে মেয়েদের চুল আঁচড়াবার চিরুনি হাতে নিয়ে বন্ধ ঘরের ছিটকিনি খুলল। আদুরে গলায় ডাকল, 'কুমু এদিকে এস।'

স্বামীর ডাক শুনে কুমু ঘরের কোণে গিয়ে পা ছড়িয়ে বসে পড়ল। দৃষ্টি ভয়াবহ।

কৃষ্ণপদ আরও নরম গলায় বললে, 'এদিকে এস। তোমার চুল আঁচড়ে দি। তিনদিন চুলে চিরুনি পড়েনি। উকুন হয়ে যাবে।'

ঘরে কোনও আসবাব নেই। সব সরিয়ে ফেলা হয়েছে। বাড়াবাড়ির সময় কুমু ভাঙচুর করে। একবার ভাঙা কাঁচে হাত পা সব ফালাফালা করে ফেলেছিল। শূন্য ঘরে কৃষ্ণপদর কণ্ঠস্বর গম গম করছে।

'এদিকে এস।' কৃষ্ণপদ এবার কঠোর স্বরে বলল।

কুমু বাধ্য বালিকার মত ঘষটাতে ঘষটাতে ঘরের মাঝখানে চলে এল।

'উঠে আসতে পার না। কাপড় ময়লা হচ্ছে।'

কুমু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

কৃষ্ণপদ পেছন দিকে বসে চুলে চিরুনি চালাতে শুরু করল। অসম্ভব জট হয়েছে। পদে পদে চিরুনি বাধা পাচ্ছে। মেয়েদের চুল ছাড়ান কী পুরুষের কাজ। যেমন বরাত ! ভাগ্য ভালো যে আগে থেকেই এইসব একান্ত বিদ্যা আয়ত্ত করা ছিল। যত বয়েস বাড়ছে এই অসহায় মহিলা ততই মন জুড়ে স্থান দখল করছে। ফেলে দিতে চাইলেও ফেলা যাচ্ছে না। অতীত ভেসে উঠছে। এক সময় এই সুঠাম শরীরের কত ছবিই এঁকেছে কত ভঙ্গিতে। বনের পাখি খাঁচায় সুস্থ থাকে না কৃষ্ণপদ। জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল তোমার এইটাই। সব কিছু ধরা যায় না। কিছু উড়ে বেড়াবেই।

মাঝে মাঝে চুলে জোরে টান মারলেই কুমুর মাথা কৃষ্ণপদর বুকের কাছে চলে আসছে। সেই মাথা যে মাথা একদিন তার বাহুর বালিশে নিশ্চিন্ত আরামে এলিয়ে থাকত। নিবিড় কথায় ভবিষ্যৎ স্বপ্নের জাল বুনতে বুনতে পাখির ডাক শোনা যেত।

অনেকেই সেই সময় বলেছিল, কৃষ্ণ যৌবনের নেশায় ভুল কোরো না। বিয়ে জিনিসটা ছেলেখেলা নয়। যা করবে ভেবেচিন্তে করবে। মডেল রমণী মডেল স্ত্রী হবে এমন কোনও কথা নেই।

যৌবন ! যৌবনের কথা ভাবলে কৃষ্ণপদর হাসি পায়। বড় ক্ষণস্থায়ী। বিজলীর ঝিলিকের মত। মেঘলা দিনের রোদ্‌দুরের মত। বার্ধক্য সেই তুলনায় দীর্ঘতর। কী এমন খারাপ আছি আমি ? ভালই আছি। সময় কেমন সহজে কেটে যায় ! দিন যায়, রাত আসে। রাত যায় দিন আসে। মহাজনের হাতে বাজিয়ে বাজিয়ে টাকা তুলে দেবার মতো, মহাকালের হাতে একটি একটি করে জীবনের দিন তুলে দেওয়া। জীবনের একমাত্র কর্তব্য এখন অসহায় এই মহিলার সেবা। বেঁচে থাকার একমাত্র আকর্ষণ। অন্যে শুনলে হাসবে। বলবে বুড়োর আদিখ্যেতা।

মাথায় মাখার কবিরাজী তেল এনেছে কৃষ্ণপদ। উৎকট গন্ধ। কাজ কী হয় কে জানে ! তবু কুমুর ব্রহ্মতালুতে বেশ খানিকটা থাবড়ায়। ঈশ্বরের কাছে কৃষ্ণর একটিই প্রার্থনা, প্রভু এত চিকিৎসা তো হল, শক থেরাপী, ট্রাঙ্কুইলাইজার, হয় একে তুমি সুস্থ করে দাও, নয় তোমার সৃষ্টি তুমি ফিরিয়ে নাও। হঠাৎ তোমার পেয়াদা এলে আমাকে যেতেই হবে, তখন কে দেখবে এই অসহায় প্রাণীটিকে। অহঙ্কারী কৃষ্ণপদর স্ত্রী বিবসনা হয়ে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরবে, ভাবতেও কষ্ট হবে। মরেও শান্তি পাওয়া যাবে না।

কুমুকে চান করিয়ে দিতে হয়। গা মুছিয়ে দিতে হয়। শাড়ি পরিয়ে দিতে হয়। খাইয়ে দিতে হয়। জীবনের তাল ছন্দ সব কেটে গেছে। সব কাজ শেষ করে কৃষ্ণপদ কপালে একটা সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিল বড় করে। পরিচর্যার সময় কুমু একেবারে বাধ্য মেয়ে। প্রথম প্রথম তার উন্মাদনার একটা উগ্র দিক ছিল। এক নাগাড়ে চিকিৎসার ফলে সেই উগ্রভাব শান্ত হয়েছে। এখন শুধু কথাবার্তায় সম্পূর্ণ অসলংগ্ন। কখনও অতীত থেকে কথা বলছে। কখনও উঠে আসছে ভবিষ্যৎ থেকে। বর্তমানে কিছুতেই ফিরে আসতে পারছে না। কী অদ্ভুত ব্যাপার ! যে জগৎ নেই, সেই জগতের অধিবাসী। মাঝে মাঝে অবসাদে ভেঙে পড়ে। তখন চলে একটানা কান্না।

অনেকেই উপদেশ দেয়, কৃষ্ণ, একটা উন্মাদ আশ্রমে ব্যবস্থা করে ঝাড়া হাত-পা হও। স্ত্রীর সেবা না করে ঈশ্বরের সেবা কর। বয়েস অনেক হল। পরজন্মের প্রস্তুতি নাও। কী নিয়ে যাবে সেখানে ? শূন্য হাতে ?

কৃষ্ণ হাসে। পরজন্মের ভাবনা তার নেই। অত ভাবনা তার নেই। যা হবে তা হবে। একটাই তার দুঃখ রং-তুলির জগৎ, রূপ-সৃষ্টির জগৎ থেকে অনিচ্ছায় সরে আসতে হয়েছে। চোখ চলে না। হাত কাঁপে। আগে একটা একটা করে চোখের পাতা আঁকতে পারত সূক্ষ্ম তুলি দিয়ে। সে ক্ষমতা চলে গেছে। কুমুকে মডেল করে কত ছবিই এঁকেছিল। সবই প্রায় বিক্রি

হয়ে গেছে। বড় বড় লোকের বৈঠকখানায় ঝুলছে। এ বাড়িতে খান দুই আছে। খদ্দের ঝুলোঝুলি করলেও বিক্রি করেনি। কুমুর অতীত ছবি হয়ে ঝুলছে।

একটি সত্য কৃষ্ণ হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করেছে, জীবনের সবচেয়ে বড় অশান্তি, বিষয়-সম্পত্তি আর সুন্দরী মহিলা। একটু নির্জনে-একান্তে, আপন মনে, জীবন সাধনা নিয়ে থাকতে দেয় না। লোভী মানুষের সঙ্গে ঠোকাঠুকি বেড়ে যায়। কুমুকে সামলাতে সামলতেই জীবন শেষ হয়ে গেল। কৃষ্ণপদরই পাগল হয়ে যাবার কথা। পাগল হয়ে গেল কুমু।

স্নান সেরে কৃষ্ণপদ আসনে বসল। পাশে ধূপ জ্বলছে। ফুল, বেলপাতা, কোশাকুশি, চন্দন। বেদীর ওপর পাথরের শিবলিঙ্গ। এই সময়টায় কৃষ্ণপদ অন্যজগতে চলে যায়। অতীত নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যৎ নেই। নীলকণ্ঠ শিব বড় প্রাণের দেবতা। প্রয়াগে এক সাধু বলেছিলেন, বেটা, শিউজীকো আচ্ছাসে পাকড়ো। মিল যায়েগা সব কুছ্।

সব কুছের মানেটা তেমন পরিষ্কার ছিল না প্রথমে। এত কিছু চাওয়ার ছিল বলে শেষ করা যেত না। কৃষ্ণপদর নিজেরই লজ্জা করত। চাওয়ারও একটা সীমা আছে। এখন আর চাইবার কিছু নেই। একটু শান্তি, একটু আনন্দ, পারো তো তাই দিও। আর কিছু চাই না। আর পারো তো, নেবার আগে প্রদীপটিকে একটু উজ্জ্বল করে দাও। 'যা পেয়েছি প্রথম দিনে তাই যেন পাই শেষে।' কিছু না কুমুকে সুস্থ করে দাও। কত কথা বলার আছে! কত অভিযোগ আর অবিশ্বাসের উত্তর দিতে হবে। জীবনে যত দুর্ব্যবহার করা হয়েছে তার জন্যে শেষ ক্ষমাটি চেয়ে নিতে চাই। অপরাধ বোধ নিয়ে উৎসে ফিরে যেতে চাই না। শিবঠাকুর তোমার তো অসীম ক্ষমতা, এই সামান্য কাজটুকু তুমি পারো না।

কৃষ্ণপদর পুজো মানে ইষ্ট দেবতার সঙ্গে বক বক করে বকা। মান-অভিমানে। অভিমান মাঝে মধ্যে তিন চারদিন কথা বন্ধ থাকে। 'যাও কাল থেকে তোমার সঙ্গে আর কথাই বলব না। আমার মাথায় জল ঢালা কাজ ঢেলে যাব। বেলপাতা চড়াবার কথা চড়াব। এর বেশি আর কিছু আশা কোরো না। তোমাব মত স্বার্থপর দেবতার সঙ্গে আমার আর কোনও সম্পর্ক নেই। খাও খাও বেলপাতা খাও।'

বেলপাতার ওপর বেলপাতা, তার ওপর বেলপাতা। নীলকণ্ঠ শিব চাপা পড়ে গেলেন। দমবন্ধ হয়ে যাবার যোগাড়। এই মান-অভিমানের সময় রাতে শিবঠাকুর দর্শন দেন। আফিং-এর মৌতাত। বারান্দায় ডেক চেয়ারে কৃষ্ণপদ আধশোয়া। বেনারসীবাবুদের মত সাজপোশাক। কানে আতর। পাশে আলবোলা। কৃষ্ণপদ নিজেকেই নিজে বলে, 'কেষ্ট যতদিন বাঁচবি, মেজাজে বাঁচবি। তুই ব্যাটা প্রাচীন পৃথিবীর মানুষ। যে পৃথিবী এখনকার চেয়েও অনেক বেশি উদার ছিল। মানুষের মন ছিল চওড়া রাজপথের মতো। হিসেব করে দেখেছি রে ব্যাটা, ব্যাঙ্কে যা পড়ে আছে, আর বছর তিনেক চলবে। তারপরও যদি বাঁচিস হরি-মটর। চেষ্টা কর কোনও রকমে তিন বছরের মেয়াদ খেটে ভবকারাগার থেকে মুক্তির। শুনেছি গুড কণ্ডাক্টের জন্যে আসামীরা মেয়াদ শেষ হবার আগেই তাড়াতাড়ি ছাড়া পেয়ে যায়। তুই কেন পাবি না কেষ্ট! তোর তো গুড কণ্ডাক্টের সার্টিফিকেট আছে।'

কৃষ্ণপদ আলবোলায় টান মারে। অন্ধকারে শব্দ আর গন্ধ দুটোই ভেসে বেড়ায়। আলবোলার শব্দ আর ঝিঁঝি পোকার ডাক মিলেমিশে একাকার। কৃষ্ণপদর কানে বাজে বড় ওস্তাদের সেতারে ঝালার কাজের মত। কপুরথালার মহারাজার নাচ ঘরে আসর বসেছে। এনায়েৎ খাঁ ধরেছেন রাগ ঝিঝোটি। চালাও ওস্তাদ, চালিয়ে যাও। আর একটু লয়ে বাড়ো। তবলচির কালঘাম ছুটিয়ে দাও। এই অবসরে কৃষ্ণপদ নিজেও গান ধরেন গুণ গুণ করে : বিষ্ণু চরণজল, ব্রহ্মাকি কমণ্ডলু শিবজটা বাজিত দেবী গঙ্গে। দুলাইন গেয়েই থমকে যান। আবার সেই শিব! ও নাম আমি আর উচ্চারণ করব না, করব না, করব না। প্রতিজ্ঞা। আমার বিষ্ণুই ভাল। তুমি নেশাখোর শিব। তোমাকে আর দয়া করে, কষ্ট করে হিমালয় ছেড়ে এই

কষ্টের সংসারে আসতে হবে না। তুমি তোমার পার্বতীর সঙ্গে বসে বসে লুডো খেল। আর নন্দী-ভৃঙ্গীকে বলো, গেলাস গেলাস ভাঙ্ এনে দিক। এ বাড়িতে তোমার প্রবেশ নিষেধ।

তবু যেন মনে হয় বারান্দার দূর কোণে দাঁড়িয়ে আছেন তিনি। জটাজুটধারী। পরনে বাঘছাল, হাতে কমণ্ডলু, ত্রিশূল। মাথার ওপর সাপ ফণা ধরে আছে। কৃষ্ণপদর কণ্ঠে আবেগ এসে যায়। ধরাধরা গলায় গাইতে থাকে : আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে / তুমি অভাগারে চেয়েছ ॥

এরপর কৃষ্ণপদ বুঁদ হয়ে বসে থাকে। ভেতরে চলতে থাকে আবেগের ওলট-পালট। কে যেন নেঙড়াচ্ছে। ইস্টের সঙ্গে এই হাত চারেকের ফারাক কিছুতেই আর কমছে না। 'আসবে তো একেবারে ভেতরে এস। অমন দূরে দাঁড়িয়ে আর কষ্ট দিও না। জীবনে পূর্ণ কিছুই পাওয়া হল না, সবই আধখাওয়া ফল। মহারাজ এসেছ যখন কাছে এস। চেয়ারটা তোমাকে ছেড়ে দিচ্ছি, বোসো এখানে। এই নাও আলবোলার নল।'

ধীরে ধীরে কৃষ্ণপদর কথা জড়িয়ে আসে। হাত থেকে গড়গড়ার নল মাটিতে পড়ে যায়। গভীর নিদ্রা। আধো অন্ধকার বারান্দায় এইভাবে বসে থাকা কৃষ্ণকে দূর থেকে দেখলে মনে হবে ধ্যানস্থ মহাদেব। এত ফর্সা অন্ধকারেও একটা আভার মত, যেন শ্বেতপাথরের মূর্তি। বিখ্যাত এক অভিনেতা কৃষ্ণকে একবার বলেছিল, 'তোমার মত একটা শরীর পেলে আমি দেখিয়ে দিতুম। তুমি যদি অভিনেতা হতে আমাদের আর করে খেতে হত না।' সেই থেকে শরীরের ওপর একটা মায়া পড়ে গেছে কৃষ্ণর। যতদিন পারা যায় থাকা যাক এর ভেতর। ছেড়ে গেলেই তো পুড়িয়ে শেষ করে দেবে।

খাওয়া-দাওয়া সারতে সারতে কৃষ্ণর দুটো আড়াইটা বেজে যায়। রোজকার মত রঙ তুলি নিয়ে বসেছিল। ছবি হোক না হোক সময়টা বেশ কেটে যায়। কুমু জানলার ধারে বসেছে ছোট্ট এক টুকরো সুতোয় একটা ঢিল বেঁধে, দু আঙুলে উঁচু করে ধরে দোল খাওয়াচ্ছে। এক ধরনের পেণ্ডুলাম। দুলছে তো দুলছেই। দোলাতে দোলাতে সন্ধ্যা নেমে আসবে। ছোট্ট একখণ্ড জমিতে কৃষ্ণকলি গাছে ফুট্ ফুট্ করে ফুটে উঠবে, হলুদ, বেগুনী, সাদা ফুল। আব তখনই কৃষ্ণপদর মনে পড়বে কুমুর যৌবনের কথা। নানা রঙের ডুরে শাড়ি পরে কুমু ঘবে ঢুকছে। সবে গা ধুয়েছে। ভিজে চুল জড়িয়ে আছে কপালে। দামী সাবানেব গন্ধ সারা গাযে। সুন্দর, সুঠাম শরীর। সমস্ত অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নিখুঁত, মাপা। শিল্পীর ক্যানভাস থেকে জীবন্ত হয়ে নেমে এল যেন। মানুষের পয়লা নম্বর শত্রু হল সময।

কাগজে রঙ ছাড়তে ছাড়তে কৃষ্ণ মাঝে মাঝে মুখ তুলে তাকাচ্ছে। ইদানীং তার সব আঁকারই বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আকাশ। নীলের সঙ্গে হলুদ, হলুদের সঙ্গে লাল, মিলে মিশে আকাশের চেহারা কতরকম যে দাঁড়ায়! আনন্দে মন ভরে যায়।

কৃষ্ণ রাস্তার দিকে তাকাতেই দেখল, কে একজন আসছে এদিকে। বাড়িটার দিকে তাকাতে তাকাতেই আসছে। চেনা চেনা। বেঁটে খাটো জলদস্যুর মত চেহারা। হাঁটার ভঙ্গীতে আত্মপ্রত্যয়ের ভাব। পরনে প্যান্ট, শার্ট। আর একটু কাছে আসতেই কৃষ্ণ চিনতে পারল, সাত্যকি বোস। হঠাৎ কী মনে করে এতদিন পরে! চিরটাকালই ভীষণ ধান্দাবাজ ছেলে। স্বার্থ ছাড়া একপাও নড়ে না। কৃষ্ণর যখন খুব রমরমা তখন জোঁকের মত, চিটে গুড়ের মত লেগে থাকত।

সাত্যকি সিঁড়ি দিয়ে বারান্দায় উঠতে উঠতে বললে, 'কী হে শিল্পী, অনেক দিন পরে দেখে অবাক হচ্ছ?'

'তা একটু হচ্ছি সাত্যকি। তুমি তো আর এপথ মাড়াও না। অবশ্য সব সুখের পায়রাই উড়ে গেছে। তুমিই বা কেন ব্যতিক্রম হবে!'

সাত্যকি ঘরের জানলার দিকে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে বললে, 'কিছু বলবে না তো?'

'না হে সে ভয় নেই। তুমি বোসো। ও এখন নিজের মনেই আছে।'

সাত্যকি বসতে বসতে বললে, 'কী করছে এক মনে?'

'সময় মাপছে।'

'বাঃ জব্বর একখানা ছবি আঁকছ হে। বেড়ে খুলেছে।'

'এখন তুমি আছ কোথায়?'

'বেশির ভাগই বাইরে ঘুরি। মাঝে মধ্যে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়লে বোনের বাড়িতে এসে উঠি। শোনো, খবর আছে। তুমি আমাকে যতটা স্বার্থপর ভাবো, আমি ততটা স্বার্থপর নই।'

'তাই না কী?'

'তোমার কথা আমি প্রায়ই ভাবি।'

'কীরকম?'

'যেমন ধরো, তুমি কেমন আছ? কী ভাবে দিন কাটাচ্ছ। অর্থনৈতিক অবস্থা কেমন যাচ্ছে?'

'যাক আমাকে তাহলে ভোল নি এখনও।'

'এক গেলাস জল খাওয়াবে! না, এখন ওঠা যাবে না!'

'খুব যাবে। বোসো তুমি।'

'অ্যাশ-ট্রে আছে?'

'মনে হয় আছে।'

অ্যাশট্রে, জল আর একটা ফ্লাস্ক নিয়ে কৃষ্ণ বেরিয়ে এল। ফ্লাস্কে চা আছে। দ্বিতীয় বার নিয়ে এল দুটো কাপ। সাত্যকি উদাস মুখে সিগারেট টানছে। মুখের চেহারা দেখে কৃষ্ণর খুব খারাপ লাগল। আগে তেমন ভালো করে নজর করেনি। করলে, কড়া, কড়া কথা বলত না। এও সেই সময়ের কারসাজি। সাত্যকির মত ধুরন্ধর লোককেও কাবু করে ফেলেছে।

'কী হে, চাইলুম জল, তুমি এত লটবহর কী নিয়ে এলে?'

'এই তো চায়ের সময় বন্ধু। বারে বারে কে আর করে। একবারেই সেরে রেখেছি।'

'এখনকার দেশলাই দেখেছ! একটা সিগারেট ধরাতে সাত সাতটা কাঠি গেল।'

'আমেরিকার কায়দায় দেশের ব্যবসা চলেছে। সেদিনে একটা ঘড়ির বিজ্ঞাপন দেখলুম, সারা জীবনের গ্যারাণ্টি। কত বছরের জীবন? এক বছর।'

কৃষ্ণ হো হো করে হেসে উঠল। চারপাশের অবস্থা যত অনিশ্চিত হয়ে উঠছে কৃষ্ণর হাসিও তত খোলতাই হচ্ছে। কিছু হারাবার ভয় নেই, মৃত্যু-ভয় নেই। হাসতে বাধা কী!

সাত্যকি সন্দেহের চোখে কৃষ্ণর দিকে তাকাল। পাগলামি ছোঁয়াচে নয় তো! কৃষ্ণর হাসিটা যেন কেমন কেমন।

সাত্যকির দিকে চায়ের কাপ এগিয়ে দিতে দিতে কৃষ্ণ বললে, 'তোমার দিনকাল কেমন চলছে?'

'আর দিনকাল! দিনকালের আর কিছু বুঝি না ভাই। বেঁচে থাকতে হয় বেঁচে আছি। মন বলে আর কিছু নেই। এভাবে বেঁচে থাকার চেয়ে মরে যাওয়াই ভালো। পলিথিনের চাদর দেখেছ?'

'হ্যাঁ দেখেছি। আমার বাড়িতেই আছে।'

'নতুন অবস্থায় ভীষণ জেল্লা। একবার ময়লা ধরলে, যতই ডিটারজেণ্ট ঘষ কিছুতেই আর পরিষ্কার ঝকঝকে হবে না। তখন স্রেফ ফেলে দিয়ে নতুন আর একটা কেন। আমার অবস্থাও তাই। ঘষা মাজার বাইরে চলে গেছি। আবার নতুন ভাবে এসে নতুন করে শুরু করতে পারলে যদি কিছু হয়।'

'তুমি খুব বদলে গেছ। সেই আগের সাত্যকি আর নেই। ব্যাচেলারদের শেষ জীবনটা

ভীষণ দুঃখের। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, দে লিভ লাইক এ প্রিন্স অ্যাণ্ড ডাই লাইক এ বেগার।'

'তুমি তো ভাই ম্যারেড। কী সুখে আছ?'

'আমার সুখ! সে তোমার বোঝার ক্ষমতা হবে না। কারুর জন্যে বেঁচে থাকার, একটা কারণের জন্যে বেঁচে থাকার একটা মানে খুঁজে পাওয়া যায়। অকারণে বেঁচে থাকা অনেকটা শূন্যে লাঠি ঘোরানর মত। বেঁচে থাকার একটা কারণ খুঁজে বের করতে না পারলে দিনগত পাপক্ষয়। ওই জন্যে মানুষ ধর্মকে ধরে। তাঁকে দেখতে চায় যাঁকে দেখতে পাওয়া একটা দুঃসাধ্য ব্যাপার। তোমার মস্ত বিপদ কী জানো, তুমি নাস্তিক। না, নাস্তিকও নও। নাস্তিক আর আস্তিকে বিশেষ তফাৎ নেই। দু'জনেই প্রচণ্ড বিশ্বাসী। একজনের বিশ্বাস আছে তে আর একজনের বিশ্বাস নেই তে। তুমি এক ভোগ-ক্লান্ত লক্ষ্যশূন্য মানুষ।'

'হবে। নিজেকে কখনও বিচার করে দেখিনি। শোনো, আমি দুটো কারণে এসেছি। আমি আমার জন্যে আসিনি, তোমার জন্যেই এসেছি।'

'বলো কী সেই কারণ?'

'বুঝলে কৃষ্ণ দীর্ঘ দশ বছর পরে, গত পরশু আমি দক্ষিণ ভারত থেকে ফিরলুম। বিশ্বাস করবে কী না জানি না। এলুম তোমার জন্যেই। দুটো কারণ। প্রথম কারণ, সুন্দর একটা আশ্রম হয়েছে ব্যাঙ্গালোরে। এক কর্মযোগী সন্ন্যাসীর জীবন-স্বপ্ন। বিরাট তাঁর প্ল্যান। ধীরে ধীরে সবটাই প্রায় হয়ে এসেছে। স্কুল, কলেজ, কলাভবন, মিউজিয়াম, জিমনাসিয়াম। কোনও কিছুই আর বাকি নেই। আশ্রম কর্তৃপক্ষের ভীষণ ইচ্ছে, তুমি কলাভবনের দায়িত্ব নাও।'

'আমি? আমার মতো অখ্যাত মানুষের কী যোগ্যতা আছে! তাছাড়া আমার বয়েস হয়েছে। তাছাড়া আমার স্ত্রীর এই অবস্থা।'

'শোনো, শোনো, তুমি খ্যাত কী অখ্যাত তাব বিচার করবে মহাকাল। শিল্পের জগৎ থেকে সরে এলেও শিল্পী হিসেবে তোমাব নাম কিন্তু মুছে যায় নি। বহু মানুষের ব্যক্তিগত সংগ্রহে তোমার ছবি আছে। দেশ বিদেশের মিউজিয়ামে তোমার ছবি ঝুলছে। শোনো তোমাকে ওঁরা ভালো টাকা দেবেন। অল-ফাউণ্ড। তোমার স্ত্রীর কথাও ওঁরা শুনেছেন। তোমার মতো, তোমার মডেল হিসেবে উনিও বিখ্যাত। তোমার স্ত্রীর সবরকম ব্যবস্থা আশ্রম-কর্তৃপক্ষ করবেন। আমার কী মনে হয় জানো, ব্যাঙ্গালোরের মত সুন্দর জায়গায় পট-পরিবর্তন হলে হয়তো সেরে উঠবেন। নিজেকে এভাবে ফেলে রাখার কোনও মানে হয় কী! তুমিই না বললে একটু আগে, একটা কারণের জন্যে বেঁচে থাকতে হয়!'

কৃষ্ণপদকে বেশ চিন্তিত দেখাল। সামনেই পড়ে আছে তার সদ্য আঁকা ছবি। শেষ সূর্যাস্তের আকাশ। গোটা কতক ঘরে-ফেরা পাখি আঁকলেই ছবি শেষ হয়ে যাবে। কৃষ্ণ সেই ছবির দিকে তাকিয়ে বললে, 'মনে পড়ে সাত্যকি শেষ যেদিন তুমি এসেছিলে, সেদিন তোমাকে আমি তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।'

'ঠিক করেছিলে কৃষ্ণ। সেদিন আমি মোটেই প্রকৃতিস্থ ছিলুম না। সেদিন যে কোনও ভদ্রলোকই আমাকে দূর করে দিত। তুমি কিছু অন্যায় করো নি।'

কৃষ্ণ অবাক হয়ে সাত্যকির মুখের দিকে তাকাল। সাত্যকি শুধু বদলায়নি, সন্ন্যাসী হয়ে ফিরে এসেছে। একেবারে অন্য মানুষ।

'সাত্যকি সেদিনেব ব্যবহারের জন্যে আজ আমি ক্ষমা চাইছি। ওপর থেকে মানুষের বিচার চলে না। ভেতর দেখতে হয়, যা আবার দেখা যায় না।'

'ধ্যাৎ, তুমি বড় সেন্টিমেন্টাল হচ্ছ। তোমার মুখেও কিসের একটা ছায়া পড়েছে! কিসের বলো তো? প্রেমের। তুমি এতদিনে প্রকৃতই কাউকে ভালবেসেছ।'

'ধরেছ ঠিক। আমি মৃত্যুকে ভালবেসেছি। যাকে সবাই ভয় পায়।'

'ভালবাস ক্ষতি নেই, তবে আত্মসমর্পণ কোরো না। কী তুমি রাজি ?'

'তোমার প্রস্তাব অতি অপূর্ব। লোভনীয়। তবে আমাকে দু-একদিন সময় দাও। আমার ভাইয়ের সঙ্গে একবার পরামর্শ করি।'

'বেশ। তবে তোমার শুভার্থী হিসেবে বলব, তুমি অ্যাকসেপ্ট করো। এখন তুমি যেভাবে আছ সে ভাবে থাকা মানেই মৃত্যুকে এগিয়ে আনা। আমরা সবাই একদিন মরব, এই সত্য স্বীকার করে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করতে করতেই মরা ভাল। টু ডাই ইন হারনেস।'

'তোমার সব কথাই ঠিক।'

'আর একটা পরামর্শ তোমাকে দোবো, এই বাড়িটা বেচে দাও। এখন ভালো দামই পাবে। টাকাটা ব্যাঙ্কে ফিকস্‌ড করে দাও। ভালো সুদ পাবে।'

'এ আমিও ভেবেছি। ধনহীনের বাড়ি একটা বোঝা। একটা পয়সাও পাওয়া যায় না, শুধু খরচ। আজ এটা সারাও, কাল ওটা সারাও। ভাবলে কী হবে সাত্যকি। মানুষের কতরকম মোহ! মাঝে মাঝে মনে হয়, চলে যাবার পর, বাইরের প্রস্তরফলক দেখে লোকে অন্তত বলবে, এই বাড়িতে কৃষ্ণপদ থাকত, শিল্পী কৃষ্ণপদ। বলা যায় না কোনও শিল্পরসিক বদান্য ব্যক্তি হয় তো একটা সংগ্রহশালা করে দিলে।'

'তুমিও যেমন। এদেশে আর সে মানুষ নেই। করলে করতে হবে স্টেটকে। তাঁরা তোমার শিল্প দেখবেন না, দেখবেন তুমি কোন্ রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী। দ্যাখো না আজকাল পথেব ধারে নর্দমার পাশে শহীদস্তম্ভ তৈরি হয়। আজকাল সব কিছুই বড় শস্তা। ভয়, ভক্তি, ভালবাসা সব কিছুই বড় খেলো হয়ে গেছে। এ যুগের কাছে কিছু প্রত্যাশা কোরো না।'

'তা ঠিক। বেশ, তোমার এ প্রস্তাবটাও ভাবা যাবে।'

'এই বার দ্বিতীয় কারণটা শোনো। তোমার যে কটা ক্যানভাস এখনও এ বাড়িতে আছে, সে কটা একটা আর্ট গ্যালারিতে ভালো দামে বিক্রি করে দাও। বাড়িতে ফেলে রাখলে নষ্ট হয়ে যাবে তদারকির অভাবে। আমাকে একজন অফার দিয়েছে। ভয় নেই আমি কমিশনের লোভে পড়ছি না। যোগাযোগ করিয়ে দোব তুমি সরাসরি দাম বুঝে নিয়ে তাদের হাতে তুলে দেবে।'

'যে কটা আছে, সে কটা যে আমার বড় প্রাণের ছবি।'

'জানি। শুধু আমি জানি না, আর্টের জগতের সবাই জানে। আর জানে বলেই তুমি চড়া দাম হাঁকতে পারবে। রোমান্টিক শিল্পী হিসেবে তোমার এখনও খুব নাম। তোমার জীবন নিয়ে কেউ উপন্যাস লিখলে অবাক হব না।'

'রোমান্টিক শিল্পী! হাসালে সাত্যকি। কোনও কালেই আমার মধ্যে রোমান্স ছিল না।'

'কেউ বিশ্বাস করবে না তোমার ওই কথা। একটা কাগজে তোমার জীবনী, তোমার আঁকা ছবি, তোমার স্ত্রীর ছবি বেরিয়েছে। সে খবর রাখো ?'

'না।'

'তোমাকে আমি কপিটা দোবো। পড়ে দেখো।'

'কার লেখা ?'

'ধরো আমারই লেখা।'

'তুমি এবার ক্যামেরা ছেড়ে কলম ধরেছ। আমাকে নিয়ে কোনও বাড়াবাড়ি করো নি তো ?'

'পড়লেই বুঝতে পারবে। তোমাকে আমি যত কাছ থেকে দেখেছি, অত কাছ থেকে আর কেউ দেখেছে কী না সন্দেহ। তুমি আমাকে ঘৃণা করলে কী হবে, আমি তোমাকে চিরকালই শ্রদ্ধা করি।'

সাত্যকির কথায় কৃষ্ণ ক্রমশ অভিভূত হয়ে পড়ছিল। একবার যা করা হয়ে যায় তা আর ফেরান যায় না। দেহের ক্ষত সেরে যায়, মনের ক্ষত সহজে সারে না। সারাবার কোনও ওষুধও নেই। সাত্যকির হাতে ধরে এতদিন পরে ক্ষমা চাইতে গেলে ব্যাপারটা আরও হাস্যকর

হয়ে উঠবে।

কৃষ্ণ আবেগ সামলে বললে, 'এতদিন পরে তুমি এলে কী খাবে বলো ?'

'কী আবার খাব ? তোমার লোক নেই, জন নেই, তোমাকেই কে খাওয়ায় তার ঠিক নেই। তুমি বলছ আমার খাবার কথা !'

'জানো আমি অসম্ভব ভালো মোগলাই রাঁধতে পারি। তোমাদের দু'একবার রেঁধে খাইয়েছি।'

'অস্বীকার করছি না। সে ছিল তোমার শখের রান্না, মজার রান্না। আর এ হল তোমার কাজের রান্না। আচ্ছা কৃষ্ণ, আজ তো চাঁদিনী রাত, তাই না।'

'কী জানি ভাই। আকাশে গত সাতদিন ধরে সদাসর্বদাই মেঘ। চাঁদ থাকাও যা, না থাকাও তাই। অন্ধের কী বা রাত্রি, কী বা দিন। হঠাৎ চাঁদের খবর।'

'কেন বলো তো ! ধরতে পারলে না ? হঠাৎ মনে হল অনেক দিন পরে অনেক আগের একটা রাত ফিরিয়ে আনলে কেমন হয় ? ধরো আজ আমি এখানেই রয়ে গেলুম। বাজারে গিয়ে বেশ জমিয়ে বাজার করে আনলুম। আমার রান্না তুমি কোনও দিন খাওনি। চাইনিজ রান্নায় আমার হাত খারাপ নয়। একটা পিকনিক মত হয়ে গেলে কেমন হয় ! তুমিই বলো দুঃখের মধ্যে থেকে কেউ যদি আনন্দ নিঙড়ে বের করে নিতে পারে তাতে আপত্তি কিসের ?'

'ঠিক। ঠিক বলেছ। জীবন, জীবন করে নাকে কাঁদার কোনও মানে হয় না। অন্যের অনিষ্ট না করে প্রাণ খুলে শুধু হেসে যাও। আমাদের জীবনে যা হবার, তা হয়ে গেছে। যা পাবার তা পাওয়া হয়ে গেছে। নতুন করে আর কিছু হবে না। তবে আর দুঃখ কিসের ! তাহলে শোনো সাত্যকি, চাঁদ থাকুক আর না থাকুক, দিনটা খুব একটা খারাপ নয়। দমকা ভিজে ভিজে বাতাস। ছাই রঙের আকাশ। এ তোমার কালিদাসের দিন। আজ তুমি থেকেই যাও। তোমার চাইনিজ আজ জমবে না। এসো দু'জনে মিলে বাঙালী খানা পাকাই। আমার ভাইটাকে বলে আসি। অনেক দিন পরে একটু আড্ডা মারা যাক। কী রাজি ?'

'আমার আপত্তি নেই। আমার মনের অবস্থা এখন কী হয়েছে জানো, যখন যেখানে থাকি সেইটাই আমার বাড়ি। যখন যে কাজ করি, সেইটাই আমার কাজ। আমার মনের আর কোনও বায়না নেই। জানো পরশু রাতে আমার দামী ক্যামেরাটা ছিনতাই হয়ে গেল। দু'দশ বছর আগে হলে ভীষণ মন খারাপ হত। এখন কী মনে হল জানো, যাক বাবা আপদ গেছে। ক্যামেরার কাজ শেষ। প্রয়োজন নেই তাই ঈশ্বর কেড়ে নিলেন।'

'এ তোমার কথার কথা, না প্রকৃত উপলব্ধির কথা ?'

'বিশ্বাস করো, সত্যিই আমার তাই মনে হল। অথচ দ্যাখো ক্যামেরাই আমার জীবিকা। রোজগার বন্ধ হয়ে গেল। টাকাও নেই যে নতুন আর একটা কিনব ! দুর্ভাবনায় ভেঙে পড়া উচিত। কিন্তু আমি মনের আনন্দে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আমি ভাই সার বুঝেছি, যিনি লেনেঅলা, তিনিই দেনেঅলা।'



॥ তিন ॥

চোখে চশমা। হাতে খবরের কাগজ। বাড়ির পেছন দিকের ঢাকা বারান্দায় বসে শিবপদ পৃথিবীর খবরে নিজেকে হারিয়ে ফেলার চেষ্টা করছে। বিশ্রী, মনমরা দিন। শিবপদ ঝলমলে রোদের ভক্ত। ঝকঝকে তারা-ভরা-আকাশের ভক্ত। জমজমাট সংসারের ভক্ত। যা চাওয়া যায় তার উল্টটাই পাওয়া যায়। বাড়ি যেন শ্মশান! নিঝুম নিস্তব্ধ। কোথাও কলের মুখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল পড়ছে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে ভেসে আসছে টুপ টুপ শব্দ। উঠে গিয়ে বন্ধ করে দিয়ে এলেই হয়। না থাক। তবু প্রাণহীন প্রাণের স্পন্দন।

ওদের কথা মনে পড়ছে। মন থেকে বিদায় করতে চাইলেও মনেই ফিরে আসছে। মনের অসংখ্য দরজা। কোনটাকে বন্ধ করবে! তনু তো খারাপ মেয়ে ছিল না। শান্ত, স্নিগ্ধ। মৃদু গলায় বাবা, বাবা করে ডাকত। ঠিক সাড়ে চারটের সময় এক কাপ চা ধরে দিত সামনে। তনুর মা-ও তো তেমন স্বার্থপর নন। শিক্ষিতা। এক সময় কোনও এক স্কুলের হেড মিস্ট্রেস ছিলেন। ভদ্র, স্বল্পভাষী। তাহলে এমন কেন হল। কে কালপ্রিট্? এর মধ্যে কালো ভেড়া কোনটি? এই ভাঙ্গনে তারও তো কোনও ভূমিকা নেই। অমিতাভই দায়ী। ছেলের নাম রেখেছিলুম অমিতাভ। নামে কী আর চরিত্র থাকে! লেবেল লাগালেই কী আর জিনিস খাঁটি হয়। অপরাধী আমিই। আমারই স্বার্থ, অহংকার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, রক্তের ধারায় মিশেছে। পিতা হবার আগে নিজেকে শোধন করা হয় নি। কম বয়েসে মানুষের ধমনীতে বিশুদ্ধ রক্ত প্রবাহিত হতে পারে না। মানুষ তখন নেশার ঘোরে থাকে।

শিবপদ ঘরে এসে ঘড়ির দিকে তাকাল। পাঁচটা বাজল। এইবার একটু চায়ের ব্যবস্থা করা যাক। কে বলেছে আমি একা। শিবপদ আয়নার সামনে দাঁড়াল। ওই তো আর একজন মানুষ। চারপাশে চারটে আয়না রাখলে চারজন মানুষ। এক চার হয়ে গেল। আমি থেকে অসংখ্য আমি। আমি নেই তো কেউ নেই। আবার আয়না ভেঙে চুরমার করে দাও, একা আমি।

বয়েস কত হল শিবপদ? ষাট বাষট্টি তো হবেই। যেমন করেই হোক দীর্ঘায়ু হতে হবে। আশীর আগে গেলে চলবে না। এই কুড়ি বছরে সংস্কৃতটা ভাল করে ঝালিয়ে নিয়ে বেদান্ত সাংখ্যটা বুঝে যেতে হবে। যাবার আগে এই সৃষ্টি রহস্যটা জেনে যেতে পারলে বারে বারে আর আসতে হবে না। অনর্থক আসা। অনর্থক যাওয়া। বদ্ধ-পুরুষ হয়ে জন্মেছি, মুক্ত পুরুষ হয়ে যেতে হবে। মায়ার ফাঁদে বড় দাসত্ব!

ধুপ করে একটা শব্দ হল। শিবপদ চমকে ফিরে তাকাল। সেই সাদা বেড়ালটা। কদিন হল যাওয়া আসা শুরু করেছে। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে সারা বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। শিবপদ মনে মনে হাসল, বড় বিপদে পড়েছিস, বড় উৎকণ্ঠা! তাই না রে পুসী! দাঁড়া, তোর একটা ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সুধা খুব বেড়াল ভালবাসত। কোথা থেকে সব এসে জুটতও তেমনি। সাদা, সাদা-কালো, সাদা-হলুদ। সকাল, সন্ধে মাছ-ভাতের ঢালাও ব্যবস্থা। বেড়াল-ভোজনের সেই

দৃশ্য এখনও চোখের সামনে ভাসে। ঘর একেবারে থই থই করছে। মিউ মিউ ডাক। সকলেই বলছে, মা খেতে দাও, মা খেতে দাও। সুধা বসে আছে ঘরের মাঝখানে। একটা কোলে, একটা পিঠে, একটা পায়ের ফাঁকে, একটা ন্যাজ খাড়া করে পিঠে পিঠ ঘষছে। সে এক অদ্ভুত দৃশ্য। মমতা মাখান সুধার মুখ। মনেই হত না পৃথিবীতে কোনও নিষ্ঠুরতা আছে, হিংসা আছে।

ঘরের মেঝেতে থেবড়ে বসে বেড়ালটা হাঁ করে আলমারির দিকে তাকিয়ে আছে। পেটটা ভারি হয়ে ঝুলে পড়েছে। শিবপদ বেড়ালটার দিকে তাকিয়ে বললে, 'তোর ক্ষমতায় হবে না মা, আমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে। মা হতে চলেছিস অথচ নিজের কোনও মুরোদ নেই। দাঁড়া তোর জন্যে সাংঘাতিক একটা আঁতুড় ঘর বানিয়ে দি।' শিবপদ আলমারির মাথা থেকে বেশ বড়মাপের একটা বাক্স নামাবার জন্যে হাত তুলেছে, এমন সময় বাইরে থেকে কৃষ্ণর গলা ভেসে এল, 'শিবঅ, শিবঅ।'

বাক্স আর নামান হল না।

কৃষ্ণ আর সাত্যকি বারান্দায় উঠে এল। দুজনেরই হাতে দুটো বড় আকারের বাজারের ব্যাগ।

'দেখো বন্ধু, কাকে ধরে এনেছি। গ্রেট সাত্যকি বোস। ফেমাস ক্যামেরাম্যান। ক্যামেরাটা অবশ্য নেই আর। পরশু দিন দেবতারা কেড়ে নিয়েছে। এখন চোখের লেন্সেই কাজ হচ্ছে।'

শিবপদ বললে, 'আসুন, আসুন। আপনার সঙ্গে তো আমার আগেই আলাপ হয়েছিল। অনেক দিন পরে এলেন।'

সাত্যকি বললে, 'তুমি ভাই আপনি শুরু করলে। প্রাণখুলে বসি কী করে! আমরা তো তুমির সম্পর্কে ছিলুম।'

শিবপদ বললে, 'অনেক দিন পরে দেখা হল তো! ও কিছুক্ষণের মধ্যেই ঠিক হয়ে যাবে।'

কৃষ্ণ বললে, 'শোন, আমরা এখন আর বসছি না। আজ রাতে আমাদের পিকনিক হচ্ছে! তুই ঘন্টাখানেক পরে, দোরতাড়া বন্ধ করে চলে আয়। আজ এক হাত হয়ে যাক। ভিজে দেশলাই অনেক দিন পরে ফস্ করে জ্বলবে। দুঃখ, দুঃখ। প্যানপ্যানানি আর ভালো লাগে না। আজ আমরা নাচবো, গাইবো। ফাটাফাটি করে ফেলবো।'

'বলিস কী! বর্ষার রাতের মেনু কী হবে?'

'সে যখন পাতে পড়বে দেখবে তখন।'

'পিকনিক তো চাঁদা করে হয়। আমার চাঁদাটা তাহলে নে।'

'চাঁদা আবার কী! তোর তো পাখির আহার? ভাগে পোষাবে না।'

'তোরা একটু বোস। আমি বিকেলের চা খাইনি এখনও। চা চাপাচ্ছি। এক কাপ করে এনার্জি নিয়ে যা।'

সাত্যকি বললে, 'প্রস্তাবটা মন্দ নয়। কৃষ্ণ তুমি কী বলো। তোমার ওই ফ্লাস্কের চা তেমন জমেনি বাপু!'

'বেশ, হয়ে যাক এক কাপ, কিন্তু একটা কণ্ডিশান, যৌথ প্রচেষ্টা। তৈরিতে আমরাও হাত লাগাব।'

'মাপ করো রাজা। তোমার হাতে ছবি খোলে। চা তেমন খোলে না।'

'হ্যাঁ, এটা তুই ঠিক বলেছিস। প্রতিবাদ করে লাভ নেই। বেশ আমরা তাহলে কাপ ধোবো।'

'ধোয়া আছে।'

'আমরা তাহলে যোগাড় দেবো। তুই রাজমিস্ত্রী আমরা জোগাড়ে।'

'ক্ষুদ্র যজ্ঞে বৃহৎ কাণ্ড করে লাভ নেই। আমার সব সাজানো আছে। তোরা বসে বসে গল্প কর। দশ মিনিট পরে আমি আবার আসছি।'

সাত্যকি বেতের গোল চেয়ারে বসতে বসতে বললে, 'অল রাইট, অলরাইট… ।'

আরও কিছু বলতে গিয়েও বলা হল না । দু হাত দিয়ে পেট চেপে ধরে সামনে দুমড়ে গেল । অসহ্য যন্ত্রণায় শরীর ছোট হয়ে আসছে । নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে । এ সেই ব্যথা । যে ব্যথাটাকে সাত্যকি ভীষণ ভয় পায় । যে ব্যথা সম্পর্কে এক এক বিশেষজ্ঞের এক এক মত । শেষ অভিমত লিভার-ক্যানসার । অন্য কোনও মানুষ হলে ভয়ে মরে যেত । সাত্যকি অন্য ধাতুতে তৈরি ।

কৃষ্ণ আর শিব দুজনেই দু'পাশ থেকে এগিয়ে এল । দু'জনে একই সঙ্গে প্রশ্ন করল, 'কী হল সাত্যকি ! কী হল তোমার ? অমন করছ কেন ?'

এই অবস্থায় সাত্যকির কথা বলার ক্ষমতা থাকে না । শরীরটাকে দু'ভাঁজ করে, দাঁতে দাঁত চেপে সহ্য করতে হয় । এই শাস্তি তার ভাল লাগে । বহুকাল আগে, যৌবনের মধ্য অবস্থায় এমন এক অপরাধ করে বসে আছে, মানুষের আদালতে যার বিচার হয়নি । হলে যাবজ্জীবন হয়ে যেত । ঈশ্বরের আদালতে সেই বিচার হচ্ছে এখন । এ জীবনেই সব চুকেবুকে যাক । মানুষের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় । সেই অতন্দ্র প্রহরীর চোখে ধুলো দেওয়া তত সহজ নয় ।

প্রশ্নের উত্তরে সাত্যকি কোনও রকমে একটা হাত তুলে বোঝাবার চেষ্টা করল, দাঁড়াও, যা বলার আমি বলছি পরে । বেতের চেয়ার ছেড়ে মাটিতে নেমে এল । দু হাঁটু ভেঙে শরীরটাকে প্রণামের ভঙ্গিতে মুচড়ে দিল সামনে । এইভাবে বেশ কিছুক্ষণ দাঁতে দাঁত চেপে থাকতে পারলে অনেক সময় কমে যায় । কুল কুল করে ঘাম বেরোতে থাকে । আর না কমলে শেষ অস্ত্র মরফিন ।

দু পাশে দু'জন অসহায়ের মত খাড়া । কী করবে বুঝতে পারছে না । সাত্যকির অবস্থা দেখে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে । নিজের কষ্ট যত না কষ্ট দেয়, অন্যের কষ্ট তার চেয়ে ঢের বেশী কষ্টের । দু'জনেরই সে অভিজ্ঞতা আছে । সুধার মৃত্যু দেখেছে শিবপদ । তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে সুধা । মাথায় টিউমার হয়েছিল । আর কৃষ্ণ দেখেছে কুমুর যন্ত্রণা । যখন ইলেকট্রিক শক দেওয়া হত । কুমুর দু চোখ বেয়ে জল গড়াত । শরীর কাঁপত । ধীরে ধীরে চেহারা শুকিয়ে এল । বর্ণ হয়ে গেল কালচে । যারা শক দিত তাদের মুখ আর উৎসাহ দেখে মনে হত খুব উপভোগ করছে । অপরের যন্ত্রণায় কেউ আনন্দ পায়, কারুর আবার বুক ফেটে যায় ।

সাত্যকি মেঝেতে অনেকক্ষণ দুমড়ে পড়ে রইল । এই সময়টায় তার চিন্তা আচ্ছন্ন হয়ে যায় । নিজের ওপর ভীষণ রাগ হয় । দেহের কারাগারে প্রাণপুরুষ পড়ে পড়ে বাঁধা মার খাচ্ছে । ঠিক যেমন করে সে একটি প্রাণের হত্যার কারণ হয়েছিল, ঠিক সেই একই ভাবে দগ্ধে দগ্ধে তাকেও মরতে হবে ।

এ ব্যথার একটা ঢেউ ওঠে । উঠতেই থাকে । চূড়ায় উঠে আবার ধীরে ধীরে নামতে থাকে । এক সময় মিলিয়ে যায় । মিলিয়ে গেলেও শরীরে আর কিছু থাকে না । দাঁড়াবার ক্ষমতা পর্যন্ত চলে যায় । মাঝে মাঝে তার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছে করে । পারে না । সাহসে কুলোয় না । যে জীবন যাবেই তার জন্যেও কী মায়া !

আনত অবস্থা থেকে সাত্যকি ধীরে ধীরে সোজা হল ।

কৃষ্ণ আর শিব দু'জনেই একসঙ্গে প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ তোমার কী হল বলো তো ?'

সাত্যকি ফিস ফিস করে বললে, 'মাঝে মধ্যে আমার এরকম হয় । বিচারকের চাবুক ।'

আর কিছু বলার ক্ষমতা নেই । বারান্দার রেলিং-এ পিঠ ঠেকিয়ে চোখ বুজিয়ে রইল । শরীর ঝিম ঝিম করছে ।

'কি করলে তুমি একটু সুস্থ হবে বলো ?'

'একটা মাদুরটাদুর কিছু এনে দাও আমি এইখানে কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি ।'

শিব বললে, 'এখানে শোবে কী ! মশায় ছিঁড়ে দেবে। তুমি ঘরে বিছানায় শোবে চল। পাখা খুলে দিচ্ছি।'

'বিছানা। না না এই তো মাটিই বেশ। আমার এই মাটিই বেশ।'

কৃষ্ণ বললে, 'তোমার অত সঙ্কোচের কোনও কারণ নেই। অসুস্থ হযে পড়েছ। চলো, ওঠো।'

সাত্যকি মাটিতে হাতের ভর রেখে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়াল। মাথা ঝিমঝিম করছে। পা কাঁপছে। কৃষ্ণ আর শিব দু'জনে দু'দিক থেকে ধরেছে।

শিবপদ নিজের বিছানায় সাত্যকিকে শুইয়ে দিল। পাখা ঘুরছে ফুল-স্পিডে। আলোয় সাত্যকির মুখ দেখে দু'জনেই চমকে উঠল। ফ্যাকাসে, রক্তশূন্য। দু চোখে কোনও দৃষ্টি নেই। মাথাটা ঝুলে পড়েছে বুকের কাছে। নিমেষে মানুষটা কেমন যেন হয়ে গেল। দেহের কলকব্জা বড় অদ্ভুত। না জেনেই মানুষের লম্ফ, ঝম্প।

'জলটল কিছু খাবে সাত্যকি ? একটু দুধ ? কোনও সঙ্কোচ কোরো না।'

'এখন কিছু চলবে না। চুপচাপ কিছুক্ষণ শুয়ে থাকি ভাই।'

'ডাক্তার ডাকবো ?'

'প্রয়োজন হলে বলব।'

'এটা কিসের ব্যথা ? আলসার ?'

'ক্যানসারও হতে পারে।'

'ডাক্তারবাবুকে ডাকি না সাত্যকি। তুমি অত কিন্তু হচ্ছ কেন ?' কৃষ্ণ অনুরোধের গলায় বলল।

সাত্যকি ক্ষীণ কণ্ঠে বললে, 'এর কোনও ওষুধ নেই ভাই। কেন ডাক্তারবাবুকে মিছিমিছি বিব্রত করা। এ ব্যথা ঢেউয়ের মত ওঠে। আবার মিলিয়ে যায়। একমাত্র ওষুধ সহ্য করা। তোমরা ভেব না।'

'ঘরের আলো জ্বলবে, না নিবিয়ে দেবো ?'

'নিবিয়ে দাও। আমার জন্যে তোমরা ভেব না ভাই।'

কৃষ্ণ আর শিব বাইরের বারান্দায় এসে হতাশ হয়ে বসে পড়ল। কী করবে বুঝতে পারছে না। চারপাশে পুট পুট করে আলো জ্বলে উঠছে। সকালের দমকা বাতাস এখনও মাঝে মাঝে বইছে। চারপাশের গাছপালায় বাতাসের ঝটকা লাগছে। ধোঁয়া ধোঁয়া প্রকৃতি। শিবপদর মনে পড়ল, আজ অমাবস্যা। ঘোর অন্ধকার রাত এগিয়ে আসছে।

কৃষ্ণ বললে, 'কী আশ্চর্য ব্যাপার দেখ, এক মুহূর্তে আমাদের সব পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। পিকনিক ! পিকনিক মাথায় উঠে গেল। আমরা অতি নিকৃষ্ট ধরনের দুর্ভাগা। যা চাই ঠিক তার উল্টোটা হয়।'

আমি সেই কারণে কিছুই আর চাই না।'

'সাত্যকির জন্যে কী করা যায় বল তো ?'

'প্রার্থনা।'

'ও যাই বলুক আমার মনে হয় ডাক্তারবাবুকে একটা কল দেওয়াই উচিত। কোনও ওষুধ নেই তা কখনও হয়। বিজ্ঞানের যুগ নিশ্চয়ই কিছু আছে।'

'তুই ভাবিসনি কৃষ্ণ। কিছুক্ষণ দেখা যাক। প্রয়োজন হলে ডাকা যাবে। তাছাড়া আমার হোমিওপ্যাথি আছে। বিপদে উতলা হলে, বিপদ আরও বেড়ে যায়।'

'আমি তাহলে বাড়ি থেকে একবার ঘুরে আসি। সব প্ল্যানই তো বদলে গেল।'

'যা, তোর কোনও চিন্তা নেই। আমি আছি।'

শিবপদ সাত্যকির ঘরে একবার উঁকি মারল। পাশ ফিরে শুয়ে আছে। জোরে জোরে

নিঃশ্বাস পড়ছে। না, বিরক্ত করা উচিত নয়। দেখাই যাক না কী হয়। ধীরে, নিঃশব্দে দরজার পাল্লা ভেজিয়ে শিবপদ রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে গেল। রান্নাঘরের ভেতর থেকে ক্ষীণ মিউ মিউ আওযাজ আসছে। কী রে পুসী তুই এরই মধ্যে মা হয়ে গেলি ! যাঃ।

শিবপদ ইতিউতি খুঁজতে লাগল। কানে একটা ঘড়ঘড় শব্দ আসছে। আনাজের খালি বাস্কেটের মধ্যে পুসী তিনটে বাচ্চা পেড়েছে। মা হয়ে তার কী গর্ব। ঘাড় উঁচু করে চোখ বুজিয়ে বাচ্চাদের দুধ খাওয়াচ্ছে। সব কটা বাচ্চাই ধবধবে সাদা। মায়ের পেটের কাছে দলা পাকিয়ে পড়ে আছে। পুসী মাঝে মাঝে গা চেটে দিচ্ছে। স্নেহ-পরিপূর্ণ জমাট একটি জীবনের আয়োজন। শিবপদর চোখ জুড়িয়ে গেল। কী আশ্চর্য এই পৃথিবী ! ও ঘরে জীবন মৃত্যুর লড়াই, আর এ ঘরে তিনটি বিন্দু-প্রাণ সবে ফুটে উঠল। কোনটা থাকবে, কোনটা যাবে জানে না কেউ !

শিবপদর চায়ের ইচ্ছে চলে গেছে। রাতের খাবার না হলেও চলবে। একটা মানুষ ও ঘরে যন্ত্রণায় ছটফট করবে আর এ ঘরে বসে সে খাবে, তা হতেই পারে না। অতখানি স্বার্থপর হতে পারলে সে অনেক কিছু করতে পারত জীবনে। পুসী চোখ বুজিয়ে বুজিয়ে একবার মিউ করল। শিবপদর কাছে মানুষের ভাষার চেয়ে এ ভাষা স্পষ্ট। অনেক ধকল গেছে পুসীর, মুখেব কাছে একটু দুধ ধরতে হবে।

নৌকোর মত দেখতে স্টেনলেস স্টিলের একটা পাত্রে শিবপদ খানিক দুধ ঢেলে পুসীর মুখের কাছে ধরল।

দুধে জিভ লাগাবার আগে পুসী আর একবার মিউ করল। এ মিউটা কৃতজ্ঞতার, ধন্যবাদের মিউ। ঘড় ঘড় শব্দ করছে। এ হল নির্ভরতার প্রকাশ। হৃদয়হীন পৃথিবীরও হৃদয় আছে, তা না হলে এতদিনে দানবে সব ধ্বংস করে ফেলত।

চেটেপুটে পাত্র সাফ করে, শিবপদর দিকে ঢুলুঢুলু চোখ তুলে পুসী আর একবার মিউ করে উঠল।

শিবপদ বললে, 'হ্যাঁ, মিউ। তুমি এবার তোমার কাজ করো। আবার রাতে দুধ পাবে।'

শিবপদ পেছনের বারান্দায় এসে ওপর দিকে তাকাতেই গাটা ছমছম করে উঠল। দোতলার বারান্দা থেকে রঙীন একটা শাড়ি ঝুলছে। বাতাস লেগে ফুলে ফুলে উঠছে। জোরে বাতাস লাগলে অশরীরী আঁচলের মত ভুস্ করে উড়ে গিয়ে বেলগাছের ডাল ছুঁয়ে আসছে। এ তনুর শাড়ি। ভিজে ছিল। মেলে দিয়ে গেছে। নিয়ে যায় নি। এতক্ষণ তার নজরে পড়েনি ! প্রাচীন বিশ্বাসের মানুষ। কেমন যেন আতঙ্ক হচ্ছে। যে মেয়ে মা হতে চলেছে, সন্ধেবেলা তার শাড়ির আঁচল বেলগাছে ঠেকছে। না, এ তো ভাল নয়। হয়তো কুসংস্কার ! কিন্তু কোনটা কু, আর কোনটা সু, বিচারের দিন কী এসেছে ! কে তুলবে ! এখুনি তোলা দরকার। কিন্তু পুত্রবধূর শাড়িতে সে হাত দিতে পারবে না। বড় বিপদ হল।

বাইরের বারান্দা থেকে বাচ্চা মেয়ের গলা ভেসে এল, 'দাদু, ও দাদু।'

ফ্রকপরা তের চোদ্দ বছরের একটি মেয়ে। টান টান করে আঁচড়ে চুল বেঁধেছে। কপালে গোল একটা টিপ। আলো পড়ে চিকচিক করছে। হাতে একটা অ্যালুমিনিয়ামের টিফিন কৌটো। শিবপদ প্রথমে চিনতে পারে নি। তারপর চিনতে পারল, মেয়েটি দেবীর বাড়িতে কাজ করে। নাম দুর্গা।

'কী রে মা ?'

'এই নিন দিদি পাঠিয়ে দিলে।'

'তোতা কেমন আছে রে দুর্গা !'

'একটু ভাল। বিছানায় উঠে বসেছে। এতক্ষণ আমার সঙ্গে লুডো খেলছিল। আপনি যাবেন না ! আপনাকে ডাকছে।'

'যাব তো ভেবেছিলুম মা, এদিকে এক ঝামেলায় পড়েছি। তুই আমার একটা উপকার করবি দুর্গা ?'

'বলুন ?'

'ভেতরে আয়।'

শিবপদ দোতলায় উঠছে। পেছনে দুর্গা। মাথায় গন্ধ তেল মেখেছে। যুঁই ফুলের গন্ধ বেরচ্ছে। হঠাৎ শিবপদর মনে হল, গৃহিণী গৃহমুচ্যতে। সামান্য তের-চোদ্দ বছরের একটা মেয়ের পা পড়ায় বাড়িটা কেমন যেন কোমল হয়ে উঠেছে। এতক্ষণ বড় কর্কশ লাগছিল।

শিব বারান্দার দরজা খুলল। দমকা বাতাসে দেয়ালের ক্যালেণ্ডার ঝটপটিয়ে উঠল। মেঘে ঢাকা আকাশ অনেক নিচে নেমে এসেছে। বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেড়াতে যাবার ছড়িটা ওপর দিকে তুললেই যেন আকাশের গায়ে লেগে যাবে। বারান্দার সামনে ঝাঁকড়া বেলগাছ। ছোট ছোট বেল ধরেছে অসংখ্য। ক্ষুদে সন্ন্যাসীর নেড়া মাথার মত। সাদা মত একটা পাখি নিঃশব্দে উড়ে গেল। লক্ষ্মী প্যাঁচা।

ফিনফিনে পাতলা, মাকড়সার জালের মত একটা শাড়ি ঝুলছে। শিব বললে, 'দুর্গা তুই এই শাড়িটা তুলে পাট করে রাখতে পারবি ? আমি আর হাত দেব না।'

দুর্গা মৃদু স্বরে বললে, 'হ্যাঁ', মেয়েটা খুব আস্তে কথা বলে। ভদ্রঘরের মেয়ে। দুর্গার বাপ এখন জেলে। ব্যাংক ডাকাতি করতে গিয়ে ধরা পড়ে গেছে। দুর্গার জ্যাঠা আর কাকা, মা আর মেয়েকে দূর করে দিয়েছে। শিবর কানে যা এসেছে। দুর্গার মায়ের স্বভাব-চরিত্র তেমন ভাল নয়। মেয়েটা কিন্তু ভারি সুন্দর। দুর্গার মা না-কি দেবীকে বলে গেছে, দিনকাল ভাল নয়, উঠতি বয়েসের মেয়ে। একদম বাইরে বেরতে দেবেন না।

শিব ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে। এই ঘরেই ওরা থাকত। কিছুই নিয়ে যায়নি : সবই পড়ে আছে। উচ্চ বর্ণের আবাসস্থলে এই সব মধ্যবিত্ত আসবাবপত্র অচল। ওই খাট। এই ড্রেসিং টেব্‌ল। আলনা। দেরাজ। দেয়াল থেকে একটা ছবি খুলে নিয়ে গেছে। দাগ দেখে বোঝা যায়। সব মায়া।

দুর্গা শাড়িটা পাট করে এনেছে। 'কোথায় রাখব দাদু ?'

শিব দেরাজ-এর একটা টানা ধরে সামান্য টান দিতেই খুলে আর একটু হলেই পায়ে পড়ে যাবার মত হচ্ছিল। ধরে সামলে নিল। জামা-কাপড় সব নিয়ে গেছে। টিকটিকির ডিমের মত উড়ে-যাওয়া গোটাকতক ন্যাপথালিন বল গড়াগড়ি যাচ্ছে।

'এইখানে রাখ।'

দুর্গা রাখতে রাখতে বললে, 'একটু ভিজে ভিজে আছে।'

'থাক, আজকালকার অসূতী শাড়ি, কিছু হবে না।'

দুর্গা বললে, 'আমি এবার যাই।'

'দুর্গা তুই লেখা-পড়া করিস ?'

'হ্যাঁ।'

'তোর বইটই সব আছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কাল থেকে তুই আমার কাছে পড়তে আসবি। সকাল, বিকেল, দুপুর, যখন তোর সময় হয়।'

'আপনি পড়াবেন ?'

'হ্যাঁ, আমার অফুরন্ত সময়। তোকে দিয়ে শুরু করব। তারপর ধীরে ধীরে একটা ফ্রী স্কুল হয়ে যাবে। তোর দিদিকে ওই রাবিশ চাকরি ছেড়ে দিতে বলব। সুযোগ যখন আছে তখন মানুষ হবার প্রাণপণ চেষ্টা কর দুর্গা। আমাদের বড় দুঃসময় যাচ্ছে রে ! ধীরে ধীরে আমাদের

সব শেষ হয়ে আসছে।'

দুর্গা চলে গেল। শিবপদ দরজা বন্ধ করে দেবীর পাঠান কৌটোটা খুলে দেখল। ভুর ভুর গন্ধ। চিঁড়ের পোলাও। যাক, রাতের ব্যবস্থা হয়ে গেল।

ঘর থেকে সাত্যকির ক্ষীণ কণ্ঠ ভেসে এল, 'কৃষ্ণ।'

শিবপদ ভেজান দরজা খুলল। বিছানায় সাত্যকি ছটফট করছে। বিছানার পাশে দাঁড়িয়ে শিবপদ বললে, 'কৃষ্ণ কিছুক্ষণের জন্যে বাড়ি গেছে। এখন কেমন বোধ করছ সাত্যকি।'

'ভাই, আর বোধহয় হল না। সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে।'

সাত্যকি হাঁপাতে লাগল।

'আমি ডাক্তারবাবুকে একবার ডেকে আনি।'

ছোট্ট একটা অ্যামপিউল শিবপদর হাতে তুলে দিয়ে বল'লে, 'ফুঁড়ে দিলেই ঠিক হয়ে যাবে।'

'তুমি আর একটু সহ্য কর। আমি যাব আর আসব।'

শিবপদ পাঞ্জাবি চাপিয়ে বেরতে যাবে, সারাদিনের থমকে থাকা আকাশ রুদ্র রোষে ভেঙে পড়ল। যেমন বৃষ্টি তেমন উদ্দাম বাতাস। ঘোলাটে আকাশে আগুনে রঙ। নারকেল গাছের মাথা বাতাসের দাপটে শুয়ে শুয়ে পড়ছে। দোতলার দিকে যে যুঁই গাছটা উঠতে উঠতে প্রায় ছাদ ধরে ফেলেছিল, ঝড়ের বেগে এক একবার তিনচার হাত পাশে সরে যাচ্ছে। গাছটা আর থাকবে না। এবার ছিঁড়ে পড়ে যাবে।

বেরবার দরজার মুখে শিবপদ থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল। বৃষ্টি না কমলে বেরন যাবে না। ডাক্তারও আসতে পারবেন না। হঠাৎ তার মনে পড়ল, দেবী ইনজেক্শান দিতে জানে। দেবীর বাবার ডায়াবিটিস ছিল। রোজ রোজ ইনজেকশানের খরচ বাঁচাবার জন্যে মেয়েকে ট্রেনিং দিয়েছিলেন। দেবীর খুব সাহস। বিপদে পড়তে পড়তে মানুষ সাহসী হয়ে ওঠে। সাজসরঞ্জাম দেবী এখনও বজায় রেখেছে। হাতও চালু আছে। কিন্তু অ্যামপিউলটা কিসের? দেখা দরকার।

ঘরে এসে শিবপদ দেখবার চেষ্টা করল। ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষর। চোখ চলে না। অনেক কষ্টে পড়ল, মরফিন। একটু দুশ্চিন্তা হল। ইনজেকশান নেবার পর রুগির ভালমন্দ যদি কিছু হয়ে যায়! কী আর হবে! এ যুগের মানুষ তো নীলকণ্ঠ।

পাঞ্জাবি খুলে মালকোঁচা মেরে নিল। ছাতায় কিছু হবে না। তবু যদি মাথাটা বাঁচে! বাতাসের ঝটকায় ছাতা উল্টে যেতে পারে। যায় যাবে। ভাবার সময় নেই। সাত্যকির দম বন্ধ হয়ে আসছে।

শিব সদরে তালা লাগাল। বারান্দা ছেড়ে নিচে, বাগানের পথে নামার সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারল প্রকৃত দুর্যোগের রাত। একেই বলে আকাশ ভেঙে পড়া। ছাতায় এত জোরে জল পড়ছে, মনে হচ্ছে তুবড়ে যাবে। রাস্তায় পা দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমের বাতাসে ছাতা উল্টে গেল। সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে মনে হল মুক্তপুরুষ। আশ্রয়হীনের মত মুক্ত কে আর আছে। ছত্রাকার ছাতা বগলে চেপে শিবপদ স্বাভাবিক গতিতে দেবীদের বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল। একেবারে স্নান হয়ে গেছে। শীত করলেও বেশ তাজা লাগছে। রাস্তায় যেন নদী বইছে। প্রচণ্ড ঝড়-বৃষ্টির সময় আকাশে একটা আলো জাগে। ভূতুড়ে আলো।

দরজার কড়া বার কতক নাড়তে হল। দেবীর গলা পাওয়া গেল, 'কে?'

'আমি শিবপদ।'

দেবী আবার জিজ্ঞেস করল, 'কে আপনি?'

'আমি শিবপদ বউমা।'

ইদানীং দেবীকে একটু সাবধানী হতে হয়েছে। পরলোকগত স্বামীর সহকর্মী শশধর ভীষণ কর্তব্যপরায়ণ হয়ে উঠেছে। পাওনাগণ্ডা আদায়ের ব্যাপারে যথেষ্ট সাহায্য করেছিলেন

ভদ্রলোক। অস্বীকার করলে লোকে অকৃতজ্ঞ বলবে। তখন ভাবা গিয়েছিল মানুষটি নিঃস্বার্থ পরোপকারী। আসলে মানুষটি নির্ভেজাল শয়তান। লোকটির কথা ভাবলেও দেবীর বুক কেঁপে ওঠে। গত বছর এমনি এক ঝড়ের রাতের স্মৃতি সহজে মুছে ফেলা যাবে না। কোনও সময়ই তার অসময় নয়। ঝড়, জল, দিবা, দ্বিপ্রহর, কিছুই সে মানে না। তার তাকানোয় যে কোনও মহিলা উলঙ্গ হয়ে যায়, এমন বিশ্রী তার চোখের দৃষ্টি। এই নেকড়ের সমাজে কী কষ্টে যে বেঁচে থাকতে হয়, দেবী তা হাড়ে হাড়ে জানে।

দেবী সাবধানে দরজার একটা কপাট ফাঁক করতেই হু হু করে জলের ছাট আর বাতাস ঢুকতে লাগল। আর ঠিক সেই মুহূর্তে ঝলসে উঠল বিদ্যুৎ। নীল আলোয় শিবপদকে মনে হল কাঁচের মানুষ।

'আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন। এঃ একেবারে চান হয়ে গেছেন।'

শিবপদ ঢুকবে কি ঢুকবে না ভাবছে। ভিজে জামাকাপড়ের জলে ঘরদোর ভেসে যাবে। বগলে আবার ত্রিভঙ্গ মুরারী ছাতা। দেবী হাত ধরে টেনে আনল ভেতরে।

'এই বৃষ্টিতে আপনি বেরলেন কেন বাবা?'

ভেতরের ঘর থেকে তোতা চিৎকার করে উঠল, 'দাদাই, দাদাই।'

দেবী বললে, 'আপনি পাপোশে দাঁড়ান। আমি তোয়ালে আর শুকনো কাপড় নিয়ে আসি।'

শিবপদ বললে, 'সে সময় নেই। তোমাকেও আমার সঙ্গে ভিজতে হবে। তোমার সেই ইনজেকসান দেবার সাজসরঞ্জাম তৈরি আছে?'

'আছে। কেন বলুন তো!'

'বিকেলে অনেক বছর পরে আমাদের এক বন্ধু এসে হঠাৎ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েছে। অসহ্য পেটের যন্ত্রণা। কাটা পাঁঠার মত ছটফট করছে। একটা ইনজেকসান দিতে হবে। এখুনি দিতে হবে। ইনজেকসান ও সঙ্গে নিয়েই ঘোরে।'

'আপনি দাঁড়ান। আমি সিরিঞ্জ নিয়ে আসছি।'

দেবী ভেতরে চলে এল। তোতা চিৎকার করছে। 'দাদাই, তুমি আমার কাছে আসবে না!'

'দিদি আমি ভিজে চান করে গেছি। তুমি খেলা কর। আমরা একটা কাজ সেরে আসছি।'

'আমি তোমার কাছে যাব।'

'না, দিদি। এখন একদম ঠাণ্ডা লাগানো চলবে না। আবার জ্বর এসে যাবে।'

দ্রুতপায়ে দেবী এগিয়ে এল। সঙ্গে একটা বড় ছাতা।

'চলুন বাবা। ছাতাটা বড় আছে, দু'জনেরই মাথা বাঁচবে।'

'আমার মাথা আর বাঁচাবার দরকার নেই মা। আমি তো চান করেই গেছি।'

দু'জনে জনশূন্য রাস্তায় নেমে এল। খোলা ছাতাটা শিবপদর হাতে দিয়ে বলল, 'আপনি ধরুন। সামলাবার ক্ষমতা আমার নেই।'

পেছন থেকে বাতাস ঠেলা মারছে।

ছাতা সামলাতে সামলাতে শিবপদ বললে, 'তুমি আমার বাঁদিকে চলে এস।'

দেবী আঁচলটাকে কোমরে ভাল করে জড়িয়ে নিয়েছে। শাড়ির নিচের দিকটা টেনে পায়ের গোছের ওপর তুলতে হয়েছে। তা না হলে হাঁটা যাচ্ছে না। দেবী সাধারণ বাঙালী মহিলার চেয়ে লম্বা। প্রায় শিবপদর মাথায় মাথায়। ছিপছিপে সুন্দর। শরীর এখনও ভাঙেনি। বরং দিনে দিনে সুন্দর হচ্ছে। অত্যাচারী না হলে দুর্ভোগেও শরীর সুন্দর হতে থাকে। শিবপদর তাই ধারণা।

পাশাপাশি প্রায় দেহলগ্ন হয়ে হাঁটতে হাঁটতে শিবপদর মনে হল, সে কী তার পুত্রবধূর এত কাছাকাছি আসতে পারত কোনও দিন! অহংকার বিসর্জন দিতে পারলে সকলেই কাছের, অন্তরের। অহংকারে আপন দূর হয়ে যায়। বৃষ্টি-ধোয়া চকচকে পথ বহুদূরে চলে গেছে। তবে

দু'জনের হাঁটা খুবই সংক্ষিপ্ত। বেশ লাগছিল শিবপদর। জীবনকে ভাগ করে নিতে পারলে বেঁচে থাকা খুব সুখের। তখন দুঃখেও মন গান গেয়ে ওঠে। চোখে জল, অথচ মুখে হাসি।

এই মুহূর্তে বিরাট পৃথিবী খুব ছোট হয়ে এসেছে, একটি ছাতার সীমানায়। জলের গণ্ডী ঘিরে রেখেছে দু'জনকে। মাথা ছাড়া দেবীর পুরো শরীরই ভিজে গেছে। শিবপদর হাতে দেবীর বাহু ঠেকলে চমকে উঠছে। এত শীতল। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে। দেবীর মুখ তখন স্পষ্ট হচ্ছে। রাতের মত রাত। বর্শার ফলার মত বৃষ্টি মাটি বিঁধছে। আক্রোশে নয়। ভালবেসে। স্নেহের আক্রমণ।

হঠাৎ দেবী বললে, 'সেদিনও ঠিক এমনই রাত ছিল। এর চেয়েও বেশি দুর্যোগ।'



॥ চার ॥

দূর থেকে শিবপদর বাড়িটাকে দেখাচ্ছে লাইট হাউসের মত। যেন আলোকিত বিশাল এক খণ্ড বরফ। ইচ্ছে করে সব কটা আলোই জ্বেলে রেখে গিয়েছিল। দরজার তালা খুলে দেবীকে বললে, 'তুমি আগে ঢোকো।' দেবী এতক্ষণ শিবপদর মাথায় ছাতা ধরে ছিল। শিবপদ ছাতাটা নিয়ে মুড়তে মুড়তে বললে, 'তুমি এই বারান্দায় দাঁড়াও। আমি আগে একটা তোয়ালে আর শুকনো শাড়ি আনি।'

'এমন কিছু ভিজিনি।'

'ভিজে সপসপ করছ।'

ব্লাউজের পিঠের দিকটা ভিজে শরীরের সঙ্গে সেঁটে গেছে। শাড়ি লেপ্টে গেছে তলার দিকে।

'শাড়ি আপনি পাবেন কোথায়?'

'আছে। একখানা শাড়ি তোমার জন্যেই আছে।'

শিবপদ ভিজে পাঞ্জাবি কোনও রকমে টেনে খুলে বারান্দার রেলিং-এ ঝুলিয়ে দিল। কোঁচাটা নিংড়ে নিল বাইরে। বারান্দা জলে ভাসছে। চেয়ার-টেয়ার সব ভিজে গেছে। কোনও দিকে না তাকিয়ে সোজা উঠে গেল দোতলায়। দেরাজের ড্রয়ার টেনে দুর্গার পাট করে রেখে যাওয়া শাড়িটা তুলে নিল। একটু ইতস্তত হচ্ছিল। মেয়েদের ব্যবহার করা জিনিসে হাত দিতে ইচ্ছে করে না। এখন আর ভাববার সময় নেই।

দেবী শাড়িটা হাতে নিয়ে বললে, 'বাবা, এ যে খুব দামী শাড়ি।'

'আমার কোনও ধারণা নেই। তুমি আগে পালটে নাও। আমি ঘরে যাচ্ছি।'

'বাবা, আমি বরং বাথরুমে যাই। এখানে ভীষণ ছাট আসছে।'

'বেশ বেশ তাই যাও। সোজা গিয়ে ডানদিকে।'

দেবী পাপোশে পা মুছে, ভেতরে চলে গেল। শিবপদর এইবার শীত শীত করছে। গরম এককাপ চা বা কফি খাবার ভীষণ ইচ্ছে করছে। সাত্যকির ইঞ্জেকশনটা হয়ে যাক, তারপর দেখা যাবে। শিবপদ গেঞ্জি খুলে মাথা মুছল। এই বয়েসে এক মাথা চুল নিয়ে মহা বিপদে পড়েছে। যে বয়েসের যা। এই বয়েসে টাকই ভাল।

দেবী পেছন থেকে বললে, 'নিন চলুন। একেবারে আদুর গা হলেন কেন ? ঠাণ্ডা লেগে যাবে না !'

'আমার ওষুধ আছে। চারগুলি খেয়ে নেব। গরম জল দিয়ে। তোমাকে খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। নাও চলো। জামাটা তো ভিজেই রইল।'

'ও কিছু হবে না। জল টেনে যাবে।'

'সেইটাই তো ভয়ের। বুকে ঠাণ্ডা লেগে যাবে।'

শিবপদ ধীরে, সন্তর্পণে সাত্যকির ঘরের দরজা খুলল। হাতখানেক তফাতে দেবী। শিবপদ ভেতরে না ঢুকে দরজার কাছেই থমকে রইল। সাত্যকির মাথাটা খাটের বাইরে ঝুলছে। দাঁতে চাপা একটা রুমাল। একটা হাত দিয়ে ধরে আছে খাটের মাথা। আর এক হাত দিয়ে খামচে ধরেছে বিছানার চাদর। চোখদুটো কেমন যেন উল্টে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ নেই। প্রশস্ত বুক ওঠা-নামা করছে না। মাথার দিকের টেবিলে রাখা এক গেলাস জল উল্টে আছে। গেলাসটা আর একটু গড়ালেই মেঝেতে পড়ে চুরমার হয়ে যাবে। ঢালু বেয়ে জল গড়িয়ে এসেছে দরজার দিকে।

শিবপদ মৃদু গলায় ডাকল, 'দেবী।'

পেছন থেকে দেবী বললে, 'কী হল ?'

শিবপদ একপাশে সরে গিয়ে বললে, 'দ্যাখো। তোমার কী মনে হচ্ছে !'

দেবী এক নজর দেখেই বললে, 'মনে হচ্ছে মারা গেছেন।'

'এখন ? এখন তাহলে কী হবে ?'

দেবী সহসা কোনও উত্তর দিতে পারল না। নানা রকম আশঙ্কা তার মনে উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। মৃত্যুর পথ ধরে মানুষ সহজেই পালাতে পারে। সমস্যা হল ফেলে রেখে যাওয়া দেহ নিয়ে।

শিবপদ ধরা-ধরা গলায় ডাকল, 'দেবী।'

'বলুন বাবা ?'

'কী হবে ? কী করা যায় এখন। আমার যে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে মা। ওই দ্যাখো, শেষ সময়ে এক ঢোঁক জল খাবার চেষ্টা করেছিল। শক্তিতে কুলোয় নি। কোনও রকমে একটা রুমাল দাঁতে চেপে ধরেছিল। অসহ্য যন্ত্রণায় বিছানার চাদর খামচে ধরেছিল। আমার মনে হয় যন্ত্রণায় হার্টফেল করেছে। এঃ শেষ সময়টায় আমরা কেউ পাশে রইলুম না !'

শিবপদ দু চোখে হাত চাপা দিল।

'বাবা, এখন আর ভাবলে চলবে না। কিছু একটা কবতে হবে। আর সে করাটা হল ডাক্তার ডাকা। এই দুর্যোগে আপনাকে আর বেরতে হবে না। আমি যাচ্ছি। আমি ডক্টর সান্যালকে নিয়ে আসছি।'

'বলছ কী ? আমি থাকতে তুমি যাবে। তুমি একা কিছুক্ষণ থাকতে পারবে ? পারবে মা ? আমি তাহলে কৃষ্ণকে একবার ডেকে আনি।'

'পারবো বাবা।'

'ভয় করবে না ?'

'একটুও না।'

শিবপদ বেরিয়ে গেল। জুতো পায়ে দেবার কথাও মনে রইল না। বৃষ্টি সামান্য ধরে এলেও ঝোড়ো বাতাস বইছে। একবার মাত্র মনে এসেছিল বিশ্রী একটা ঝামেলায় জড়িয়ে পড়তে হল। এখন আর সেসব মনে হচ্ছে না। এখন মনে হচ্ছে, যার যেখানে জমি কেনা থাকে ! সাত্যকির কী অসম্ভব মনের জোর। এই রকম সাংঘাতিক এক ব্যাধি নিয়ে কেমন হাসি মুখে ঘুরে বেড়াচ্ছিল ! অসুখের প্রসঙ্গ একবারও তোলেনি। এইসব ভাবতে ভাবতে শিব কৃষ্ণর

বাড়ির দিকে এগোতে লাগল। কোথায় পা পড়ছে খেয়াল নেই। দেবীর ছাতাটা নিলে ও। ছাতায় ছাট আটকানো যায় না।

শিবপদ চলে যাবার পর দেবী বুঝল, নিজেকে যতটা সাহসী ভেবেছিল ততটা সাহসী সে নয়। ভয় ভয় করছে। নিজের স্বামীর কাটা ছেঁড়া, পোড়া, ঝলসানো মৃতদেহ আগলে এক রাতে সে অনেকক্ষণ বসেছিল। ভয় পায়নি। না পাবার একমাত্র কারণ, শোকে, দুঃখে, বেদনায় স্বাভাবিক বুদ্ধিবৃত্তি হারিয়ে গিয়েছিল। আজ তো মনের সে অবস্থা নয়। দেবী যেখানে বসে আছে সেখান থেকে সাত্যকির দেহ স্পষ্ট চোখে পড়ছে। বড় অদ্ভুত ভঙ্গীতে মরেছে। দাঁতে রুমাল। মাথাটা ঝুলে আছে। চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে এসেছে। শরীর টান টান। যেন একটা ধনুক ছিলা ছিঁড়ে পড়ে আছে।

পেছন দিকের বাগানে ঝপাস করে একটা শব্দ হল। যেন বিশাল একটা পাখি উড়তে না পেরে ডানা মুড়ে পড়ে গেল। দেবী চমকে উঠেছিল। সামনে কেউ থাকলে নির্ঘাত জড়িয়ে ধরত ভয়ে। বুকের ভেতর ধকধক শব্দ হচ্ছে। কিসের এমন শব্দ বোঝার চেষ্টা করল। ঝড়ে নারকেল গাছের পাতা পড়ল। মাঝে মাঝে বাতাস সিঁ সিঁ শব্দ করছে। দেবী আর বসতে পারল না। ঘরে পায়চারি শুরু করল। একবার ভাবলে, সাত্যকি যে ঘরে রয়েছে সেই ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দেয়। পরক্ষণেই মনে হল, ভয়ের জিনিস চোখের সামনে রাখাই ভালো।

দেবী ঘুরে ঘুরে ঘরের জিনিস দেখতে লাগল। দেয়ালে ঝোলান ছবি। কাঁচের শো-কেসে রাখা নানা রকম পুতুল। কাঁধে জাল ফেলে জেলে মাছ ধরতে চলেছে। এক বৃদ্ধ বসে বসে তামাক খাচ্ছে। ছেলে কোলে নিয়ে মা বসে আছে পা ছড়িয়ে। একটা কুকুর শুয়ে আছে জিভ বের করে। একটা উট চলেছে মুখ তুলে। প্রথমে দেখতে দেখতে তার বেশ মজাই লাগছিল। হঠাৎ গা-টা কেমন ছমছম করে উঠল। কাঁচের আলমারির ভেতর নিঃশব্দে পড়ে আছে প্রাণহীন এক জগৎ। ভঙ্গি আছে গতি নেই।

বাইরের বারান্দায় কী একটা শব্দ হল। কেউ যেন পা টিপে টিপে হাঁটছে। দেবীর মেরুদণ্ডে শীতল এক স্রোত বয়ে গেল। একা থাকার প্রস্তাবে রাজি হয়ে খুব ভুল করেছে। সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। কেউ যদি হঠাৎ নেমে আসে সাদা বোরখা পরে! কী করবে দেবী? মৃত ওই মানুষটি হঠাৎ বিছানায় উঠে বসে যদি বলেন, এক গেলাস জল। কী করবে দেবী! ক্রমশই দেবীর চিন্তাশক্তি কমে আসছে। কেবলই মনে হচ্ছে, পেছনে কেউ এসে দাঁড়িয়েছে। ঘাড়ের কাছে মৃদু নিঃশ্বাস পড়ল যেন। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখার মত সাহস নেই তার। ছোট্ট আলমারির সামনে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সেই বিশ্রী বুড়োটা মাঝে মাঝে স্প্রিং-এর ঘাড় নাড়ছে। যেন সব বোঝে, সব জানে।

দমকা একটা বাতাসে দরজা জানলা কেঁপে উঠল। বিদ্যুতের ঝিলিকে সিঁড়ির ধাপ নীল হয়ে গেল। বাঁকের মুখে দেয়ালে ঝোলান একটু ছবি সাদা হয়ে আবার অন্ধকারে মিলিয়ে গেল। ভীষণ শব্দে কাছাকাছি কোথাও বাজ পড়ল। ঘরের সমস্ত আলো নিবে গিয়ে জ্বলে উঠল পরক্ষণেই। সমস্ত আলো হঠাৎ নিবে গেলে দেবী কী করবে! আলো নেবার কথা মনে হতেই, দেবীর ইচ্ছে হল ছুটে রাস্তায় বেরিয়ে যায়। বাবা সেই গেছেন তো গেছেন! কী করছেন এতক্ষণ!

বাইরের বারান্দায় আবার শব্দ হল। এবার বেশ স্পষ্ট। সাহস করে দেবী বারান্দার দিকে একবার তাকাল। বুকটা ছাঁত করে উঠল। দরজার সামনে কার একটা ছায়া পড়ে আছে। যার ছায়া তার গায়ে একটা আলখাল্লা চাপান আছে। পাশে টেবিলেব ওপর বাইরের দরজায় লাগাবার ভারি তালা। দেবী তালাটা হাতে তুলে নিল। প্রয়োজন হলে ছুঁড়ে মারবে। এটুকু তার জানা আছে অশরীরীর ছায়া পড়ে না।

দেবী কাঁপা কাঁপা গলায় বললে, 'কে? কে ওখানে?'

কোনও উত্তর এল না। ছায়াও কাঁপল না। দরজার দিকে ছুঁড়ে মারার জন্যে দেবী তালাটা তুলেছিল, এমন সময় ছায়াটা দ্রুত সরে গেল। বাইরে ঝলসে উঠল নীল বিদ্যুৎ। আবার বাজ পড়ল। এবার আরও কাছে। দেবীর মনে হল একটা অভিশাপ ঘিরে আসছে চারপাশ থেকে।

এইবার বেশ জোরে পায়ের শব্দ হল। দেবী দম বন্ধ করে দাঁড়িয়ে আছে। ছাতা বন্ধ করার শব্দ হল। দরজার সামনে শিবপদ। পেছন থেকে আলো পড়ে চুলে লেগে থাকা জলের ফোঁটা হীরের মত চকচক করছে। তালাটা কোনও রকমে টেবিলে নামিয়ে রেখে দেবী ছুটে গিয়ে শিবপদর বুকের ওপর আছড়ে পড়ল। এতক্ষণের শাস্তির অবসান। শিবপদকে দু' হাতে জড়িয়ে ধরে বুকে মুখ গুঁজে রইল শিশুর মত।

দেবীর মাথায় হাত রাখল শিবপদ। আলগা খোঁপা ভেঙে পড়ল পিঠের ওপর। চুলের ঢল নেমে গেল কোমর ছাপিয়ে আরও নিচে।

শিবপদ দেবীর পিঠে হাত রেখে বললে, 'কী হল? ভয় পেয়েছ মা?'

দেবীর চোখে জল এসে গেছে। শিবপদর বুক থেকে মাথা তুলতে ইচ্ছে করছে না। প্রশস্ত বুকের বাঁ পাশে হৃদয়ের ধুক্‌ধুক্ শব্দ। নিরাপদ আশ্রয়ে মুখ গুঁজে পড়ে থাকার কী যে আনন্দ! জীবনের ভার বইতে বইতে ক্লান্ত হয়ে পড়েছে দেবী।

'ইস তোমার জামাটা এখনও ভিজে আছে। পিঠে জল বসে যাচ্ছে। শোবার আগে এক পুরিয়া ওষুধ খেয়ে নেবে।'

দেবী সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভয় কেটে গেছে। স্বামীর ছেঁড়াখোঁড়া শরীর দেখার পর একমাস ঘুমোতে পারেনি দেবী। এক আঙুলে দেবীর চিবুক ওপর দিকে তুলে শিবপদ বললে, 'খুব ভয় পেয়েছিলে?'

'বারান্দায় কেউ এসেছিল বাবা। আপনাকে আসতে দেখে পালাল।'

'এই ঘেরা বারান্দায় কে আসবে মা? কেনই বা আসবে?'

কথা বলতে বলতে শিবপদর চোখ চলে গেল বারান্দার শেষ প্রান্তে। গ্রিলের জানলা হাট খোলা। বাতাসে দুলছে। জানালাটা কী খোলাই ছিল? ঠিক খেয়াল করতে পারল না। শিবপদ মেঝের দিকে তাকাল। কাদা কাদা জুতোর ছাপ। একটার ওপর আর একটা, একটার ওপর আর একটা। এলোমেলো। জানলা থেকে দরজার পাশ পর্যন্ত দু'বার যাওয়া আসা করলে এই রকম হতে পারে। শিবপদ চিন্তিত হল; কিন্তু প্রকাশ করল না। দেবীকে সাহস দেবার জন্যে বললে, 'ও তোমার মনের ভুল। তুমি ভয় পেয়েছিলে।'

'কী ব্যবস্থা করে এলেন বাবা?'

'ওই যে কৃষ্ণ আসছে ডাক্তার নিয়ে। খুব ঘাবড়ে গেছে। আমারও বেশ ভয় করছে মা। কী ভাবে হঠাৎ মারা গেল। কী অসুখ তাও বোঝা গেল না। কতদিন ভুগছে! কী চিকিৎসা হচ্ছিল, কার চিকিৎসায় ছিল? পুলিশ কেসে না পড়ে যাই!'

'অত ভাববেন না তো? এখন যা দিনকাল পড়েছে অত ভয় পেলে চলবে না।'

কথা বলতে বলতে দেবীর হঠাৎ মেঝের দিকে চোখ চলে গল। বাসের একটা টিকিট পড়ে আছে। দেবী শিবপদর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে, 'বাবা ওই দেখুন।'

টিকিটটা আগে শিবপদর নজরে পড়েনি। নিচু হয়ে দেখে বললে, 'বাসের টিকিট।'

'কেউ আজ বাসে চেপেছিলেন আপনারা?'

'আমরা, কই না তো!'

'তাহলে?'

শিবপদর হঠাৎ মনে হল সাত্যকিও তো বাসে করে আসতে পারে। তার পকেট থেকেও পড়তে পারে। দেবীর কাঁধে হাত রেখে বললে, 'না, ভয় পাবার কিছুই নেই মা। সাত্যকি তো বাসে করেই এসেছে। এইখানেই আমরা বসেছিলুম প্রথমে। সাত্যকির পকেট থেকেই

পড়েছে। চলো ভেতরে যাই।'

'বাবা, ওঁর মাথাটা ঝুলছে। সোজা করে দিলে কেমন হয় ?'

'ভালই হয়। তবে ডাক্তার আসার আগে হাত দেব ? এ তো অনেকটা খুনের মতই ঘটনা !'

'কী বলছেন আপনি ?'

'কেউ যদি সন্দেহ করে আমরা খুন করেছি। তুমি কী জবাব দেবে ? কেমন করে প্রমাণ করবে স্বাভাবিক মৃত্যু ! আমরা এখন ডাক্তারের হাতে, পুলিশের হাতে।'

শিবপদর শরীরটা হঠাৎ কেঁপে উঠল। দেবীর কাঁধ চেপে ধরে ফিসফিস করে বললে, 'তোমার ইঞ্জেকসানের সিরিঞ্জটা কোথায় রেখেছ ?'

বাইরেটা বিদ্যুতের ঝলকে নীল হয়ে উঠল। আয়না থেকে ছিটকে আসা সেই ক্ষণপ্রভায় শিবপদর মুখের ডানপাশ চমকে চমকে উঠল। দু চোখে বিভ্রান্ত দৃষ্টি। শিবপদর ভয় দেখে দেবীও যেন আতঙ্কিত হল।

'ওই তো টেবিলের ওপর সিরিঞ্জের বাক্স। কেন বাবা ?'

'শোনো, তুমি এখুনি ওটা বাড়িতে লুকিয়ে রেখে এস। পুলিস আসবেই। অদ্ভুত অদ্ভুত প্রশ্ন করবে। ওটা না থাকাই ভাল। সিরিঞ্জের সঙ্গে খুনের দীর্ঘদিনের সম্পর্ক। ওরা কার সঙ্গে কী জড়িয়ে ফেলবে, সাবধান হওয়াই ভাল।'

'আপনি কেন বাবে বারে খুনের কথা ভাবছেন ? এবার আপনি ভয় পেয়েছেন।'

'ভয় পাবার মতই ব্যাপাব দেবী। তুমি এখুনি ওটা তুলে নাও। পুলিস যদি সার্চ করে বেরিয়ে পড়বে।'

শিবপদর কথায় দেবী কেমন যেন হয়ে গেল। সুস্থ চিন্তা ধীরে ধীরে হারিয়ে ফেলছে। বাক্সটা তাড়াতাড়ি টেবিল থেকে তুলে নিয়ে আঁচলের তলায় লুকিয়ে ফেলল।

শিবপদ উদভ্রান্তের মত বললে, 'দেবী, আমাকে যদি অ্যারেস্ট কবে নিয়ে যায়, তোমবা ও বাড়ি ছেড়ে দিয়ে এই বাড়িতে এসে উঠবে। এ বাড়ি তোমার।'

দেবী শিবপদর একটা হাত ধবে বললে, 'কেন আপনি যা-তা ভাবছেন বাবা ! আমবা থাকতে কে আপনাকে অ্যারেস্ট করবে ? কেন অ্যারেস্ট করবে ? দেশে কী আইনকানুন নেই ?'

বাইরে থেকে ডাক ভেসে এল, 'শিব, শিব।'

শিব চমকে উঠে বললে, 'দেবী, তুমি পালাও।'

'কেন, পালাব কেন ? আমি এখানেই থাকব। কে কী করবে ? অসুস্থ মানুষ বন্ধুর বাড়িতে এসে মারা গেছেন। যে কোনও মানুষ যে কোনও সময় মারা যেতে পাবেন। মৃত্যুর কথা·· ।'

দেবীর কথা শেষ হল না। কৃষ্ণপদ আর ডাক্তার সামন্ত ঘরে এসে পড়েছে। ডাক্তার সামন্ত বেশ ভারি চেহারার মানুষ। গম্ভীর মুখে মোটা ফ্রেমের চশমা। মাথায় একটা রেন ক্যাপ। হাতে একটা কালো ব্যাগ। ঘরে ঢুকে চারপাশে একবাব সন্দেহের চোখে তাকালেন। কৃষ্ণপদব দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'কই কোথায় আপনাব রুগী ?'

শিবপদ বললে, 'ওই যে, সামনের ঘরে।'

দরজাব সামনে দাঁড়িযে ডাক্তার সামন্ত বললেন, 'হরিবল্। স্ট্রেঞ্জ ডেথ।'

কৃষ্ণ বললে, 'আমাব অনেক কালের বন্ধু। দশ-বারো বছর পরে দুপুরের দিকে আজ হঠাৎ এসে হাজির। সন্ধের দিকে পেট চেপে ধরে কাতরাতে লাগল। জিজ্ঞেস করলুম, 'তোমার কী আলসার আছে ? বললে, ক্যানসারও হতে পাবে।'

'এ কেসে আমার আর কিছু করার নেই। যখন কাতরাচ্ছিল, তখন ডাকলে কিছু কবার চেষ্টা করা যেত।'

'ডেথ সার্টিফিকেট ?'

'আমাব পেশেন্ট নয। হঠাৎ ডেথ সার্টিফিকেট দেবো কী করে ? আমার বিস্ক নেই ?

প্রফেস্যনাল এথিক্স-এর বাইরে যাই কী করে ? দিনকাল ভাল নয়। আই কান্ট রাইট হিজ ডেথ সার্টিফিকেট।'

'কী হবে তাহলে ?'

'কিছু একটা হবে। পুলিশে খবর দিন। তাদের অনেক অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে।'

'এ তো আপনার অ্যাকসিডেন্ট নয়, আত্মহত্যা নয়, মার্ডার নয়, শুধু শুধু থানাপুলিশের পথ দেখাচ্ছেন কেন ?'

'আপনারা অত ডেফিনিট হচ্ছেন কী করে ? মৃতের পশ্চারটা দেখেছেন ? মুখে একটা কাপড় গ্যাগ করা রয়েছে। একটা গেলাস উল্টে রয়েছে টেবিলে। মৃত্যুর সময় আপনারা কেউ ছিলেন পাশে ?'

কৃষ্ণ শিবপদর দিকে তাকাল, 'কী রে তুই পাশে ছিলি ?'

'না।'

ডাক্তারবাবু জিজ্ঞেস করলেন, 'কোথায় ছিলেন আপনি ?'

'আমি দেবীকে ডাকতে গিয়েছিলুম।'

'দেবী কে ?'

'এই যে এই মেয়েটি। পাশেই থাকে।'

'বাড়িতে কে ছিল ?'

'কেউ না।'

'তবে ? ব্যাপারটার জটিলতা বুঝতে পারছেন ? দেখে গেলেন বেঁচে আছে। ফিরে এসে দেখলেন পড়ে আছে এই অবস্থায়। ফাঁকা বাড়ি। এনি থিং ক্যান হ্যাপ্‌ন। কোনও রিস্ক না নিয়ে পুলিসে খবর দিন। পরে বিপদে পড়ে যাবেন। আচ্ছা আমি আসি। আমার চেম্বার একেবারে ভর্তি।'

ডক্টর সামন্ত গটগট করে দরজার দিকে এগোলেন। ভদ্রলোক পালাতে চাইছেন। ভীতু ডাক্তার। ঝুঁকি নিতে চান না। জোরে গেট বন্ধের শব্দ হল। ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে তিনটি প্রাণী। কারুর মুখে কোনও কথা নেই। যেন জলে পড়ে গেছে!

কৃষ্ণ একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'এই একটা দেশ। হাজার হাজার মানুষ না খেয়ে, বিনা চিকিৎসায়, দুর্ঘটনায় প্রতিদিন মরছে। খুন হচ্ছে। তার বেলায় কিছু নয়। অথচ একটা লোক অসুখে মারা গেল, ভুগছিল দীর্ঘকাল, তাকে নিয়ে যত ঝামেলা। জন্মাবার অধিকার আছে মরার অধিকার নেই। সাত্যকিটা কী রকম বিপদে ফেলে গেল! সারাটা জীবন ওর শুধু ঝামেলা। শেষে আমাদেরও ঝামেলায় ফেলে গেল।'

শিবপদ বললে, 'মৃত ব্যক্তির সমালোচনা করিসনি কৃষ্ণ। অসহায়, নিরাশ্রয়। এইখানেই ওর জমি কেনা ছিল। কী সাংঘাতিক যন্ত্রণা পেয়ে মারা গেল!'

দেবী বললে, 'এখন তাহলে কী করবেন ? কিছু তো একটা করতে হবে!'

শিবপদ বললে, 'অবশ্যই করতে হবে। দাদা, সাত্যকি এখানে কার কাছে এসে উঠেছিল ?'

'ওর এক বোনের কাছে।'

'ঠিকানা জানিস ?'

'না।'

'সত্যি। সত্যিই খুব জটিল ব্যাপার। আমার মাথায় আর কিছু আসছে না।'

দেবী বললে, 'ডেথ সার্টিফিকেট পেলেই কী সব সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে ? তাহলেই আপনারা কী শ্মশানে যেতে পারবেন ?'

শিবপদ বললে, 'হ্যাঁ সেটাও ভাববার কথা। আমরা কে ? আপনজনদের খবর তো দিতেই হবে।'

দেবী বললে, 'তাহলে সেইটাই আগে ভাবছেন না কেন ?'

কৃষ্ণ বললে, 'ভাবব না কেন ? ভেবে ভেবে কোনও কূলকিনারা পাচ্ছি না মা। শুনেছিলুম বেহালায় ওর দিদির বাড়ি। রাস্তার নাম জানি না, ঠিকানা জানি না। কোথায় খুঁজবো বলতে পারো ?'

শিবপদ বললে, 'বুঝলে দাদা, ওই জন্যে মানুষের ছেলেপুলে থাকা দরকার। আমরা কী রকম অসহায় দেখেছ ? বাড়িতে একটা ইয়াংম্যান থাকলে এত সমস্যা হত না।'

'আমাব না হয় ছেলে নেই, তোমার অমন বুদ্ধিমান, রোজগেরে ছেলে থেকেই বা কী লাভ হল ? কলা দেখিয়ে সরে পড়ল।'

'তা ঠিক।'

দেবী বললে, 'যে যাই বলুন, আমার আর সহ্য হচ্ছে না, আমি ওঁর মাথাটা তুলে দিয়ে আসছি। পুলিস ধরলে আমাকে ধরবে।'

'খবরদাব না।' শিবপদ লাফিয়ে উঠল, 'তোমাব মেয়েব জ্বর। অসুস্থ। তুমি মৃতদেহ ছোঁবে না। আমরা কী করতে আছি ? আমি আর কৃষ্ণ !'

কৃষ্ণ বললে, 'আমি ওর পকেট সার্চ করব। চিঠি, কাগজপত্র, কিছু নিশ্চয় আছে। ওর দিদিকে খবর দিতেই হবে। এ তো বেওয়ারিশ লাশ নয়।'

'মড়া ছুঁলে এই রাতে আপনাদের দু'জনকেই স্নান করতে হবে।'

'আমবা কাল সকালে স্নান কবব মা। তুমি কিছু ভেব না।'

'আপনাবা তাহলে খেয়ে নিন।'

কৃষ্ণ বললে, 'আজ আব তুচ্ছ খাওয়ার কথা বোলো না মা। সাত্যকি আমাকে একেবারে দুমড়ে মুচড়ে দিয়ে গেল।' কৃষ্ণর গলা ধরে এল আবেগে, 'সাত্যকি কেন আজ এসেছিল জান ? এই দশ বছব পবে, এত বড় একটা অসুখ চেপে ! সাত্যকি আমার উপকার করতে এসেছিল। আমার জন্যে একটা ভাল চাকরি এনেছিল। জানিস শিব, সাংঘাতিক একটা ভাল চাকরি। যে ·· ছবি বাড়িতে এখনও ঝুলছে তাব জন্যে একজন ভালো ক্রেতার ব্যবস্থা করেছিল। অনেক পরিকল্পনা নিয়ে ছুটে এসেছিল। আমি বসে বসে নষ্ট হয়ে যাই ও তা চায়নি। আমাকে বললে, কৃষ্ণ, মরতে তো হবেই, আজ হোক, কাল হোক, কিন্তু সেই মৃত্যু যেন কাজ করতে কবতে হয়। স্বপ্ন দেখিয়ে নিজেই সরে পড়ল। আমার আর জাগা হল না।'

কৃষ্ণর চোখে জল এসে গেল। মটর পরিমাণ আফিং সেবন করা হয়ে গেছে অনেক আগে। চেতনায় তার প্রভাব নেমে আসছে ধীরে ধীরে। অতীন্দ্রিয় দর্শন হবে এবার, যা হয় প্রতি রাতে। বুঁদ হয়ে রাত কাবার। প্রথমে কৃষ্ণ, পেছন পেছন শিবপদ সাত্যকির মৃতদেহের দিকে এগিয়ে গেল।

শিবপদ বললে, 'দাদা, তুই আর মৃতদেহ ছুঁসনি। আমি বৃষ্টিতে চান করে গেছি, আবার আমাকে চান করতে হবে, আমিই ঠিক করে শুইয়ে দিচ্ছি।'

'তোরা যে কী বলিস। ঘন্টা দুয়েক আগে সাত্যকি আমাদের পাশে বসে গল্প করছিল, তখন ছুঁলে কিছু হচ্ছিল না, আর এখন ছুঁলেই চান করতে হবে ? এ তাহলে কে ? দু' ঘন্টা আগে একেই তো আমরা সাত্যকি বলছিলুম। সাত্যকি চলে গেল ! পড়ে রইল অস্পৃশ্য দেহ। প্রাণহীন দেহ তাহলে অপবিত্র ! অ্যাঁ, কী বলছিস তোরা ? আমি যে সারা জীবন দেহ-ই এঁকে গেলুম রে ? মানুষের প্রাণহীন অপবিত্র দেহ ! কী হবে আমার ?'

শিবপদ বুঝতে পারল, দাদা ক্রমশই অন্য জগতে চলে যাচ্ছে। ঘড়ির দিকে তাকাল। রাত নটা। শিব বললে, 'দাদা, তুই চুপ করে দেখ আমি কী করি।'

'আমারও তো একটা কর্তব্য আছে শিবু ! চান করতে হবে বলে দূরে সরে যাব ? সাত্যকি আমাকে ক্ষমা করবে না। একবার আমি তাকে ধাক্কা মেরে বাড়ি থেকে বের করে দিয়েছিলুম

তারপর এই ও প্রথম এল। এবার সে একেবারেই জগতের বাইরে চলে গেল। সাত্যকি তুমি বড় চালাক। ক্ষমা দিতে চাও না বলে তুমি পালিয়ে গেলে!'

কৃষ্ণর চোখ ক্রমশ ঘোলাটে হয়ে আসছে। শিবপদ দেবীকে ইশারা করল।

দেবী এগিয়ে এসে কৃষ্ণর হাত ধরল, 'জ্যাঠামশাই, আপনি এই চেয়ারে বসুন। আপনাকে আমি সুন্দর একটা গল্প শোনাব।'

'কী গল্প আর শোনাবি মা? আমি তোকে একটা সহজ গল্প শোনাই। শুনবি?'

'নিশ্চয় শুনব।'

দেবী কায়দা করে কৃষ্ণকে চেয়ারে বসাতে পেরেছে। কৃষ্ণ পায়ের ওপর পা তুলে আরাম করে বসে বললে, 'শোনো, তোমরাও শোনো। কেন ছটফট করছিস শিবু! শোন্, এই দ্যাখ আমাব হাতের মুঠো। কী ধরেছি? গল্প। জীবনের গল্প। কী গল্প? দ্যাখ, দ্যাখ, দেখে যা, মুঠো খুলে দিলুম, শূন্য, সব শূন্য। পাখি ছিল। পাখি আর নেই। পাখি ছিল। পাখি আর নেই।'

কৃষ্ণপদ আঙুল নাড়তে লাগল পাখির ডানার মত। ধীরে ধীরে ঘাড় ঝুঁকে আসছে বুকের দিকে।



॥ পাঁচ ॥

কৃষ্ণপদ বুঁদ হয়ে চেয়ারে বসে আছে। কী পৃথিবী! কে কৃষ্ণ! কে শিব! কে সাত্যকি! মাথায় টম টম শুরু হয়েছে। এইবার কাঁসর-ঘণ্টা বাজবে। একটা পথ খুলে যাবে এখুনি। হলুদ আলোর সরণি। শত শত যাত্রী চলেছে সে পথে। বহু দূরে নীল স্ফটিকের মন্দির।

দেবী বললে, 'বাবা, আমার একটা কথা রাখবেন?'

'বলো মা।'

'আপনি আগে কিছু খেয়ে নিন।'

'জানি মা, তুমি আমার শরীরের জন্যে চিন্তা করছ। বিশ্বাস করো, আমার একেবারেই খিদে নেই। অবেলায় খেয়েছি। তা ছাড়া যে বাড়িতে মৃত্যু হয়, সে বাড়িতে হাঁড়ি ফেলে, নতুন হাঁড়ি এনে সব শুদ্ধ করে আহারাদির বিধান দিয়েছেন শাস্ত্র। সত্যি কথা বলব মা, বিকেল থেকে খুব চা খাবার ইচ্ছে হচ্ছিল।'

'চা! এতক্ষণ আমাকে বলেননি কেন? বসুন আপনি। আমি এখুনি চা করে আনছি। জ্যাঠাবাবু চা খাবেন?'

'না, ও আর এখন চা খাবে না।'

কৃষ্ণ ঘুমঘুম চোখে বললে, 'খাবো। একটু বেশি দুধ আর চিনি দিয়ে।'

'দাদা, দাদা।' শিবপদর ডাকে কৃষ্ণর চটকা ভাঙল।

'বল।'

'আমি সাত্যকির পকেটে হাত দিতে পারি? ওর দিদির ঠিকানাটা যদি পাওয়া যায়।'

'আমাদের আর কিছু করার নেই। ও যেমন আছে সেই রকম থাক না। বিরক্ত করে কী আর হবে?'

শিবপদ জোরে ডাকল, 'দাদা ! কী বলছিস কী ! কিছু একটা করতে হবে তো !'

'করব । করব । সব আমি করব । তুই কিছু ভাবিসনি । আমার বাড়িটাকে সাত্যকির নামে একটা স্মৃতিমন্দির বানাব । আবার আমি তুলি ধরব শিবু । সাত্যকির একটা পোরট্রেট আঁকব লাইফ সাইজ । কিচ্ছু ভাবিসনি তুই । সাত্যকি আমার শত্রু ছিল, বন্ধু হতে গিয়ে মারা গেল । ওকে ঘুমোতে দে । জাগাসনি । জাগাসনি । জাগালেই বড় যন্ত্রণা ।'

শিবপদ হাল ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে বসে পড়ল । ঘোর না কাটলে কাজের কথা কিছু হবে না । এ এক আচ্ছা ফাঁদে ফেললে ভগবান ! সেই থানা-পুলিস ? সৎকারের ব্যবস্থাই বা কী ভাবে করা যায় ? খাট চাই, ফুল চাই । কাঁধ দেবাব লোক চাই চারজন ।

চায়ের জলে ফুট ধরেছে । দেবী দুধের পাত্রের ঢাকা খুলে, 'যাঃ' করে উঠল । দুধ ছানা কেটে বসে আছে । দুধ এভাবে ফেলে রাখে ? দুপুরে শেষ আঁচে আর একবার গরম করে রাখতে হয় । বেটাছেলে এতসব খুঁটিনাটি জানবেই বা কী করে ?

জল নামিয়ে রেখে দেবী দরজার সামনে এসে দাঁড়াল ।

'বাবা !'

শিবপদ চমকে উঠেছে, 'ও হ্যাঁ, তুমি ! বলো । কী হল ?'

'আমি চট করে বাড়ি থেকে একটু দুধ নিয়ে আসি ।'

'কেন ? ও ঘরে এক ডেকচি দুধ চাপা আছে মা ।'

'কেটে ছানা হয়ে গেছে ।'

'কেটে গেছে ? তুমি র চা করো । এই দুর্যোগে তোমাকে আর যেতে হবে না ।'

'তেমন বৃষ্টি আব নেই । গুঁড়ি গুঁড়ি পড়ছে । আমি যাব আর আসব ।'

'একা তোমাকে আমি ছাড়ব না । চলো, তোমার সঙ্গে আমিও যাচ্ছি ।'

'আপনি অকারণে ভয় পাচ্ছেন । আমি চাকরি করা মেয়ে । কত রাতবিরেতে আমাকে ফিরতে হয় । তাছাড়া মেয়েটাকেও একবার দেখে আসি ।'

'তাহলে টর্চ আর ছাতা, দুটোই নিয়ে যাও সঙ্গে ।'

'ছাতা লাগবে না। মাথায় ঘোমটা দিয়ে চলে যাচ্ছি ।'

'যা ভাল বোঝো করো ।'

'আপনি আমার ওপর রাগ করলেন ?'

'না মা, রাগ করব কেন ? আমার বয়েস হচ্ছে তো, তাই ভয় ভয় করে সবেতেই ।'

'পাশেই বাড়ি, এমন কিছু দূরে নয় । ভয়ের কী আছে বাবা !'

'যাই হোক, সাবধানে যাও । আসতে দেরি করো না । তাহলে আমি দুশ্চিন্তায় পড়ব ।'

'একবার উঠে এসে সদরটা বন্ধ করে দিয়ে যান ।'

গেটের বাইরে একটু জল জমেছে । দেবীর পায়ে জুতো নেই । ছোট্ট একটা লাফ মেরে রাস্তায় পড়ল । বৃষ্টিতে রাস্তা ধুয়ে পরিষ্কার তকতকে হয়ে গেছে । খুব গুঁড়িগুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে । এলোমেলো বাতাস । কেমন যেন ছেলেমানুষ, ছেলেমানুষ লাগছে নিজেকে । মাঝে মাঝে পৃথিবীটা বড় সুন্দর হয়ে যায় ! দেবী ইচ্ছে করে একবার টর্চ জ্বালল । অন্ধকারের বুক চিরে আলোর রেখা ছুটে গেল সামনে । আলোর লম্বা বাহুতে ফিনকি-ফিনকি বৃষ্টি জরির জাল বুনে চলেছে । আশপাশের সব বাড়িরই জানলা-দরজা বন্ধ । ফুটোফাটা দিয়ে অল্প-স্বল্প আলো ছিটকে বেরিয়ে আসছে । নোলকপরা নাকের মতো । জনপ্রাণী নেই রাস্তায় । দমকা বাতাসে গাছের পাতা কাঁপছে । একটু ভয় ভয়ও করছে । সাহস দিতে হচ্ছে নিজেকে, ভয় কিসের । ভয় মনে করলেই ভয় । খাট থেকে ঝুলে থাকা মৃত মানুষটির মুখ, ঠেলে বেরিয়ে আসা চোখ দুটো মনে পড়ে যাচ্ছে ।

পেছনে একটা সপ্ সপ্ আওয়াজ হল । বেশ ভারি পোশাকের প্রান্তে প্রান্তে ঘষা লাগলে

যেমন হয়। দেবীর মেরুদণ্ডে একটা হিমস্রোত বয়ে গেল। পথ সকলের। যে কেউ আসতে পারে। ভয় পাবার কোনও মানে হয় না। দেবী ফিরে না তাকিয়ে দ্রুত পা চালাল। বাড়ির দরজায় প্রায় এসে পড়েছে। দম বন্ধ করে হাঁটছে। পেছনের সপসপ আওয়াজও দ্রুত হল। আর কয়েক গজ, তবু দেবীর পা যেন চলছে না। স্বপ্নে বাঘে তাড়া করলে এই অবস্থা হয়।

দেবীর কাঁধে একটা হাত এসে পড়ল। হাত পড়া মাত্রই দেবী চিৎকার করে উঠল। যত জোরে চিৎকার করেছিল তত জোরে শব্দ বেরল না। ভয়ে গলার শব্দ গলাতেই থেকে গেল। বাতাসে সেইটুকু শব্দও চাপা পড়ে গেল। পা চললেও দেহ এগোচ্ছে না। কাঁধের ওপর সেই হাত চেপে বসছে ধীরে ধীরে।

কানের কাছে খসখসে একটা গলা, 'অ্যাতো ভয় পাচ্ছ কেন দেবী ? আমি, আমি। আমি শশধর।'

মুখে ভক ভক করছে মদের গন্ধ। ঠিক যে পরিমাণে ভয় পেয়েছিল দেবী, সেই পরিমাণে রাগে ঘুরে দাঁড়িয়ে ঠাস করে এক চড় কষিয়ে দিল শশধরের গালে।

মাতাল আচমকা চড় খেলে যা হয়। শশধর ধরা ধরা গলায় বললে, 'তুমি আমাকে চড় মারলে দেবী ! আমি প্রাণেশের বন্ধু। স্বামীর বন্ধু স্বামীর মতই। তুমি আমাকে মাবলে ?'

'আজ চড় মেরেছি। এরপর লাথি মারব। আপনার মত ইতর, অসভ্য, জানোয়ারের আর কোনও দাওয়াই নেই।'

'তুমি আমাকে লাথি মারবে ! তোমার ওই সুন্দর পায়ে ! আহা, ওইটাই তো আমি চাই। তোমার পায়েই তো আমি পড়ে থাকতে চাই ? তুমি আজই মারো। তুমি এখুনি মারো। মারো মাইরি, ক্যাঁত ক্যাঁত করে মারো।' শশধরের গায়ে রেনকোট। মাথায় টুপি। জলে ভিজে চকচক করছে। টুপির অন্ধকারে মুখ স্পষ্ট দেখা না গেলেও এ মুখের চেহারা দেবীর জানা। ক্ষুধার্ত কুকুরের মত। অদৃশ্য একটা জিভ সামনে ঝুলছে। লেহন করতে চায়। ফোঁটা ফোঁটা লালা ঝরছে।

শশধর ক্রমশই দেবীর দিকে এগিয়ে আসছে।

'আপনি পথ ছাড়ুন।'

'পথ ? তোমাব পথ তো আমার বুকের ভেতর দিয়ে চলে গেছে।'

'আমি চিৎকার করে লোক জড় করব।'

'কেউ আসবে না। তুমি ভিজছ ! তোমার অসুখ কববে। এই রেনকোটটা তোমাকে পবিয়ে দি।'

শশধর দু'হাত দিয়ে রেনকোট খোলার চেষ্টা করতে দেবী একটু ঝুল কেটে শিবপদর বাড়ির দিকে দৌড় দিল। ভাগি্যস পায়ে জুতো নেই। পেছনে ছুটে আসছে মাতাল শশধর। দেবীর পায়ে বল ফিরে এসেছে। লালসার হাত এড়াতে সে এখন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে যেতে পাবে। পুরুষের লোভনীয় খাদ্য হযে সে আর বেঁচে থাকতে চায না। তার কাছে মুক্তির অর্থ, দারিদ্র্য থেকে, যন্ত্রণা থেকে, দুঃখ থেকে মুক্তি নয়, কামনার জগৎ থেকে মুক্তি। দেবী একটা নাম মাত্র। আসলে সে একটা সজ্জিত দেহ। তার মনের খবরে, তার স্বপ্নের খবরে কারুর কোনও প্রয়োজন নেই। দেহের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষণ বসবাসই লোভীদের একমাত্র লক্ষ্য।

শিবপদ চমকে উঠল। দরজায় উপর্যুপরি জোর ধাক্কা। দরজা খুলতেই ঝোড়ো বাতাসের মত দেবী ঢুকে পড়ল। ঢুকেই দরজার ছিটকিনি তুলে দিয়ে পিঠ রেখে হাঁপাতে লাগল।

শিবপদ ভয় পেয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কী হল তোমার ? কুকুর ?'

কথা বলতে পারছে না দেবী। হাঁপাতে হাঁপাতে বললে, 'হ্যাঁ।'

'তখনই তোমাকে বারণ করেছিলুম, যেও না। গুরুজনের কথা শুনতে হয়। কামড়েছে ?'

দেবী ঘাড় নেড়ে জানাল, না।

'কামড়ালে কী হত ?'

দেবী হেলিয়ে রাখা শরীর সোজা করে বললে, 'র চা-ই হোক। কী আর করা যাবে।'

রেনকোট মোড়া শশধর কিছুটা পথ দৌড়ে এসেছিল ধরবার জন্যে। পারেনি। ডানদিকের গলি ধরে পায়ে পায়ে এগোতে লাগল। কোথায় চলেছে জানা নেই। তার নিজের সংসার চুরমার হয়ে গেছে। স্বপ্নের পাখিরা সব উড়ে গেছে। শশধর বুঝতে পারে, সে অসুস্থ, ভীষণ অসুস্থ। এ অসুখের একমাত্র ওষুধ মৃত্যু। প্যাঁচ মেরে মেরে রাস্তা এগিয়ে গেছে টিনখোলা বস্তির দিকে। পথ ক্রমশ সরু হয়ে আসছে। দু'পাশের আবর্জনা জলে ধুয়ে রাস্তার মাঝখানে চলে এসেছে। শশধর চলেছে।

চায়ের লিকার ছাঁকতে ছাঁকতে দেবীর মনে হল, এ পাড়া, এ বাড়ি তাকে ছাড়তে হবে। চিল যখন ছোঁ মারে কুটো না নিয়ে ওড়ে না। কতদিন ঠেকাবে ? কত আর সতর্ক থাকা যায় ? খাদ্যের যদি প্রাণ থাকত খাদকের সামনে তার অবস্থা কী হত! অপেক্ষায় থাকা। কখন দু' আঙুলে তুলে মুখে পুরে দেয়। নাঃ, বহু দূরে কোথাও চলে যেতে হবে। শশধর আজকাল আর এক কাণ্ড জুড়েছে। মাঝরাতে দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে জড়ানো গলায় ডাকতে থাকে, দেবী, দেবী। মাঝে মাঝে তোতা চমকে জেগে ওঠে, কে মা, কে মা ? দেবী চেপে ধরে শুইয়ে দেয়. কেউ না, তুই চুপ করে শো। বাতাসের শব্দ।

একটা কিছু কেলেঙ্কারী হয়ে গেলে, মেয়েটার জীবন নষ্ট হয়ে যাবে।

চায়ে চুমুক দিয়ে, শিবপদ বললে, 'বাঃ বেশ হয়েছে। তুমি দুধ দুধ করে ব্যস্ত হচ্ছিলে, ঠিক মত করতে পারলে র চা-ও বেশ ভাল লাগে।'

কৃষ্ণপদ নীরবে মাথা নাড়ল। দুধ ছাড়া চা সেও খাচ্ছে। তার চারপাশে সেই হলুদ আলোর জগৎ তৈরি হয়েছে। যেন অপেরাব রাত। বিচিত্র পোশাক পরা লোকজন চারপাশে ঘুরছে। অজস্র চরিত্র।

শিবপদ বললে 'তুমি চা খাবে না বউমা ?'

'এত রাতে চা খাব ?'

'নিশ্চয় খাবে। বৃষ্টিতে এত ভিজলে! আছে তো ?'

'আপনি নির্ভয়ে খান। অনেক লিকার আছে।'

শিবপদ কাপ রেখে এসে, সাত্যকির সামনে দাঁড়াল। আর না, যা করার তা করতে হবে। চোখ বুজিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল স্তব্ধ হয়ে। কী কী করতে হবে ভেবে নিল মনে মনে। চোখ খুলে সামনে ঝুঁকেই আঁতকে উঠল। বিছানার সাদা চাদর টক টক করছে লাল। সাত্যকির জামার একটা পাশ রক্তে জবজব করছে।

মাথাটা কেমন যেন ঝিমঝিম করছে। রক্ত সহ্য করাব জন্যে অন্য ধরনের স্নায়ুর প্রয়োজন। এত রক্ত এল কোথা থেকে ? এতক্ষণে ভাল করে লক্ষ্য করল, মুখের রুমালও লাল। এ খুন নয় তো ?

শিবপদ টলছে। শিবপদর অবস্থা দেখে দেবী এগিয়ে এল, 'সরুন, আমি দেখছি।'

শিবপদ ফিসফিস করে বললে, 'এত রক্ত!'

'হ্যাঁ রক্ত। লিভার ফেটে মুখ দিয়ে বেরিয়ে এসেছে। এ রকম মৃত্যু আগেও আমি দেখেছি।'

কৃষ্ণপদ চেয়ার ছেড়ে উঠে এল। দু'জনের পাশে দাঁড়িয়ে বললে, 'কী হয়েছে বল তো! তোরা অমন ভয় পাচ্ছিস কেন ?' উত্তরের অপেক্ষা না করে, দু'হাতে সাত্যকির মাথাটা তুলে দিল খাটের ওপর।

শিবপদ হাঁ হাঁ করে উঠল, 'তুই ছুঁলি কেন ? তুই ছুঁলি কেন ?'

কৃষ্ণ ঘোরে আছে। কারুব কথাই কানে ঢুকছে না। খটের বাজু থেকে সাত্যকির হাত ছাড়াবার চেষ্ট করল। পারল না। মৃত মানুষের মুঠো ছাড়ান যায় না। যাবার আগে পৃথিবীকে

বড় শক্ত মুঠোয় ধরে রাখতে চায়। কৃষ্ণ সাত্যকির চোখের পাতা দুটো বুজিয়ে দিল। এমন স্থির দৃষ্টি সহ্য করা যায় না। জীবিতের প্রতি মৃতের তিরস্কার।

কৃষ্ণ আপন মনে কাজ করে চলেছে। এইবার সাত্যকির বুকপকেট থেকে একগাদা কাগজপত্র টেনে বের করল।

'নে ধর। দ্যাখ কী আছে?'

শিব হাত বাড়িয়ে কাগজ নিল। শুধু কাগজ নয়, কিছু নোটও আছে। কৃষ্ণ এক এক করে সব পকেট খালি করে ফেলল। প্যান্টের পাশ পকেট থেকে একগোছা চাবি বেরল। কোথায় তালা, আর কোথায় চাবি? আফিং-এর ঘোরে থাকলেও কৃষ্ণর এই কথা মনে হল। আর মনে হতেই, হুঁ হুঁ করে একবার হাসল।

শিব বললে, 'কী, কী পেলে? পেলে কিছু?'

দু আঙুলে চাবির গোছা তুলে কৃষ্ণ চোখের সামনে দোলাতে লাগল।

'চাবি? সর্বনাশ, কোথাকাব চাবি? এ তো দেখছি আর এক বিপদ হল।'

খাট ছেড়ে কৃষ্ণ মেঝেতে নেমে এল। দু'ভাই মুখোমুখি বসে কাগজ বাছতে লাগল। কোনও এক বড় দোকান থেকে প্যাকেট প্যাকেট ধূপ কিনেছিল সাত্যকি। ক্যাশমেমো। রেকর্ড কিনেছিল। শাড়ি কিনেছিল। ওষুধ কিনেছিল। কাকে তিনশো টাকা অ্যাডভান্স করেছে, কাঁচা রসিদ। সবই বেরচ্ছে, এমন কিছু বেরচ্ছে না, যা থেকে ঠিকানা জানা যায়। এক মহাপুরুষের ছবি বেরলো। স্মিত হাসি মুখে। চোখ দুটো ধকধক কবে জ্বলছে। ছোট্ট একটা চিরকুটে সাত্যকি কিছু দেশের নাম লিখে রেখেছে—আফ্রিকা. স্পেন, মাদাগাস্কাব, ভূপাল, জয়রামবাটী।

দেবীর দিকে তাকিয়ে শিব বললে, 'নাঃ কিছুই পাওয়া গেল না। আজেবাজে সব কাগজ। একের পর এক ক্যাশমেমো।'

'ক্যাশমেমো থেকে দোকান আর দোকানেব ঠিকানা পাচ্ছেন। সেই থেকে কিছু আন্দাজ করা যায় না বাবা?'

শিব বললে. 'বাঃ, এটা তো তুমি ভাল বলেছ। এ তো আমাব মাথায় আসেনি।'

দেবী এগিয়ে এসে সামনে বসল। চৌবঙ্গী, চৌবঙ্গী। শিবপদ ক্যাশমেমো এলাকা অনুসাবে ভাগ ভাগ করছে। ভবানীপুর, বাসবিহারী, বাসবিহারী।

দেবী বললে, 'ওই ওষুধের দোকানের ক্যাশমেমোটা দেখুন তো বাবা। মানুষ সাধাবণত পাড়ার দোকান থেকেই ওষুধ কেনে।'

'ঠিক, ঠিক বলেছ। লেক গার্ডেনস।'

'তাহলে ধরে নিতে পাবেন, সাত্যকিবাবু লেক গার্ডেনসেবই কোথাও থাকতেন। নিশ্চিত নয। সম্ভাবনা আছে।'

ক্যাশমেমো হাতে নিয়ে শিবপদ কিছুক্ষণ বসে রইল অন্যমনস্ক। দেবীর দিকে তাকিযে আছে চোখাচোখি কিন্তু দেখছে না।

সবই তো হল দেবী, কিন্তু কে এখন খোঁজাখুঁজি করে। আমি নিজে তো কেমন যেন নড়বড়ে হয়ে গেছি।'

দেবীর হঠাৎ মনে হল, লোলুপ একটি মানুষ পথেব বাঁকে, এই দুর্যোগেব বাতে তাবই অপেক্ষায ওত পেতে বসে আছে। লোকটাকে সে ইচ্ছে কবলেই ভেড়া বানিয়ে ফেলতে পারে। চরিত্রহীন কিন্তু করিতকর্মা। এখুনি তাকে কাজে লাগান যায। যা বলবে তাই শুনবে। এক পায়ে সারারাত দাঁড়িয়ে থাকতে বললে তাই থাকবে। তাবপব।

তারপরের কথা ভেবে দেবীর চিন্তা থমকে গেল।

শিবপদ বললে, 'একটা কাজ কবি।'

'কী বাবা?'

‘এ পাড়ায় আমার এক ছাত্র আছে, জ্ঞানেশ। গাড়ি আছে। ফোন আছে। তার কাছে একবার যাই।’

‘জ্ঞানেশবাবুকে আমি চিনি বাবা। ওঁর সবই ভাল তবে একটু বেশি মকারান্ত।’

‘সে আর কী করা যাবে মা। ওই তো এখনকার যুগধর্ম। নাঃ, কী যে করা যায়! তোমার অনেক রাত হয়ে যাচ্ছে। তার ওপর তোমার চুল ভিজে। জামা ভিজে। অসুখে না পড়ে যাও!’

‘সে তো আপনারও ভিজে। আমার তো তবু পাতলা জামা গায়ের তাপে শুকিয়ে এসেছে।’

‘তুমি এবার বরং বাড়ি যাও। মেয়েটা একা রয়েছে।’

‘ওর একা থাকা অভ্যাস আছে। কিছু হবে না। জ্ঞানেশবাবুর কাছে যদি যেতেই হয়, তো চলে যান। আমি যাব আপনার সঙ্গে?’

‘না মা, আমি একাই পারব। তোমার কোনও ভয় নেই। চোখে একটু কম দেখি, এই যা অসুবিধে, শরীরটা এখনও তেমন অকেজো হয়ে যায়নি।’

‘সাবধানে রাস্তা দেখে যাবেন।’

কৃষ্ণপদ এতক্ষণ ঝিম মেরে বসেছিল। এইবার নড়েচড়ে উঠল, ‘তুই কী আমাকে একেবারেই অপদার্থ ভাবলি শিব! চল, দুজনে একসঙ্গে যাই।’

‘একসঙ্গে দুজনে গেলে চলবে না দাদা। বাড়ি পাহারা দেবে কে? দেবীকে একা রেখে যাওযা চলে না।’

একা থাকার আশঙ্কায় দেবী মনে মনে আঁতকে উঠল। একটু আগের কথা মনে পড়ল। জীবিত, মৃত সকলকেই ইদানীং তাব ভয় করে।

কৃষ্ণপদ বললে, ‘তাহলে আমি যেমন আছি তেমনই থাকি।’

শিবপদ রাস্তায় নামল। চোখ সওয়া অন্ধকার। মাথার ওপর দই-সাদা আকাশ। এ যেন বন্যার পূর্বাভাস। এ বছব খুব খাবাপ যাবে। জ্যোতিষীবা এক বাক্যে সেই কথাই বলছেন। শিবপদ চমকে উঠল। আপাদমস্তক রেনকোট ঢাকা কে একজন দাঁড়িয়ে। পথের পাশে, পাঁচিলের ধারে। চোখ দুটো ক্ষুধার্ত পশুর মত জ্বলজ্বল কবছে। শিবপদ আর একটু হলেই বলে ফেলছিল, ‘কে, কে, ওখানে?’ নিজেকে সামলে নিল। একবার মনে হল চোখের ভুল। একবাব মনে হল ভৌতিক রাতে প্রেতের ছায়া। মন ভাবলেও পা সচল ছিল। জাযগাটা পেরিয়ে চলে এল। সামনেই বড রাস্তা। দোকানপাট। ভেজা গাড়ির আনাগোনা এ পাশে ওপাশে। মনের সাহস ফিরে এল। গত কযেক ঘণ্টা সে যেন কবরে শুয়েছিল।

খানাখন্দে ভরা অন্ধকার রাস্তা। জল জমে আছে। শিবপদ কোনও কিছুই গ্রাহ্য করছে না। এদেশে বিনা অশান্তিতে বাস করতে হলে নিজেকে প্যাটন-ট্যাঙ্ক ভাবতে হবে। সারদা টেলাবিং-এর পাশেই জ্ঞানেশের বাড়ি। নিচের তলায় ভাডাটে। দোতলায় জ্ঞানেশ। বাইরের ঘেরা বারান্দায এক গাদা শাড়ি, জামাকাপড় ঝুলছে। প্যাসেজে গোটা দুই কুকুর বৃষ্টির ভয়ে আস্তানা নিয়েছে। দোতলায় ওঠার সিঁড়ির মুখে কম পাওয়ারের একটা আলো মিটমিট করে জ্বলছে। কেউ কোথাও নেই। ভাড়াটেরা দোরতাড়া বন্ধ করে বসে আছে। পেঁয়াজ-রসুন দিয়ে কিছু একটা কষা হচ্ছে। ঝাঁঝালো গন্ধে শিবপদর খালি পেট পাক মেরে উঠছে।

সিঁড়ির ওপব দোতলার দরজা বন্ধ। শিবপদ কলিং বেল টিপল। বেশ মিঠে একটা আওয়াজ হল ভিতরে। তের চোদ্দ বছরের ময়লা ময়লা ফ্রকপবা একটা মেয়ে দরজা ফাঁক করে মুখ বাড়াল।

‘জ্ঞানেশ আছে?’

ভেতর থেকে একটা নারীকণ্ঠ ঝনঝন করে উঠল, ‘এত রাতে কে আবার এল। লোক আসার আর সময় পেল না। চব্বিশ ঘণ্টা বেল যেন বেজেই আছে। দ্যাখো তোমাকে কে

ডাকছে।’

মুখে বাঁকা করে লাগান সিগারেট। পরনে চেক চেক লুঙ্গি, স্যাণ্ডো গেঞ্জি, ঢুলুঢুলু চোখ। জ্ঞানেশ এসে দাঁড়াল, ‘কে ? কাকে চাই ?’

‘আমি শিবপদ। তোমার মাস্টারমশাই।’

‘মাস্টারমশাই ?’ জ্ঞানেশ সিগারেট পেছনে লুকলো। ‘কী ব্যাপার স্যার ? এত রাতে ?’ জ্ঞানেশের শরীরের চারপাশ দিয়ে লিক লিক করে ধোঁয়া বেরচ্ছে। যেন আগুন ধরে গেছে।



॥ ছয় ॥

এই হল কলকাতাব সবচেয়ে বিশিষ্ট এলাকা। ধনী মানুষের বসবাস। মসৃণ রাস্তা শাখাপ্রশাখা বিস্তার কবে পড়ে আছে। খোঁড়াখুঁড়ি কবার আগে কর্তৃপক্ষকে দু'বাব চিন্তা কবতে হয়। বিলিতি গাড়ি অসন্তুষ্ট হবে কী না ! সাবা রাত পথের দু'পাশে আলো জ্বলে পরিমিত তেজে। আলোতে অন্ধকাবে মিশে কোমল একটা ব্যাপার। যেন স্বপ্নমাখা বাত। কংক্রিট আব সবুজের বিলিব্যবস্থায় এমন এক হিসেব, পরিবেশ যেন আহত না হয়। কোটিপতিব বাগানবাড়ি, গাড়িবারান্দায় ফানুসেব মত গোল গোল আলো, মাঝাবি উচ্চতার উইপিং উইলোব সাবি। নুড়ি ঢালা গাড়ি-পথ। মাঝে মাঝে আকাশছোঁযা আধুনিক বহুতল। সাব সাব থামের ঊর্ধ্ববাহুব ওপর উচ্চবিত্ত, সুখী মানুষের বসবাসের আয়োজন। একতলায শুধু গাড়ি বাখার ব্যবস্থা। অটোমেটিক লিফ্‌ট প্রয়োজনে ওঠানামা কবে, নিঃশব্দ বাতাসেব মত। গোলমাল নেই। বাজাবি হইচই নেই। রাতভব লেডি-কুত্তার আর্তনাদ নেই। দিনভর রকবাজদেব খিস্তিখেউড় নেই। বিকেলে স্বাস্থ্যবতী আয়াবা ঝকঝকে প্যাবাম্বুলেটারে ফুটবলেব মত ফুটফুটে শিশুদের, নিচেব বিশাল বাঁধান চাতালে হাওয়া খাওযাতে নামায। যাদের কান্নাটাও দিশি খোকাদের মত নয়। অনেকটা আমেরিকান্‌ জ্যাজেব মত।

ষোল তলা বিশাল একটি বাড়িব নাম ‘সুভদ্রা’। খাড়া উঠে গেছে আকাশেব দিকে। আর একটু উঠলেই মেঘ ধরতে পাবত। সেই বাড়িব অষ্টম তলেব একটি অ্যাপার্টমেন্ট। প্রয়োজনেব চেয়ে অনেক বেশি সাজান-গোছান। অনেকটা সিনেমা সেটের মত। অনেক নিচে পড়ে থাকা নোঙবা, বিষণ্ণ কলকাতাকে যেন ব্যঙ্গ কবছে। পশ্চিমে মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত বিশাল জানলা। কাঁচ মোড়া। সেই ফ্রেমে ধবা পড়েছে কলকাতার ডক এলাকা। আলকাতবাব মত কালো আকাশের তলায ফুটে আছে দীপমালা। অসংখ্য জাহাজের মাস্তুলেব মাথায লাল আলোর সাবধানী চোখ।

পরিষ্কার পাজামা আর হ্যাণ্ডলুমেব বুক খোলা পাঞ্জাবি পবে অমিতাভ আয়েস করে বসে আছে। কোলেব ওপর বুক চিতিয়ে পড়ে আছে ইংবেজী ম্যাগাজিন। পড়ার চেষ্টা কবলেও পড়তে পারছে না। হঠাৎ বড় উঁচুতে উঠে এসেছে। হাত বাড়ালেই আকাশ। সকালে অবাক হয়ে দেখছিল, কাঁচেব জানালার কোল ঘেঁষে চিল উড়ছে। এখন দেখছে দূরে বহু দূরে গঙ্গার বুকে আলোর টিপ। দৃষ্টি এতদিনে অবারিত হল। বেশ একটা সুখ সুখ ভাবের উষ্ণ আমেজ শীতের সকালে গরমজলে স্নান করার অনুভূতির মত দেহকে জড়িয়ে ধরেছে। আর কী চাই !

ভালো চাকরি। বাধ্য, সুন্দরী স্ত্রী। আকাশের গায়ে ভাসমান নীড়। আর কী চাই অমিত।

অমিতাভ প্রায় ছ'ফুট লম্বা। শরীর নিয়ে কোনও দুঃখ নেই। মাথায় এক মাথা চুল। টাকের সামান্যতম আভাস নেই। চিরুনি যত জোরেই চালাক একটাও চুল উঠে আসে না দাড়ায়। অনেকেই বলে, এমন চেহারায় সিনেমার হিরো হওয়া যায়। অমিতাভর মাঝে মাঝে মনে হয়, এ জীবন না স্বপ্ন! এত সব এক জীবনে পাওয়া সহজ!

'খাবে এসো।' অমিতাভর স্ত্রী তনু খাবার জায়গা থেকে মৃদু গলায় ডাকল।

অমিতাভ ম্যাগাজিন রেখে উঠে দাঁড়াল। মাথার ওপর দু'হাত তুলে শরীরটাকে পেছনে ধনুকের মত বাঁকিয়ে এতক্ষণ একভাবে বসে থাকার জড়তা কাটাল। আকাশের অনেক নিচু দিয়ে ধোঁয়াটে চেহারার বদমাইশ একটুকরো মেঘ ভেসে চলেছে। আবার বৃষ্টি হবে।

সর্বত্র এমন ব্যবস্থায় আলো লাগান হয়েছে, কোথাও আলোর অসভ্যতা নেই। সেতারীর পাকা হাতের ঝালার মত চারপাশে আলোর রিমঝিম। ছায়া পড়ার উপায় নেই। অমিতাভ ধীর পায়ে খাবার টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল। ডিম্বাকৃতির ওয়ালনাট রঙের বিরাট টেবিল। একসঙ্গে আট দশজন এঁটে যাবে।

অমিতাভ বসতে বসতে বললে, 'দিন দুই একটু কষ্ট কর। ভাল একজন বাবুর্চি আসছে। তখন তোমার কমপ্লিট রিলিফ।'

'একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না?'

'কী রকম?'

'বাবুর্চি, খানা, খানসামা, এসব তো বড়লোকী ব্যাপার।'

'তুমি কী ভাবো আমরা ছোটলোক!'

খুব একটা রসিকতা হল ভেবে অমিতাভ শব্দ করে হাসল। তনু সে হাসিতে যোগ দিতে পারল না। ম্লান মুখে খাবার সাজাতে লাগল।

'তোমার কী হয়েছে বল তো! মাথা ধরেছে আবার?' অমিতাভ প্রশ্ন করল।

অমিতাভর প্রশ্ন সাবধানে এড়িয়ে গেল তনু। বছর দুয়েক হয়ে গেল বিয়ে হয়েছে। তনু বুঝে গেছে, লোকটি ভীষণ স্বার্থপর। নিজেরটি ছাড়া কারুর কিছু বোঝে না। বুঝতে চায় না। বোঝার ভাণ করে মাত্র। উত্তরে তনু বললে, 'তুমি আর মাংস নেবে?'

'না মাংস চাই না। একটু ঝোল দাও। তুমি বসবে না?'

'পরে। আমার তেমন ক্ষিদে নেই।'

'তোমার সত্যিই কী হয়েছে বল তো। সকাল থেকে মুখ গোমড়া করে আছ।'

'কী আবার হবে! এত সুখে কারুর কিছু হতে পারে, না হওয়া উচিত!'

'তার মানে? তোমার এই কথার মধ্যে কোথায় যেন একটু খোঁচা রয়েছে?'

'কী আশ্চর্য! খোঁচা থাকবে কেন? একজন মানুষের যা যা পাওয়া উচিত, আমি তার চেয়ে অনেক বেশি পেয়েছি। এর জন্যে আমার ভাগ্যকে ধন্যবাদ দেওয়া উচিত।'

'তুমি খাবে না কেন?'

'তুমি খাচ্ছ খাও। আমার সময় হলে ঠিকই খাবো।'

'তুমি সকালেও কিছু খাওনি। তোমার এই শরীরে উপবাসের কী ফল হতে পারে জান? না সে বোধ-বুদ্ধিটুকুও লোপ পেয়েছে?'

'আমার কোনও কিছু মুখে দিতে ইচ্ছে করছে না।'

'কেন করছে না?'

'অদ্ভুত প্রশ্ন। সবদিন সকলের সমান ক্ষিদে থাকে?'

'তনু, তুমি আমাকে নির্বোধ ভেব না। তোমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে এখানে আসায় তুমি অনশন করে আমাকে জব্দ করতে চাইছ। একে বলে সাইকোলজিক্যাল টর্চার। আমি কী এমন অন্যায়

করেছি যে তুমি আমার সঙ্গে ভালো করে কথা পর্যন্ত বলছ না !'

'আমি তোমার সঙ্গে বাজে কোনও তর্কে যেতে চাই না। খাচ্ছো খেয়ে নাও। তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়বে বলছিলে শুয়ে পড়।'

'আমার প্রশ্নের জবাব না পেলে, আমিও খাব না।'

'তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে কেন মাথা গরম করছ ! তুমিই তো বল, আপনি বাঁচলে বাপের নাম।'

'আমি বলব কেন ? ওটা বহুকালের প্রবাদ। মাঝেমধ্যে স্মরণ কবি।'

'স্মরণ কর না। অনুসরণ করো। ওইটাই তোমার জীবনের নীতি।'

অমিতাভ খাবার প্লেট ঠেলে সরিয়ে দিল, 'তুমি এত বড একটা কথা আচমকা বলতে পারলে ?'

'হ্যাঁ পারলুম। দু'বছরে তোমার নাড়ীনক্ষত্র আমার জানা হযে গেছে। তুমি কী তা তুমি নিজেও জান ভাল করে। নিজের সঙ্গে লুকোচুরি চলে না। সেই বৃদ্ধ মানুষটিব কথা একবাবও ভেবেছ ?'

'কোন্ বৃদ্ধ মানুষ ?'

'এই তো। এই তো তোমার স্বরূপ। কোন্ বৃদ্ধ তাই তুমি বুঝতে পাবছ না !'

'আমাব বাবার কথা বলছ ?'

'তা ছাড়া কার কথা বলব। আপাতত আমাদের পৃথিবীতে একজনই বৃদ্ধ আছেন যাঁর কথা আমাদের ভাবা উচিত।'

'তোমার কথা শুনে আমার কী বলতে ইচ্ছে করছে জান ? একটু অপ্রিয় কথা, তবু বলি, মার চেয়ে মাসীব দরদ বেশী। আমার বাবা, ভেবে মরছ তুমি ? তোমাব এই ভাবনা কতটা লোক দেখান আর কতটা আসল বলা শক্ত।'

তনু উঠে চলে গেল। প্রথম সন্তানসম্ভবা মহিলার নানাবকম মানসিক বিক্রিয়া হয। গত কযেক মাস ধবেই অমিতাভকে তার অসহ্য লাগছিল। তার কথাবার্তা, চালচলন, গায়েব গন্ধ, চোখের ভঙ্গি, চেহারা, সমস্ত কিছু অসহনীয় মনে হচ্ছিল। তার হঠাৎ এই চলে আসা তনুকে সহ্যসীমার শেষপ্রান্তে নিযে এসেছে। শিক্ষিত স্বার্থপর। ভোগী। খুব কাছে এলে গা ঘিনঘিন কবে। নিজেকে অশুচি বলে মনে হয়।

তনু পশ্চিমের ঝুল বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। এই স্বার্থেব জগৎ তাকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে। চোদ্দ বছর আগে বাবা মারা গেছেন। ঋষিতুল্য মানুষ ছিলেন। ডাক্তার হিসেবে ভীষণ সুনাম ছিল। দুঃস্থদের বিনা পয়সায় চিকিৎসা করতেন। এমন কী পথ্যের পয়সা সময় সময নিজের পকেট থেকে দিতেন। সকলে নাম শুনলে এখনও দেবতা বলে হাত তুলে নমস্কাব করে। মা অধ্যাপিকা। এখনও অধ্যাপনা করেন। আর বছর দুই হয়তো করবেন। অবসরের দিন এগিয়ে আসছে। পিতা-মাতার কাছে তনু স্বার্থপরতার শিক্ষা পায়নি কখনও। তাকে নিযে আদরের বাড়াবাড়ি হয়নি কখনও। আত্মীয়-স্বজন, অতিথি-অভ্যাগতের ভিড লেগেই থাকত বাড়িতে। কত লোক আসত বাবার কাছে সাহায্য নিতে। স্কুলের বই কেনার টাকা। মেয়ের বিয়ে। বিধবার সংসার চলে না। দু' হাতে দান করতে করতে, নির্বিচারে চিকিৎসা করতে করতে হঠাৎ বাবা একদিন চলে গেলেন। 'আমরা অনাথ হয়ে গেলুম' বলে কত মানুষ যে সেদিন চোখের জল ফেলেছিল ! সঙ্কীর্ণ কোনও মানুষকেই তনুর আর ভাল লাগে না। আকাশে বসবাসের পর চোবকুঠুরিতে মন হাঁপিয়ে ওঠে।

তনু যেখানে দাঁড়িয়ে আছে তার অনেক নিচে রাস্তা। ফিতের মত এঁকে বেঁকে খেলাঘরের মত জনবসতির ভেতর দিয়ে খেলতে খেলতে এগিয়ে গেছে। ঝিরঝির বৃষ্টি। বিমর্ষ আকাশ। সেই সকাল থেকেই শিবপদর কথা ভীষণ মনে পড়ছে। বারে বারে ভেসে উঠছে তাঁর মুখ। যীশুখ্রীস্টের মত স্তব্ধ, গম্ভীর। দুটি চোখে অদ্ভুত এক মায়া।

কী করছেন তিনি এখন ! সেই নির্জন বাড়িতে।

দুপুরে খাওয়া কী হয়েছিল ? রাতের খাওয়া ! বিকেলের চা !

ওই মুখে তনু তার পিতার মুখের আদল খুঁজে পায়। কণ্ঠস্বর, স্বভাব, সবেতেই মিল আছে। তনুব ভেতরটা সবসময় ছটফট করছে। উপায় থাকলে এখুনি ছুটে যেত। এরই মাঝে একদিন বলেছিলেন, বউমা একদিন খিচুড়ি কোরো তো। তোমার হাতের খিচুড়ি খেলে মনে হয় ভোগ খাচ্ছি। সেই খিচুড়ি রেঁধে খাওয়াবার অবকাশ ওই লোভী লোকটার জন্যে আর পাওয়া গেল না।

শীতের দুপুরে বারান্দায় রোদে বসে কত পুরনো দিনের কথা হত। অমিতাভের ছেলেবেলার কথা। শাশুড়ীর কথা। সেকালের চরিত্রবান, আদর্শপ্রেমী মানুষদের আত্মত্যাগের কথা। মাঝে মধ্যে পড়াতে বসতেন। বলতেন. বউমা এম এ-টা দিয়ে দাও।

জীবনে এত ভালবাসা সে আর কার কাছে পেয়েছে ! গরম জিলিপি দেখেছেন। নিয়ে এসেছেন। এই নাও বউমা, বড় সুস্বাদু জিনিস। সহজে মেলে না। কোথায় গরম বোঁদে তৈরি হচ্ছে, বউমার কথা মনে পড়ে গেছে। বেশী পরিশ্রমে পাছে ক্লান্ত হয়ে পড়ে, নিজেই কত কাজ করে নিতেন। সেই মানুষকে এক কথায় ছেড়ে চলে এল। এই না হলে শিক্ষিত ছেলে !

দমকা বাতাসে তনুর চুল উড়ছে। গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি এসে গায়ে লাগছে। অনেকক্ষণ তাকিয়ে আছে নিচের দিকে। তাকাতে তাকাতে মাথা ঝিমঝিম করছে। নেশা ধরে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে, মারি এক লাফ। কাগজ কুঁচির মত বাতাসে ভাসতে ভাসতে রাস্তায়।

সিগারেটের গন্ধে তনু সচেতন হল। এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে অমিতাভ বললে, 'কী, সারারাত আজ তুমি এইখানেই দাঁড়িয়ে থাকবে না কী ?'

প্রশ্নের কোনও জবাব না দিয়ে তনু ভেতরে চলে গেল। অমিতাভ মনে মনে হাসল। সেণ্টিমেণ্টের বাড়াবাড়ি। কই তার তো কিছু মনে হচ্ছে না। এই তো স্বাভাবিক ! কোথায় কে বইল তাতে কার কী যায় আসে। বেঁচে থাকলেই তো হল। বাড়ি আছে, অর্থ আছে, মাসে মাসে সেও পাঠাবে। সেবা ! আজকাল কেউ কারুব সেবা করে না। প্রফেস্যানাল নার্সরাই সেবা ভুলে গেছেন। তা অ্যামেচার স্ত্রী। তনুর ভেতরে একটা লোক দ্যাখানো ব্যাপার আছে। সাবেক কালেব সংসাব আর নেই। বাস্তব এখন অনেক বেশী কঠোর। বাইরে কোথাও ট্র্যান্সফার হয়ে গেলে কী হত ' এ সব ন্যাকামির কোনও মানে হয় না। দুঃখ বিলাস।

'কী তুমি শুতে আসবে, না সারারাত বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকবে ?'

'তুমি শুযে পড় না। আমাব ঘুম আসছে না।'

'কেন অমন করছ। জোলো বাতাস বইছে। অসুখ করবে। চলে এস।'

তনু কোনও উত্তর দিল না। অন্ধকার আকাশের দিকে তাকিয়ে রইল। বহু দূরে অল্প একটু বাগান ঘেরা ছোট্ট একটি বাড়ি। এই দুর্যোগের রাতে সেই বাড়িতে একা এক বৃদ্ধ মানুষ। কী করছেন তিনি ' হয়তো এক গাল শুকনো মুড়ি চিবোচ্ছেন ' আর তাঁর কৃতী সন্তান এখন বিছানায় ঠ্যাঙের ওপর ঠ্যাং তুলে দামী সিগারেট ফুঁকছে।

কাযদা করে পেছনের দেয়ালে টিপে ধরে জ্ঞানেশ সিগারেটের আগুন নিবিয়েছে।

'মাস্টাবমশাই, কী ব্যাপার, কোনও বিপদ হয়নি তো ! ভেতরে আসুন।'

'ভেতরে আর যাব না বাবা। পায়ে জলকাদা। বড় বিপদে পড়ে তোমার কাছে ছুটে এসেছি এই এত রাতে। তোমার বিশ্রামের ব্যাঘাত হল।'

'বিশ্রাম ! আমি কী এমন পরিশ্রম করি মাস্টাবমশাই ! বলুন কী বিপদ ?'

শিবপদ সংক্ষেপে সব ঘটনা বললে। 'আমার মাথায় কিছু আসছে না বাবা। তাই তোমার কাছে ছুটে এলুম।' জ্ঞানেশ কিছুক্ষণ স্থির হয়ে রইল। তার চোখ দুটো চকচক করছে। সাঁসাঁ

করে ঝোড়ো বাতাস বইছে বাইরে। এমন রাতে সাধ করে কেউ বাইরে বেরতে চাইবে না।

শিবপদ ইতস্তত করে বললে, 'তোমাকে মনে হয় রিপদেই ফেলে দিলুম!'

'কিছু মাত্র না। কী করা উচিত মনে মনে একবার ভেবে নিলুম। আপনি এক সেকেণ্ড দাঁড়ান। আমি এখুনি আসছি।'

জ্ঞানেশ ভেতরে চলে গেল। একটি বাচ্চা ছেলের আদো আদো কথা ভেসে আসছে ভেতর থেকে। ব্যস্ত সংসারের নানারকম শব্দ। টিভিতে মনে হয় রাতের শেষ সংবাদ পড়ছে। ছোট ছোট পাখির মত নানা শব্দ উড়ে আসছে সংসারের সোনার খাঁচা থেকে। জ্ঞানেশের স্ত্রী মনে হয়, ঝাঁঝালো গলায় বলছে, 'এত রাতে কোথায় আবার চল্লে।'

শিবপদর কেমন যেন কিন্তু কিন্তু লাগছে। এই রাতে একটা মানুষকে অকারণে ঘর থেকে টেনে বের করা!

'চলুন মাস্টারমশাই।' জ্ঞানেশ তৈরি হয়ে এসেছে। আঙুলে একটা চাবি দুলছে।

সিঁড়ি বেয়ে নামতে নামতে বললে, 'অত নার্ভাস হচ্ছেন কেন? এ অতি সামান্য ব্যাপার। আজকাল সব মার্ডার করে বুক ফুলিয়ে বেড়াচ্ছে। মৃত্যুর আর তেমন ইমপর্টেন্স নেই।'

রাস্তায় বেরিয়ে জ্ঞানেশ বললে, 'মাস্টারমশাই আপনি এই বারান্দার তলায় দাঁড়ান। আমি গাড়িটা বের করে আনি।'

জ্ঞানেশ অন্ধকারে হাঁটতে হাঁটতে পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল। কোথায় জ্ঞানেশের গ্যারেজ কে জানে? বৃষ্টি পড়ার আওয়াজ হচ্ছে সিপসিপ করে। গাড়ির হেডলাইটের আলোয় অন্ধকার ফালা ফালা হল। সামনের দরজা খুলে জ্ঞানেশ বললে, 'উঠে আসুন মাস্টারমশাই।'

যেতে যেতে শিবপদ প্রশ্ন করলে, 'কিছু ভাবলে? কী করা যায়। পুলিসে হ্যাণ্ডওভার?'

'কিচ্ছু না। থানা-পুলিসের কোনও ব্যাপারই নেই। ও সবের মধ্যে কে যায়!'

রাস্তার একটা গর্ত বাঁচাতে জ্ঞানেশ ডানদিকে গাড়ি ঘোরাল। শিবপদ আচমকা কাত হয়ে আবার সামলে নিল।

'রাস্তার অবস্থা দেখেছেন মাস্টারমশাই! দেশের বারোটা বাজিয়ে দিলে।'

শিবপদ হাসল। দেশের কথা কে আর ভাবছে! স্বাধীন হবার পর সকলেই তো নিজের কথা ভাবছে।

শিবপদর বাড়ির সামনে জ্ঞানেশ গাড়ি থামাল। শিবপদ চমকে উঠল। হেডলাইটের আলোয় সেই মূর্তি, দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে। সর্বাঙ্গ বর্ষাতিতে ঢাকা। মাথায় টুপি। মুখের চেহারা স্পষ্ট নয়। ভূত না মানুষ! জ্ঞানেশ গ্রাহ্যই করল না কিছু। স্টার্ট বন্ধ করে নেমে পড়ল। শিবপদর একবার মনে হল, লোকটাকে চ্যালেঞ্জ করে, কেন সে এখানে ওভাবে দাঁড়িয়ে আছে। ইচ্ছেটা মনে উঠে মনেই মিলিয়ে গেল।

শেষ টান মেরে সিগারেটটা অ্যাশট্রেতে গুঁজে অমিতাভ উঠে দাঁড়াল। বারান্দার রেলিং-এ কনুইয়ের ভর রেখে তনু সেই একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে। অমিতাভ পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

'তোমার কী হয়েছে বলবে?'

'কিছু না।'

'তাহলে এখানে এইভাবে দাঁড়িয়ে আছ কেন?'

'দেখছি।'

'কী দেখছ?'

'আকাশ।'

'কবি হয়ে গেলে না কী! চলো ভেতরে চলো।'

অমিতাভ তনুর হাত ধরল। ঘরের দিকে নিয়ে যাবার জন্যে আকর্ষণ করলে। তনু শক্ত

হাতে বারান্দার রেলিং ধরে আছে। সহজে টলান গেল না। অমিতাভ বিরক্ত হয়ে বললে, 'কেন এমন জ্বালাচ্ছ বল তো ?'

'আমি তো জ্বালাইনি, তুমি নিজেই জ্বলছ। তুমি শুয়ে পড় না। আমার সময় হলেই শোব।'

'আমার কথা তুমি তা হলে শুনবে না ?'

'তুমি আমার কোন কথাটা শোন ?'

'তোমার আবার কথা কী ! আমি তোমাকে বিয়ে করেছি, না তুমি আমাকে বিয়ে করেছ ?'

'তার মানে ?' তনু অমিতাভর দিকে ঘুরে দাঁড়াল।

'মানে খুব সহজ। বিয়ের' পর পদবীটা তোমারই পালটেছে। আমি তোমাকে যেখানে, যেভাবে, যেমনভাবে রাখব, সেখানে সেইভাবে, হাসিমুখে থাকবে।'

'অর্থাৎ ক্রীতদাসী।'

'ক্রীতদাসী নয়। এইটাই হল হিন্দুপ্রথা। কোম্পানী যখন আমাকে এত বড় একটা ফ্লাট দিচ্ছে তখন মূর্খের মত রিফিউজ করব ? আমার একটা স্ট্যাটাস আছে। আমার নিজস্ব একটা জীবন আছে। আমারও সুবিধে-অসুবিধে আছে। আমার মেলামেশার আলাদা একটা গণ্ডী আছে। তুমি পড়নি জীবন মানে চরৈবেতি। বাঙালীর ঠুনকো সেন্টিমেন্ট নিয়ে এক জায়গায় আটকে বসে থাকব ?'

'আর যাই করো তুমি উপনিষদের নতুন ব্যাখ্যা আর করতে যেও না। নিজের উন্নতি ছাড়া তুমি আর কিছু বোঝ না, বোঝার চেষ্টাও কোরো না।'

'তুমি কী আমায় ঘৃণা করতে শুরু করেছ ?'

'শোনো, ভেতর নিয়ে যত কম নাড়াচাড়া করা যায় ততই ভাল। কী হবে জেনে, কার ভেতরে কী আছে ? তুমি আছ, আমি আছি—এই তো বেশ।'

'এই মন নিয়ে তো আর সংসার করা যায় না।'

'কেন যাবে না ! সবাই তো এইভাবেই চলছে। সন্তান আসছে। উৎসব হচ্ছে। নাচগান হচ্ছে, খানাপিনা হচ্ছে।'

'ঘরে চলো।'

'এ তোমার আদেশ না অনুরোধ ?'

অমিতাভ একটু বিব্রত হয়ে পড়ল। আদেশ, না অনুরোধ ! সহসা কোনও উত্তর দিতে পারল না। এ তো তার আদেশই। কথা না বাড়িয়ে অমিতাভ ঘরে ফিরে এল। এখন তার যা মানসিক অবস্থা তাতে বিশ্রী কিছু মন্তব্য বেরিয়ে আসা অসম্ভব নয়। এমন কথাও সে বলে ফেলতে পারে, তুমি আমাকে বিয়ে করেছ, না আমার বাবাকে ! কথাটা মনে জেগে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে অমিতাভ কুঁকড়ে ছোট হতে শুরু করল। ছি ছি, এমন একটা কথা সে ভাবতে পারল ! এই তার শিক্ষা।

তনু বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইল। বিদ্রোহী হবার ক্ষমতা তার নেই। যে গাছে জোড় কলম বাঁধা হয়ে গেছে সেই গাছের চরিত্রের সঙ্গে মিশে যেতে হবেই। উপায় নেই। এই হল জীবন্। কিন্তু মন ভাঙে। ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। দেখা যায় না বাইরে থেকে।

উতলা বাতাসে তনুর চুল উড়ছে। বেশ শীত শীত করছে। দূর অন্ধকারে এক সার নিঃসঙ্গ আলো সারা রাত জেগে থাকার ব্রত নিয়েছে। দু'জনের কথা বড় বেশি মনে পড়ছে আজ, বাবা আর শ্বশুরমশাই। অমিতাভ ঘরের আলো নিবিয়ে দিল। যা ভাল বোঝে করুক। তার অত মাথাব্যথা নেই আর।

জ্ঞানেশ খাটের পাশে দাঁড়িয়ে সাত্যকিকে একবার দেখে নিল। কৃষ্ণ সেই একই ভাবে বসে আছে। ঝিম মেরে। দেবীর অবস্থা শোচনীয়। চোখে মুখে ক্লান্তির ছায়া।

জ্ঞানেশ বললে, 'পকেট থেকে সব বের করে নিয়েছেন!'

শিবপদ বললে, 'হ্যাঁ।'

'আবার সব ঢুকিয়ে দিন।'

'কেন?'

'কোনও প্রমাণ না রাখাই ভাল। পরে গোলমাল হতে পারে।'

'তোমার প্ল্যানটা কী?'

'ভেরি সিম্পল। গাড়িতে তুলবো, তারপর যে কোনও একটা নির্জন জায়গায় ফেলে দিয়ে আসব।'

'সে কী? এমন একটা অমানবিক কাজ করা ঠিক হবে! সাত্যকি আমাদের বন্ধু।'

'এক সময় বন্ধু ছিল। এখন আপনাদের শত্রু। পুলিসে ছুঁলে সহজে নিস্তার পাবেন?'

'কেন পাব না! আমরা তো খুন করিনি। স্বাভাবিক মৃত্যু। জ্ঞানেশ তুমি অন্য কিছু ভাব। একটু মানবিক কিছু ভাব।'

'বেশ। তাহলে আনআইডেন্টিফায়েড, আনক্লেমড ডেডবডি বলে যে কোনও হাসপাতালে ফেলে দিয়ে আসি।'

'আর কী কিছু ভাবা যায় না জ্ঞানেশ?'

'মাস্টারমশাই, যার কোনও ঠিকানা নেই, আত্মীয়-স্বজন কোথায় আছে জানা নেই, তাকে আপনি কী করবেন! কতক্ষণ মড়া আগলে বসে থাকবেন?'

কৃষ্ণপদ সেই ঝিম মারা অবস্থাতেই বললে, 'সাত্যকি যদি আমাদের ভাই হত! ধরেই নাও না ও আমাদের ভাই। আমরাই শ্মশানে নিয়ে গিয়ে সৎকার করে আসি।'

'তারপর! ভদ্রলোকের ইনসিওরেন্স থাকতে পারে, বিষয়-সম্পত্তি থাকতে পারে। কারুর কাছে টাকা পাওনা থাকতে পারে, দেনা থাকাও অসম্ভব নয়। কোনও অপরাধ করে থাকতে পারেন। অকারণে এত সব ঝুঁকি নেবার কোনও মানে হয়! পরে সামলাতে পারবেন?'

'জ্ঞানেশ, এইভাবে দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়া কী ঠিক হবে! এ ছাড়া আমাদেব কিছুই কী করার নেই!'

'তাহলে ইনি যেমন আছেন সেই রকম থাকুন, চলুন আমরা থানায় যাই। আজকালকার পুলিস কতটা দায়িত্বশীল, আমার সন্দেহ আছে।'

'পকেট থেকে আমরা যেসব কাগজপত্তর পেয়েছি একবার দেখবে তুমি! ওষুধের দোকানের একটা ক্যাশমেমো আছে। ওষুধ সাধারণত লোকে পাড়ার দোকান থেকেই কেনে।'

'তার মানে একটা ক্লু পাওয়া গেছে!'

'যে দীর্ঘকাল অসুখে ভুগছে তার সঙ্গে ওষুধের দোকানের একটা পরিচয় হযে যায়।'

জ্ঞানেশ তুড়ি মেরে বললে, 'হয়েছে। পেয়ে গেছি।'

'কী পেলে?'

'দেখি ক্যাশমেমোটা।'

দেবী মেমোটা জ্ঞানেশের হাতে দিল। জ্ঞানেশ এক নজরে দেখে নিয়ে বললে, 'এই দেখুন আপনারা লক্ষ করেননি, আজকাল ক্যাশমেমোতে ডাক্তারের নাম লেখা থাকে। এই যে স্পষ্ট লেখা রয়েছে ডক্টর বি কুণ্ডু।'

শিবপদ বললে, 'আরে তাই তো! এটা তো আমরা কেউ লক্ষ করিনি। জ্ঞানেশ তাহলে তো একটা রাস্তা পাওয়া গেল বাবা।'

'ডাক্তার যখন, বাড়িতে, চেম্বারে ফোন থাকবেই। আমি আমার বাড়ি থেকে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করি। না পেলে অন্য ব্যবস্থা।'

জ্ঞানেশ রাস্তায় বেরিয়ে এল। সেইখান থেকেই চিৎকার করে বললে, 'কী হল আমি একটু

পরেই জানিয়ে যাচ্ছি।'

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে হেডলাইট অন করতেই জ্ঞানেশের চোখ পড়ে গেল, পাঁচিল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে বর্ষাতি মোড়া লম্বা একটা চেহারা। এত রাতে, এই আবহাওয়ায় একটা লোক দাঁড়িয়ে আছে। কেন ? দাঁড়িয়ে থাকার মত কী আছে এখানে ?

আলোর বৃত্তে লোকটাকে বেশ কিছুক্ষণ ধরে রাখল। চেনার চেষ্টা করল। কে ? এ পাড়ার কেউ ! না বেপাড়ার কোনও বদমাশ। ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। জানলা দিয়ে মুখ বের করে জ্ঞানেশ প্রশ্ন করল, 'কে ? কে ওখানে ?'

কোনও উত্তর না দিয়ে লোকটি টলতে টলতে পাশের গলির অন্ধকারে মিশে গেল।

'ব্যাটা মাতাল।' জ্ঞানেশ গাড়ি ঘুরিয়ে নিল। পল্লীর রাত আর আগেকার কালের মত নিরীহ নেই। সূর্যাস্তের পরেই পাপের ঢাকনা খুলে যায়। গত ছ'মাসে এই পাড়ায় পর পর তিনটে খুন হয়ে গেছে। চুরি, ডাকাতি রোজের ঘটনা। ছিনতাই যে কোনও সময় হতে পারে।

শিবপদ বললে, 'বউমা এইবার তুমি বাড়ি যাও। বেশ রাত হয়েছে। মেয়েটা একা আছে।'

একা বাড়ি ফেরার সাহস দেবীর আর নেই। শশধর কোথায় কোন্ অন্ধকারে শিকারী বেড়ালের মত ওত পেতে আছে কে জানে ! দেবী খুব কিন্তু কিন্তু ভাবে বললে, 'বাবা, আপনি আমাকে একটু এগিয়ে দেবেন ?'

'নিশ্চয় দেবো। তুমি না বললেও দেবো মা। কেন জানি না আমার কেবলই মনে হচ্ছে, আমাদের একটা দুঃসময় আসছে।'

কৃষ্ণ বললে,'শিব, আমি কী করি বল তো? বাড়িতে তো কেউ নেই। শেকল তুলে দিয়ে চলে এসেছি।'

'আমি দেবীকে দিয়ে আসি, তারপর তুমিও চলে যাও। জ্ঞানেশ ভার নিয়েছে। দেখাই যাক না কী করে !'

ফাঁকা রাস্তা। দুদিকে দু বাহু প্রসারিত করে পড়ে আছে। এ মাথায় একটা ল্যাম্পপোস্ট, ও মাথায় একটা ল্যাম্পপোস্ট। টিম টিম করে আলো জ্বলছে। দেবী সতর্ক চোখে একবার এদিকে, একবার ওদিকে তাকাল। কেউ কোথাও নেই। শিবপদর গা ঘেঁষে হাঁটছে।

শিবপদ বললে, 'একটা সন্দেহজনক লোক বহুক্ষণ এখানে একভাবে দাঁড়িয়েছিল। এমন দিনকাল পড়েছে, কে যে কী উদ্দেশ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার মনে হয়েছিল লোকটাকে চ্যালেঞ্জ করি। তারপরে ভাবলুম মন মেজাজ ভাল নেই, অনর্থক কথা কাটাকাটির মধ্যে গিয়ে কী লাভ ! তবে মনে হল লোকটার কোনও বদ মতলব আছে। একা থাকো. একটু সাবধানে থেকো।'

দেবী শিবপদর আরও কাছে সরে এল। ওই লোকটির হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার একটা উপায় হল, আত্মহত্যা করা। নয় তো হত্যা করা। যেমন করেই হোক শশধর তাকে নষ্ট করবেই।

দেবীর কাঁধে হাত রেখে শিবপদ বললে, 'কী, ভয় করছে ? ভয়ের কী আছে মা। এইভাবেই আমাদের বাঁচতে হবে। মূল্যবোধহীন, বিভ্রান্ত পৃথিবীতে মৃত্যুই একমাত্র শান্তির উপায়।'

দেবীর জানলায় আলো জ্বলছে। নীল পর্দার গায়ে দুটি ছায়া। নড়ছে। চড়ছে। দুর্গা আর তোতা। মায়ের জন্যে জেগে বসে আছে। দরজার সামনে এসে শিবপদ বললে, 'এইবার আমি যাই।'

ফেরার পথে একটু লক্ষ করলে শিবপদ দেখতে পেত ছায়ায় ছায়ার মত দাঁড়িয়ে আছে বর্ষাতি মোড়া সেই লোকটি।



॥ সাত ॥

জ্ঞানেশ সেই যে গেল আর দেখা নেই। শিবপদ চেয়ারে বসে বসে মাঝে মাঝে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ছে। বয়েস হয়েছে। আগের মত আর ধকল সহ্য হয় না। মাথা ঝুলে আসছে বুকের দিকে। চমকে চমকে উঠছে। বাইরে গাছের পাতায় হাল্কা বৃষ্টির ঝিপ-ঝিপ শব্দ। মাঝে মাঝে বিদ্যুতের ঝিলিকে বাইরেটা নীল হয়ে যাচ্ছে। শিবপদর ভয় ভয় করছে। তন্দ্রার ঘোরে বিচিত্র বিচিত্র দৃশ্য ভেসে উঠছে। একবার মনে হল সাত্যকি বিছানায় উঠে বসেছে। শুধু বসেনি, মাথার ওপর দু হাত তুলে আড়ামোড়া ভাঙতে ভাঙতে হাই তুলছে।

চেয়ার ছেড়ে শিবপদ উঠে পড়ল। রাত একটা। জ্ঞানেশ স্রেফ ভাঁওতা মেরে গেল। শিবপদ পায়চারি শুরু করল। ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথা। একবার মনে হল টকটকে লাল শাড়ি পরে কে যেন এলো চুলে একতলা থেকে দোতলায় উঠে গেল। শিবপদর ইচ্ছে করছে দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে যায়। এ ধরনের অভিজ্ঞতা তার জীবনে কখনও হয়নি। শিবপদ ভাবার চেষ্টা করল, ঘণ্টা ছয়েক আগেও সাত্যকি কথা বলছিল। এখন একবারে নিথর, নিস্পন্দ। মুখ ফ্যাকাসে সাদা। কেমন যেন একটা গন্ধ বেরচ্ছে! মৃত্যুর গন্ধ। পৃথিবীতে এমন কোনও শক্তি নেই, যে শক্তি সাত্যকির নিথর দেহে আবার প্রাণের স্পন্দন আনতে পারে। এইখানেই মানুষের ব্যর্থতা। মারতে পারে। মৃতকে বাঁচাতে পারে না।

দোতলার ঘরে পিংপং বলের মত কী একটা পড়ে তিন চার বার লাফিয়ে উঠল। স্পষ্ট শব্দ। শিবপদর সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। কী পড়তে পারে মাথায় এল না। শূন্য ঘরে কোথাও কিছু নেই। বিকট সুরে একটা বেড়াল ডেকে উঠল। সহ্যের শেষ সীমায় এসে পড়েছে। এখন সে নিজেই নিজের মৃত্যু কামনা করছে। আর একবার বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। সাত্যকির মাথার দিকের কাঁচের জানলা নীল হয়ে উঠেছে। বাইরে কালো কালো আন্দোলিত গাছের মাথা। এক লহমার দেখা, সাত্যকির মুখ দিয়ে এক ভলক ধোঁয়া বেরিয়ে গেল যেন।

শিবপদ প্রায় ছুটে বাইরের বারান্দায় বেরিয়ে গেল। এ বাড়িতে আর এক মুহূর্তও থাকার সাহস নেই তার। সে পালাতে চায়। মৃদু একটা সৌরভ ধীরে ধীরে ছড়িয়ে পড়ছে বাতাসে। দোতলার শূন্য ঘরে কে যেন পায়চারি করছে। ক্ষীণ একটা কান্নার শব্দ ভেসে আসছে। শিবপদ নিজেই এবার কেঁদে ফেলবে।

বাইরে গাড়ির শব্দ হল। ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। অন্য মানুষ না থাকলে একা একজন মানুষ কী করত! কীভাবে বেঁচে থাকত এই সাংঘাতিক পৃথিবীতে। নিয়ত জন্ম-মৃত্যুর খেলা চলেছে যেখানে। মৃত্যুর পরেও যেখানে একটা রহস্য থেকে যায়। জ্ঞানেশ এসে গেছে।

'কিছু করতে পারলে জ্ঞানেশ?' শিবপদর উদভ্রান্ত প্রশ্ন।

'মনে হয় করা যাবে। তবে আজ নয়। কাল সকালে।'

'কাল সকালে? সকাল হতে তো এখনও অনেক দেরি। হঠাৎ এসে কী সাংঘাতিক অবস্থায় আমাকে ফেলে গেল।'

'মাস্টারমশাই, এখনও সময় আছে, আমার কথা শুনুন। দুর্যোগের রাত। রাস্তায় জনপ্রাণী নেই। গাড়ির পেছনের সিটে ফেলে হাসপাতালে দিয়ে আসি। মর্গে পড়ে থাক আনআইডেন্টিফায়েড ডেডবডি হয়ে। যা পারে পুলিসে করুক।'

'ওতে আমাব মত নেই জ্ঞানেশ। আজকের রাতটা তুমি আমার সঙ্গে থাকতে পারবে না জ্ঞানেশ ?'

'মাস্টাবমশাই, বাড়িতে আমার স্ত্রী একলা। বুঝতেই পারছেন, সবে বিয়ে করেছি।'

'না, তোমাকে আমি জোর করে আটকাতে চাই না।'

'আপনাব কী ভয় কবছে ?'

'শুনছ না, কে যেন কাঁদছে ?'

'ও তো বাতাসেব শব্দ।'

'তা হবে। দোতলায় কে যেন চলে বেড়াচ্ছে !'

'ইঁদুর মাস্টাবমশাই। ধেড়ে ইঁদুর।'

'তা হবে।'

'ভয় পাবেন না। ভয়েব কী আছে ?'

'সুন্দর একটা গন্ধ পাচ্ছ না ?'

'আপনাব বাগানে কামিনী ফুটেছে মাস্টারমশাই।'

'তা হবে।'

'আমি তাহলে আসি মাস্টাবমশাই। কাল সকালে আসছি। আপনার কাছে স্লিপিং পিলস নেই ?'

'কেন বল তো ?'

'এমনি আপনাব ঘুম আসবে না আজ। দুটো খেয়ে নিলে বাতটা বেশ কেটে যেত। আচ্ছা আমি আসি।' জ্ঞানেশ চলে গেল। নিজের ছেলেকেই ধরে রাখা যায় না। তা পরের ছেলে। আবাব শিবপদ একা। দরজা খুলে বাইরে একবার উঁকি মেরে দেখল। সেই বর্ষাতি মোড়া সন্দেহজনক লোকটাও যদি থাকত, তাহলে ডেকে এনে ভেতরে বসাত। চোর হোক, গুণ্ডা হোক, মাতাল হোক তবু তো একটা প্রাণী। শ্বাস প্রশ্বাস পড়ে। চোখের পাতা নাচে। কথা বলে। পথে কেউ নেই। প্রাণহীন কালো সরীসৃপের মত প্যাঁচ মেরে পড়ে আছে। দরজার সামনে একটা ব্যাঙ লাফাচ্ছে। শিবপদ ব্যাঙটাকে ভেতরে প্রবেশাধিকার দিল। নিথর, নিস্পন্দ, প্রাণহীন পরিবেশে অন্তত একটা কিছু চলে বেড়াক।

জ্ঞানেশ ঠিকই বলেছিল, বর্ষার জল পেয়ে বাগান ফুলে ভরে গেছে। যুঁই, কামিনী থোকা থোকা হয়ে ঝুলছে। রাতে গাছে হাত দিতে নেই। শিবপদ মনে মনে গাছের অনুমতি নিয়ে এক মুঠো ফুল তুলে নিল। সাত্যকি একেবারে একা শুয়ে আছে। প্রশান্ত মুখে নাকটি উঁচু হয়ে আছে। কিছু ফুল শিবপদ ছড়িয়ে দিল চারপাশে। মৃত্যুর গন্ধ চাপা পড়ে যাক। একটু মনোরম হয়ে উঠুক মৃতের শয্যা।

এইবার শিবপদ কী করবে ? হঠাৎ মনে হল তার এইবার স্নান করা উচিত। চীন দেশের প্রবাদ, বৃষ্টিতে ভিজে গেলে স্নান করে নেবে। তাহলে আর সর্দি হবে না। শিবপদ বাথরুমে ঢুকে দরজা বন্ধ করতেই দেখতে পেল, দরজার সঙ্গে লাগান তোয়ালের রেলে দেবীর ভিজে শাড়িটা ঝুলছে। তাড়াতাড়িতে খেয়াল করেনি। হালকা নীল রঙের শাড়ি ভিজে গিয়ে একটু গাঢ় হয়েছে। প্রায় মধ্যরাত। বাথরুমের ব্যাপারে শিবপদর কিঞ্চিৎ শৌখিনতা ছিল। চারপাশের দেয়ালে শ্বেতশুভ্র পোর্সিলেন টালি। ঝকঝকে বেসিন। কলের মাথা। দরজার গায়ে ঝুলে থাকা নীল একটি শাড়ি।

শিবপদর মনে হল মৃত্যু-টিত্যু কিছু নেই। জীবন বড় লোভনীয়। এই চোখ, এই নাক

শ্বাসপ্রশ্বাস, গন্ধ, বর্ণ, রূপ, তৃষ্ণা, তৃপ্তি, আকাঙ্ক্ষা, প্রেম, ভালবাসা, ঘৃণা, বিরহ, এই সব নিয়ে বেঁচে থাকার যে কী আনন্দ !

পাতলা ভয়েলের শাড়িটা শিবপদ বালতির জলে ডুবিয়ে দিল। জায়গায় জায়গায় কাদার ছিটে লেগেছে। জলে ভিজিয়ে শিবপদর মনে হল, কাজটা কী ভাল হল ! নিরাসক্ত এক বৃদ্ধ এখনও যুবতী এমন এক নারীর ছাড়া শাড়ি নিয়ে কেমন তন্ময় হয়ে আছে ! এ কী সেবা, না মানসিক বিকার !

কে যেন ভেতর থেকে ধমকে উঠল, 'শিবপদ !'

সঙ্গে সঙ্গে শাওয়ার খুলে জলের ক্ষিপ্রধারায় নিজেকে ডুবিয়ে দিল। অসম্ভব ঠাণ্ডা জল। শীত করছে। শিবপদ সরে গেল না। দাঁড়িয়ে রইল। যত শীত বাড়ছে ততই যেন সে মৃত্যুর স্বাদ পাচ্ছে। এইভাবে একদিন সেও শীতল হয়ে যাবে। দেহের সব উত্তাপ জুড়িয়ে যাবে।

বাইরে কোথাও একটা শব্দ হল। বেশ জোরে। জলের শব্দ ছাপিয়ে কানে এল। সঙ্গে সঙ্গে শাওয়ার বন্ধ করে দিল। বাইরে কেউ ঘুরছে। নিশ্চিত পদশব্দ। ভয়ের একটা শীতল স্রোত বয়ে গেল শরীরে। কে ? সাত্যকির প্রেতাত্মা ! বাথরুমেই বসে থাকবে সারা রাত !

মন বলে উঠল, বৃদ্ধ তোমারও মৃত্যুভয় ! আজ আর কাল ? যেতে তো তোমাকে হবেই। শিবপদ ধীরে ধীরে বাথরুমের দরজা ফাঁক করল। কেউ কোথাও নেই। বিদ্যুতের হলুদ আলোয় চারপাশ ঝিমঝিম করছে। শিবপদর মনে হল, এই মাত্র কিছু একটা হচ্ছিল। হঠাৎ তাকে দেখে সব অদৃশ্য হয়ে গেছে। ভয়ে ভয়ে শিবপদ বাইরে বেরিয়ে এল। ভালো করে গা মোছা হয়নি। জল গড়াচ্ছে চারপাশ দিয়ে। ভিজে বাতাসে গায়ে কাঁটা দিচ্ছে। ভয় নয়। নিশ্চিত একটা শব্দ তার কানে এসেছে। বাইরেটা একবার দেখা দরকার। দিনকাল ভাল নয়। সুধার সমস্ত গহনা এখনও আগলে বসে থাকতে হয়েছে এই বুড়োকে। যে নেই, সে তবু আছে। এই হল জীবনের মজা ?

শিবপদ অন্যমনস্ক। ঘরের মাঝামাঝি গেছে, হঠাৎ বাঁ পাশে সাত্যকির ঘরের দরজা খুলে গেল। সাদা চুল, দীর্ঘ এক পুরুষ। শিবপদ আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল। প্রায় অচেতন হয়ে যাবার মত অবস্থা।

'এই শিব, আমি, আমি রে, আমি কৃষ্ণপদ।'

শিবপদ একটা ড্রয়ার ধরে চোখ বুজিয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিল। ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল।

'সদর খোলা রেখে বাথরুমে ঢুকেছিস ! ভাগ্যিস এলুম। খুব ভয় পেয়ে গেছিস। নে নে, জামা কাপড় পরে নে। এত রাতে চান করলি ?'

কৃষ্ণপদর বগলে দাবার বোর্ড। হাতে ঘুঁটির বাক্স। আচমকা ধাক্কায় শিবপদর বাক্‌রোধ হয়ে গেছে। ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে আছে দাদার দিকে। সাদা পাজামা, ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি, এক মাথা সাদা চুল। যেন দেবদূত !

শিবপদ জামা-কাপড় ছাড়ছে। কৃষ্ণ বললে, 'কী ব্যবস্থা হল ?'

'কাল সকালে একটা কিছু করা যাবে মনে হচ্ছে।'

'বিছানায় ফুল ছড়িয়ে দিয়েছিস ?'

'হ্যাঁ। বড় ফাঁকা ফাঁকা লাগছিল। মনে হল মৃত্যুকে অত অনাদর করা উচিত নয়।'

'বেশ করেছিস। মৃত্যু একবার বেরিয়ে গেল। পরিচয় করে গেল। এরপর আমাদের নিতে আসবে। খেয়েছিস ?'

'না। আজ আর খাওয়া যায় না খাওয়া উচিত !'

'আয়, তাহলে বসা যাক।'

'আজকে খেলার মেজাজ আসবে ?'

'আরে, ধুর। জীবনটাই তো খেলা রে ! দাবা খেলা। একদিকে ভাগ্য একদিকে মানুষ। রাত যখন জাগতেই হবে, আয়, মৃত্যুকে দেখিয়ে দি, মৃত্যু তুমি আমাদের কাছে পরাজিত।'

কৃষ্ণ হা হা করে হেসে উঠল।

'তুমি এখানে রাত জাগবে, বউদির কী ব্যবস্থা করে এলে ?'

'মহামূল্য অলঙ্কারের মত তালাচাবিতে রেখে এসেছি।'

দাবার ছক পেড়ে দু' ভাই মুখোমুখি বসল। কৃষ্ণ বললে, 'আমি কালো, কারণ আমি কৃষ্ণ, তুই শিব, তোর সাদা।'

তিন চাল চালাব পর কৃষ্ণ বললে, 'কী মজা ! ওইরকম একটা ভবঘুরে লোক ও ঘরে চিত হয়ে পড়ে আছে। সামান্যতম নড়বার ক্ষমতা নেই। ডেকে দ্যাখ, সাড়া পাবি না। কী ঘুম। একবার ভেবে দেখ। এ জীবনে আর ভাঙবে না।'

'দাদা তোমার গজ সামলাও।'

'তোর নৌকো যে এদিকে টলমল।'

কৃষ্ণ চাল চেলে বসে আছে। শিবপদ ভাবছে কোন রাস্তায় বেরবে।

কৃষ্ণ বললে, 'তুই কী জানিস আমার জীবনে কুমুকে নিয়ে এসেছিল ওই সাত্যকি বোস।'

'তা হবে। তোমার ওই ব্যাপারটা আমাদের পরিবারে নিষিদ্ধ আলোচনার মতই ছিল ফিসফাস হত ঠিকই। তবে তেমন নয়।'

'কুমু খারাপ মেয়ে এই ছিল তোদের ধারণা।'

'আমার কোনও ধারণাই ছিল না।'

'সেই সময়ে তুই আমাকে ঘৃণা করতিস না ?'

'তোমাকে চিরকালই আমি গুণী মানুষ বলে শ্রদ্ধা করতুম। বরং তুমিই আমাকে স্কুল মাস্টার বলে নাক সিঁটকোতে।'

'ভুল ধারণা। তোকে আমি ভয় পেতুম আদর্শবাদী শিক্ষক হিসেবে। প্রেম কাকে বলে জানিস ? লাভ।'

'প্রেম ? কোন প্রেম ?' মানব প্রেম ? ঈশ্বরে প্রেম ?'

'শোন শিব প্রেম মানে প্রেম। অত শ্রেণী বিচার আমি বুঝি না। প্রেম হল মনের অদ্ভুত এক অবস্থা। ফুল ফোটে। পাখি গায়। জলে চাঁদের কিরণ ঝলমল করে। বাইরে নয়। সব মনেই হতে থাকে। ভূতে পাওয়ার মত অদ্ভুত এক পাওয়া। কুমুকে দেখে আমার সেই অবস্থা হয়েছিল। সাত্যকি চেয়েছিল ভোগ করতে আর আমি চেয়েছিলুম পুজো করতে। আমাদের সেই সব দিন কোথায় গেল রে শিব। সেই মন !'

'দাদা তোমার ঘোড়া সামলাও। কী খেলছ আজ ! হেরে যাবে যে !'

'হার জিতের খেলা অনেক খেলেছি। এখন খেলার জন্যে খেলা। এ খেলায় কোনও উদ্বেগ নেই। নে না নে। তুই আমার ঘোড়াটা খেয়ে নে।'

'কুমুর জন্যে তুমি অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছ, কিন্তু··।'

'কুমু বলছিস কেন ? বউদি বলতে তোর এখনও ঘৃণা !'

'দাদা, প্রেম, ঘৃণা, মান অভিমানের বয়েস আমরা পেরিয়ে এসেছি রে। বউদি একটা সাধারণ সম্বোধন। কুমু বললে চরিত্রটা অনেক নির্দিষ্ট হয়, তাই বলেছি।'

'বল, বল। কী বলছিস বল। দে দে অতীতের সব দরজা আজ খুলে দে।'

'তোমার ত্যাগের মর্যাদা কী বউদি দিয়েছিল ?'

'অবশ্যই দিয়েছিল। ওই সাত্যকি, ওই ভবঘুরে, ভোগী সাত্যকি কম টোপ ফেলেছিল ব্যাটা আমার কাছে হেরে ভূত হয়ে গেছে। শিব তুই লিখে রাখ, ভোগীর দুনিয়া খুব ছোট, ভীষণ সঙ্কীর্ণ। প্রেমিকের দুনিয়া বিশাল। কুমু পয়সার জন্যে মডেল হতে এসেছিল। ওর পয়সার

প্রয়োজন ছিল। পয়সার জন্যে আরও নিচে নামতে পারত। তোরা তখন আমার বিরোধিতা করেছিলি।'

'আমাকে জড়িও না। আমার কোনও ভূমিকা ছিল না। কোনও কোনও ব্যাপারে চিরকালই আমি একটু ভোঁতা।'

'সুধার সঙ্গে তোর কী সম্পর্ক ছিল?'

'সত্যি কথা বললে বিশ্বাস করবে?'

'খুব করব। আজ একটা বিশেষ দিন। মৃত্যু আজ এ বাড়ির বিশেষ অতিথি।'

'সুধা ছিল আমার মা। বকত, ধমকাত, আদর করত, জোর করে খাইয়ে দিত, অবাধ্য হলে চুলের মুঠি ধরে নেড়ে দিত। শীতের রাতে জেগে জেগে উঠে দেখত, আমার গা থেকে চাপা সরে গেছে কী না! তুমি জেনে রাখ দাদা, আমি দুবার মাতৃহারা হয়েছি। বিশ্বাস করো, আর আমার বাঁচতে ইচ্ছে করে না। আমি মরেই গেছি।'

'তাহলে শোন, আমি এখন কুমুর বাবা। আমার মাঝে মাঝে কী ইচ্ছে করে জানিস, দু'জনে এক সঙ্গে মরি। আমি চলে গেলে কে দেখবে ওকে। কেন আমি আফিং ধরেছি বল তো!'

'তোমার সাফল্যের দিন ভোলার জন্যে।'

'না রে! জীবন তো ঢেউয়ের নৌকো। উঠবে, পড়বে। সে জন্যে নয়। আফিং খেলে পরমায়ু বাড়ে। মানুষ দীর্ঘজীবী হয়।'

'একবার শেষ চেষ্টা করে দ্যাখো না, বউদিকে যদি ভালো করা যায়!'

কৃষ্ণ হঠাৎ একটা চাল দিয়ে বললে, 'কিস্তি মাৎ।'

শিবপদ অবাক হয়ে দেখলে, সত্যিই কিস্তি মাৎ। তার আর নড়বার চড়বার উপায় নেই।

কৃষ্ণ হো হো করে হেসে বললে, 'শেষ চেষ্টা একবার করব। কালপ্রিটটা মরেছে। তুই ঠিক ধরিয়েছিস। কুমুর সামনে ওর মৃতদেহটা শুইয়ে দিয়ে দেখব, কিছু হয় কী না! হতে পারে। আজ হারতে বসে যখন জিতেছি তখন হতে পারে! আমার লাক। ভাগ্য আবার হাসতে পারে। এমন তো হয়!'



॥ আট ॥

তোতার শোবার ধরনটা হল, দু'হাত দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরবে, আর একটা পা তুলে দেবে মায়ের গায়ে। মাকে পাশ বালিশ করে না শুলে তার ঘুম আসবে না। রেশমের মত এক মাথা চুলে দেবীকে ধীরে ধীরে হাত বোলাতে হবে। ঘুম আসার আগে পর্যন্ত যে কোনও অদ্ভুত একটা মানুষ অথবা জীবের গল্প শোনাতে হবে। তোতার নানা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। 'বাঘ কেন মানুষ খায় মা?' 'চিড়িয়াখানার বাঘ রোজ একটা করে মানুষ খায় মা?' 'কুমীরের পিঠে ওরকম গোটাগোটা কাঁটা থাকে কেন মা?' 'হাতির সামনের দুটো দাঁত অমন লম্বা কেন মা?' সাতদিন আগে শোনা গল্পের একটু কিছু নিয়ে হঠাৎ প্রশ্ন করবে, 'সেই লোকটার মাথায় যে ঝাঁকা ছিল, সেই ঝাঁকায় কী ছিল মা? পায়রা?' সাতদিন আগে বানিয়ে বানিয়ে দেবী কী বলেছিল, তা কী আর মনে আছে? মেয়ের প্রশ্নের উত্তরে হয়তো বললে, 'হ্যাঁ মা পায়রা ছিল।' তোতা অমনি

সঙ্গে সঙ্গে বলবে, 'তবে যে বললে মুরগী ছিল।'

প্রশ্নে প্রশ্নে দেবী জেরবার হয়ে যাবে। সব প্রশ্নের উত্তর দেবী দিতে পারে না। অত কী তার জানা আছে ? ধীরে ধীরে তোতার ঘুম এসে যায়। কথা জড়িয়ে আসে। দেবীর গালে তোতার মিষ্টি নিশ্বাস এসে লাগে। দেবী তখন সব দুঃখ ভুলে যায়। জানলার কাছে রাখা টেবিলটার দিকে তাকিয়ে থাকে। মশারির ভেতর থেকে ঝাপসা দেখায়। ওই টেবিলে বসে অনেক রাত পর্যন্ত তার স্বামী টেবিল ল্যাম্প জ্বেলে লেখাপড়া করত। ঢাকা লাগান সেই ল্যাম্পটা এখনও আছে। কিন্তু আলো আর জ্বলে না।

তোতা ঘুমিয়ে পড়েছে। দেবীর চোখে ঘুম নেই। শিবপদর কথা ভাবছে। ঝিপঝিপ বৃষ্টি সমানে পড়ে চলেছে। বৃদ্ধ মানুষ। আজ কী বিপদেই না পড়েছেন ? সারা রাত মড়া আগলে বসে থাকা। উপায় থাকলে সারা রাত সে আজ ওইখানেই থেকে যেত। তোতার কপাল ঘামছে। জ্বর ছাড়ছে। আঁচল দিয়ে কপালটা মুছে দিল। তোতা স্বপ্ন দেখে খিল খিল করে হেসে উঠল।

হিংসে হয়। তোতাকে দেখে তার হিংসে হয়। এক সময় তারও ওই বয়েস ছিল। তবে তার মা ছিল না। বাবা দ্বিতীয়বার বিয়ে করেছিলেন। দু নম্বর মা খারাপ ছিলেন না, কিন্তু বাবাকে তাঁর কাছ থেকে সহজে আলাদা করা যেত না। তখন দেবী বুঝত না, এখন দেবী বোঝে। স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক সম্পর্কে শিশুর স্থান নেই। স্বামী বেঁচে থাকলে তোতা কী তাকে এইভাবে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতে পারত !

দরজায় একটা শব্দ হল। দেবীব কান খাড়া হয়ে উঠল। যেন কুকুরে আঁচড়াচ্ছে। দেবী ধীরে ধীরে বালিশ থেকে মাথা তুলল। তোতার জড়িয়ে ধরা হাত শিথিল হয়ে গেছে। কোমরের ওপর তার আলগা পা। দরজায় আবার শব্দ। সেই নিশীর ডাক, 'দেবী, দেবী।'

দাঁতে দাঁত চেপে দেবী মনে মনে বললে, আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক। প্রয়োজন হলে, খুন করে ফেলে দেব। ধীরে ধীরে মশারি তুলে দেবী নেমে পড়ল বিছানা ছেড়ে।

'দেবী, দেবী।'

আশ্চর্য ! লোকটার ঘর-সংসার নেই। প্রাণের ভয় নেই। মান-অপমান বোধ নেই। এর নাম প্রেম নাকি ? দেবীর প্রেমে পড়ে গেছে মাঝ বয়সী সংসারী একটা লোক ! শুধু দেহের লোভে হলে আরও অনেক সহজ রাস্তা খোলা ছিল।

অন্ধকারে হাতড়ে হাতড়ে দেবী দরজা খুলল। এক ঝাপটা ঠাণ্ডা বাতাসের সঙ্গে দরজায় পিঠ রেখে বসে থাকা শশধর পেছন দিকে উল্টে পড়ল। মুখে ল্যাম্পপোস্টের আলো পড়ছে। কপালের একটা পাশ থেঁতলে গেছে। সারা গায়ে জলকাদা মাখামাখি। শশধর উল্টে পড়ে আছে দেবীর পায়ের কাছে। প্রথমে মনে হয়েছিল, এক লাথি মেরে বাইরে ফেলে দেয় ফুটবলের মত। মুখের দিকে তাকিয়ে বড় করুণা হল।

শশধরের অর্ধেক শরীর ভিতরে অর্ধেক শরীর বাইরে। সেই অবস্থায় করুণ কণ্ঠে বললে, 'দেবী, এক গেলাস জল খাওয়াবে ?'

দেবী ফিস ফিস করে বললে, 'ভেতরে আসুন।'

'না না, আমি রাস্তার কুকুর ভেতরে যাব কী ? তোমার পবিত্র দেবালয় অপবিত্র হয়ে যাবে।'

শাসনের সুরে দেবী বললে, 'ভেতরে আসুন। দরজা বন্ধ করব।'

শশধর ঘষটে ঘষটে বাধ্য কুকুরের মত ভেতরে চলে আসতেই দেবী দরজা বন্ধ করে দিল। বৃষ্টির ছাটে পাপোশ এরই মধ্যে ভিজে উঠেছে। মেঝেতেও জল এসে গেছে। দেবী হাত বাড়িয়ে অল্প পাওয়ারের বাতিটা জ্বেলে দিল। ঘরে একটা নীল মায়া খেলে গেল। ক্ষতবিক্ষত সৈনিকের মত মেঝেতে বসে আছে শশধর। দেবী মশারির দিকে তাকাল, তোতা অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

দেবী এক গেলাস জল এনে শশধরের হাতে ধরিয়ে দিল। শশধরের হাত কাঁপছে। তৃষ্ণার্ত পশুর মত চোঁ চোঁ করে জলটুকু খেয়ে নিল, তারপর করুণ দৃষ্টিতে দেবীর দিকে তাকিয়ে রইল।

'আপনি বাড়ি যান না কেন ?'

শশধরের ক্ষতবিক্ষত মুখে হাসি খেলে গেল, 'আমাকে কেউ চায় না দেবী। আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। এই তো বাড়ি ঢুকতে চেয়েছিলুম, এই অবস্থা করে দিয়েছে আমার।'

চারপাশে গোল করে আঙুল ঘুরিয়ে শশধর নিজের মুখ দেখাল।

'আপনার এ অবস্থা কে করলে ?'

'খুব আপনজন। আমার মায়ের পেটের ছোটভাই। প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে দেবী। তোমার যখন প্রয়োজন ছিল, খুব খাতির করতে। যেই প্রয়োজন ফুরল চড় মারলে। পৈতৃকবাড়ির অংশটা যেই লিখে দিলুম ছোট ভাই মাতাল বলে জুতো পেটা শুরু করলে। জগতের এই তো নিয়ম দেবী ! বড়লোক মাতাল হলে বলবে, আউট হয়ে গেছে। ছোটলোক মাতাল হলে বলবে, ব্যাটা ধেনো খেয়েছে। একটা গৌরবের আর একটা ঘৃণার ?'

'কেন মদ খান ? মদ খাবেন কেন ?'

'কেন খাই ? ভোলার জন্যে খাই। পৃথিবী ছেড়ে পালাবাব জন্যে খাই। অল্প কিছুক্ষণ প্রেমিক হবার জন্যে খাই। যেখানে যা নেই তা আছে, এই দেখার জন্যে খাই। আচ্ছা, আমি তাহলে আসি।'

'এসেছিলেন কেন ?'

'তোমাকে বলতে, আর কোনও দিন তোমাকে জ্বালাতে আসব না। ধরো আজই আমার শেষ রাত। খারাপ লোককে দুর্যোগের রাতেই যেতে হয় দেবী। তুমি শুনেছ ? রেডিওর আবহাওয়া বার্তা শুনেছ ! প্রবল ঘূর্ণি ঝড আসছে।'

'কোথায় যাবেন এখন ?'

'তা তো জানি না। পৃথিবীর শেষ কোথায়, কত দূরে তা তো আমার জানা নেই।'

'মেঝেতে আপনার বিছানা করে দিচ্ছি। এইখানে শুয়ে থাকুন। ভোর হলে চলে যাবেন।'

'না না, তোমার বদনাম হয়ে যাবে দেবী। তুমি এতকাল আমাকে ভুল বুঝে এসেছ। আমি খারাপ তবে সে খারাপ নই, যে মেয়েদের ভয় পেতে হবে। তোমাকে আমি সব কথা পরিষ্কার করে বলি, যাবার আগে অন্তত একজনকে বলে যাই।'

'আজ রাতে আপনার কোনও কথা শুনবো না। তোতার জ্বর। অতি কষ্টে ঘুম পাড়িয়েছি। উঠে পডলে বিপদে পড়ে যাব।'

দেবী আলমারি খুলে তুলো আর ওষুধ বের করল। একটু গরম জল পেলে ভাল হত। এই রাতে কে আবার স্টোভ জ্বেলে গরম জল করে। দেবী তুলোটা শশধরের কপালে চেপে ধরল। শুধু থেঁতলে যায়নি। জলকাদায় অপরিষ্কার হয়ে আছে। অবিলম্বে এ টি এস দেওয়া উচিত। একটা অ্যাম্পিউল থাকলে নিজেই দিয়ে দিতে পারত। ভেবেছিল ওষুধ পডলেই শশধর যন্ত্রণায় চিৎকার করে উঠবে। শশধরের যন্ত্রণাবোধও নষ্ট হয়ে গেছে। দেয়ালে হেলান দিয়ে নিশ্চেষ্ট মানুষের মত বসে আছে, যেন আজই তার পৃথিবীতে শেষ রাত। শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল। মদের গন্ধ দেবী একেবারেই সহ্য করতে পারে না। গা গুলিয়ে উঠল। তবু করুণা হল লোকটির জন্যে। স্বামীর মৃত্যুর পর সত্যিই অনেক করেছে। শশধরের সাহায্য ছাড়া পাওনাগণ্ডা আদায় হত না। চাকরিটাও জুটত কি না সন্দেহ। অতীতের কথা মনে পড়ছে। আজ শশধর যেভাবে দেয়ালে পিঠ দিয়ে হতাশ হয়ে বসে আছে, দেবীকেও একদিন ঠিক ওইভাবে স্বামীর অফিসের বেন্চে বসে থাকতে হত ঘণ্টার পর ঘণ্টা। আর শশধর কাগজ হাতে দৌড়োদৌড়ি করত এ টেবিলে ও টেবিলে। একজন মানুষের মৃত্যু সহকর্মীদের ওপর কোনও দুঃখের ছায়া ফেলেছে বলে মনেই হত না। সবাই হাসছে, গল্প করছে, চা খাচ্ছে। সিগারেটের

ধোঁয়া ছাড়ছে। এলাহি অফিসের এলাহি ব্যাপার। শশধর একদিন রাস্তায় বেরিয়ে এসে দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে বলেছিল, এ মুখে আবার যে কবে হাসি ফুটবে ? ঈশ্বরের সঙ্গে যেদিন দেখা হবে সেদিন সবার আগে প্রশ্ন করব, তোমার বিচারের নীতিটা কী ঈশ্বর ? তুমি কখন কাকে তুলে নাও, কখন কাকে রেখে দাও খেয়ালখুশিমত, মানুষের যে বোঝার উপায় নেই। পাকাফল গাছে ঝুলছে দিনের পর দিন। কাঁচা ফল ঝরে পড়ছে টুপটাপ। 'তোমার সারাদিন আজ খাওয়া হয়নি' বলে শশধর সেদিন জোর করে দেবীকে এক রেস্তোরাঁয় ঢুকিয়েছিল। বেয়ারা পর্দাফেলা খাঁচায় বসবে ভেবে, পর্দা সরিয়ে বসার ইঙ্গিত করেছিল। শশধর বলেছিল, 'না আমরা বাইরেই বসি।' কই তখন তো মানুষটি এমন ছিল না। ভেতরে এত দুঃখ যে জমা আছে, তা তো বোঝা যায়নি। এত মদ তো তখন খেত না ! আজ আবার বলছে দেবীকে সে অন্য চোখে দেখে। কী এক গল্প শোনাতে চায়। সবটাই কী নেশার ঘোর ! নেশার ঘোরে পড়ে গিয়ে বলছে, ভাই জুতো মেরেছে।

শশধর বললে, 'আমি এবার যাই।'

দেবী মেঝেতে একটা তোশক বিছিয়ে বললে, 'কোথায় যাবেন ? শুয়ে পড়ুন এখানে। গা থেকে খুলে ফেলুন ওসব।'

'তোমাকে সবাই ছি ছি করবে।'

'সে আমি বুঝব।'

'আমি আর ভদ্রলোক নেই দেবী।'

'সেও আমি বুঝব। এই নিন বালিশ। আর একটাও কথা নয়।'

শশধরের গা থেকে জোর করে টেনে রেনকোট খুলে নিল। পা থেকে কাদামাখা জুতো দুপাটি খুলে ঘরের কোণে ছুঁড়ে দিল। তারপর আলতো ধাক্কায় শশধরকে শুইয়ে দিল বিছানায়। শীত শীত রাত। বিছানায় একটা চাদর টেনে দিল গায়ে।

চাদরের তলা থেকে শশধর প্রায় কান্নার মত শুধু বললে, মা।

একই নারীকে মানুষ কত ভাবে খুঁজছে। মশারির ভেতর থেকে তোতা ডাকল, 'মা । তুমি কোথায় ?'

দেবী বিছানায় এসে মেয়েকে কোলের কাছে জড়িয়ে ধরে বললে, 'এই যে মা। এই তো আমি তোমার কাছে ?'

'কে এসেছে মা ? ফলঅলা ?'

'ফলঅলা আসবে কী রে এত রাতে ?'

'তবে কে মা ?'

'শশধর কাকু।'

'মা, আর কত পরে সেই দোয়েল পাখিটা উঠবে ?'

'আর একটু পরেই উঠবে মা।'

'ওদের ঘড়ি আছে বুঝি ?'

'আলোই ওদের ঘড়ি। আকাশ লাল হলেই ওদের ঘুম ভেঙে যায়।'

'আমাদের কেন ভাঙে না মা।'

'আমরা পাখি নই বলে।'

দেবীর হাই উঠল। সারা দিনের ক্লান্তি। চোখে ঘুম এবার জড়িয়ে আসছে। তোতা বলল, 'মা তুমি কাল বেরুবে ?'

মেয়ের কপালে একটা হাত রেখে দেবী বলল, 'কালকের কথা কাল ভাবা যাবে মা। আজ তুই ঘুমো।' মা আর মেয়ে গলা জড়াজড়ি করে দু'জনেই ঘুমিয়ে পড়ল আবার। শশধর আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে মেঝেতে। দমকা বাতাসে বন্ধ দরজা জানলা কেঁপে

উঠছে মাঝে মাঝে। কোথাও একটা টেবিল ঘড়ি সমানে টিকটিক করে চলেছে। আজ পায়ে পায়ে এগিয়ে চলেছে কালের দিকে।

বিশাল খাটের একপাশে তনু জড়োসড়ো হয়ে শুয়ে আছে। যেন অন্যের এলাকায় সে এক অবাঞ্ছিত অতিথি। ফিনফিনে পাতলা নেটের মশারির বাইরে ঝাপসা বাস্তব। ছবি, চেয়ার, টেবিল, সুদৃশ্য ঢাকা লাগান টেবিল ল্যাম্প। দু হাত দূরে অমিতাভ চিত হয়ে শুয়ে আছে নিশ্চিন্ত আরামে। সাদা পাজামা, সাদা পাঞ্জাবি, সুখী মানুষটির মতো। যেমনটি দেখা যায় বিজ্ঞাপনে। বারান্দা থেকে বিছানায় এসে তনু দেখেছে অমিতাভ ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু অ্যাশট্রেতে ফেলে দেওয়া সিগারেটের অংশটি ধীরে ধীরে শেষ নিঃশ্বাস ছাড়ছিল। এই ক'বছরে তনু বুঝে গেছে কোনও ব্যাপারই অমিতাভর মনে বেশিক্ষণ স্থান পায় না। ছায়াছবির মত আসে আর চলে যায়। শিবপদকে ফেলে চলে আসায় তার ঘোরতর আপত্তি ছিল। অমিতাভ তার কোনও কথা শোনেনি। অনেক সব যুক্তি খাড়া করেছিল, যার কোনটাই ধোপে টেঁকে না। নিজে সুখে থাকতে চায়, এইটাই বড় কথা। তার সুখের সীমানায় অন্যের প্রবেশাধিকার নেই। সে যেই হোক।

ভাবতে ভাবতে তনু অবশেষে ঘুমিয়ে পড়েছে। বিছানার একপাশে। খোঁপাটি ভেঙে পড়েছে বালিশে। তনুর মাথায় অনেক চুল। খোঁপা খুলে দিলে কোমর ছাপিয়ে নেমে যাবে কালো ঢেউয়ের মত। এক সময় খুব ভাল নাচত। সেই নৃত্যের ছন্দ স্থির হয়ে আছে শরীরে। বিয়ের আগে দু'চারজন প্রেমিক ছিল। তনু তাদের পাত্তা দেয়নি। সে একটু নীতিবাগীশ, পুরনো ধাঁচের মেয়ে। অনেকটা তার মায়ের মতো। ছেড়ে চলে আসার পর থেকে সর্বক্ষণ শিবপদর কথা ভেবে ভেবে মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। স্বপ্নেও শিবপদ। অমিতাভ তার জীবন থেকে যেন বেরিয়ে গেছে। অসীম শূন্যতায় কাটা ঘুড়ির মত তনু ভেসে চলেছে।

•

কৃষ্ণপদ ছকে ঘুঁটি সাজাতে সাজাতে বললে, 'কী খেলা হচ্ছে বল তো ? মাথামুণ্ডু নেই।'

শিবপদ বললে, 'ধরে নাও, খেলার খেলা।'

'তোর পেছন দিকে একবার তাকিয়ে দেখ। বড় আয়নায় আমরা দু'জনে কী রকম ভাসছি। যেন দুটো মানুষের বুদবুদ। বেঁচে থাকার কোনও উদ্দেশ্যই নেই অথচ বেঁচে আছে। মাঝে মাঝে এত বিরক্তি লাগে। পাখির মতো। উড়তে চাইছে। পায়ে বেড়ি। সাত্যকিটা কেমন মুক্তি পেয়ে গেল।'

'কী করে বুঝলে ? কিছুই বলা যায় না। হয়তো এতক্ষণে আবার বাঁধা পড়ে গেছে। কোনও জননীর গর্ভে। আবার নতুন করে সেই একই খেলা।'

'তা যা বলেছিস। এ রহস্যের আর সমাধান হল না।'

'দাদা তোমার হুডিনির নাম মনে পড়ে ?'

'কে, সেই বিখ্যাত যাদুকর ! পৃথিবী কোনও দিন তাঁর কথা ভুলবে ? হুডিনি, কিং অফ হ্যাণ্ডকাফস্। তোর মনে পড়ে, তাঁর সেই বিখ্যাত খেলা মেটামরফসিস্।'

'ও, তুমি সেই খেলাটার কথা বলছ, পিছমোড়া করে হুডিনিকে থলেতে ভরা হল। বেঁধে দেওয়া হল থলের মুখ। ভরা হল লোহার সিন্দুকে। চেন দিয়ে বাঁধা সেই সিন্দুক থেকে নিমেষে বেরিয়ে এলেন। সিন্দুক পড়ে আছে যেমন তেমনি। খুলে দেখা গেল ভেতরে বন্দী হয়ে আছেন তাঁর প্রিয়তম স্ত্রী বেস।'

'এই খেলায় প্রথমে তাঁর সহকারী ছিলেন জা জ্যাকব। জ্যাকব চলে যাবার পর সহকারী হয়েছিলেন ভাই থিও। এরপরই হুডিনি বেসের প্রেমে পড়ে বিয়ে করলেন। অমন প্রেমিক দম্পতি পৃথিবীতে খুব কম দেখা যায়।'

'তুমি বলছ, বাঁচতে আর ইচ্ছে করে না। তুমি কী হুডিনির চেয়ে কম প্রেমিক! তুমিও তো রংতুলির যাদুকর। হ্যাঁ যে কারণে হুডিনির প্রসঙ্গ তুললাম। শুনবে সেই গল্প?'

'বল, বল! আয়নাটার দিকে তাকালে ভীষণ অস্বস্তি হচ্ছে। মনে হচ্ছে বহুকাল আগে মৃত দুটো মানুষের প্রেত মুখোমুখি বসে আছে।'

'ওদিকে তাকাচ্ছ কেন?'

'মাঝে মাঝেই চোখ চলে যাচ্ছে। নে তোর গল্প বল।'

'হুডিনি জন্মেছিলেন বুদাপেস্টে। খুবই এক সুখী পরিবারে। সুখী বলতে তুমি কী বোঝো? ধন, জন, অর্থ প্রতিপত্তি?'

'না না, সে বয়েস পেরিয়ে এসেছি। কীসে যে সুখ, অন্ধের মত হাতড়ে বেড়াচ্ছি। তুই বলতে পারিস ভাই?'

'চেষ্টা করে দেখতে পারি।'

'কর কর, এতদিন করিসনি কেন?'

'শোনো তাহলে, খুব সহজ আবার খুব শক্ত। অন্যকে সুখী করার মধ্যেই নিজের সুখ। বুঝলে কিছু? সুখ সোজাসুজি জীবনে আসে না। আসতে পারে না। সুখ আসে প্রতিফলিত হয়ে। আলো ঠিকরাবার ক্ষমতা হীরের যদি না থাকত তা হলে হীরে হয়ে যেত কাঁচ। তুমি কী ভাবো অমিতাভ সুখী?'

'আবার অমিতাভর কথা তুলছিস কেন?'

'তুমি কী ভাব অমিতাভ হীরে। না। পলকাটা কাঁচ। অনেক টাকা মাইনে। নামের পেছনে সার সার ডিগ্রি ডিপ্লোমা। তার আলো কিন্তু আমাদের চোখে এসে লাগে না।'

'তুই এক কথা থেকে আর এক কথায় চলে যাচ্ছিস।'

'না। তা যাইনি। হুডিনি কেন অত বড় হতে পেরেছিলেন জানো? সাধনা তো ছিলই। অসীম সাধনা। সবার ওপরে ছিল মাতৃভক্তি। তুমি জানো, হুডিনি ছেলেবেলায় কখনো কাঁদেনি। যে শিশু কাঁদে না সে কেমন শিশু তুমি ভাবতে পারো। মায়ের বুকে মাথা রাখলে, তার আর কোনও দুঃখ থাকত না। সব জ্বালা-যন্ত্রণা জুড়িয়ে যেত। একালের কটা ছেলে বাপ-মাকে সুখী করতে পারে বল। তাই তাদেরও সুখ নেই। সব আছে, নেই কেবল সুখ। তারা কাছে আসতে চায় না। পালাতে চায়।'

'নাঃ, তুই উত্তেজিত হয়ে পড়ছিস। চাল দে।'

'শোনো, শোনো। প্রসঙ্গ অপ্রিয় হলেও শুনতে হয়। হুডিনির যখন জগৎ জোড়া নাম। প্রচুর অর্থ। সঙ্গে সুন্দরী, সহকারী স্ত্রী, মাকে নিয়ে এলেন হামবুর্গে। নিজের কাছে। বৃদ্ধাকে তিনি ভোলেননি। অর্থ, যশ, খ্যাতির নেশায় তিনি অন্ধ হয়ে যাননি। মাকে কাছে এনে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা তাঁর কোলে মাথা রেখে শুয়ে থাকতেন। আর মা কী করতেন? ছেলের মাথায় হাত বুলিয়ে দিতেন। বিখ্যাত যাদুকর কান পেতে শুনতেন, অসংখ্য, গুণমুগ্ধ দর্শকের হাততালি নয়। মায়ের হৃদস্পন্দন। যে হৃদয় থেকে তৈরি হয়েছে তাঁর নিজের হৃদয়।'

'শিব তোকে দেখে আমার ভীষণ ভয় করছে।'

'শোনো দাদা, আমিও হুডিনির মত আজ রাতে একজনের কাছ থেকে একটা কথা শুনতে চাই।'

'কী কথা? কার কাছ থেকে শুনতে চাস?'

'ধৈর্য ধরে শোন তাহলে। ছটফট কোরো না। এক একটা জীবন মানুষকে ভীষণ প্রভাবিত করে। আমার জীবনে হুডিনি সেইরকম একজন মানুষ। তুমি জানো, আমি মাকে ভীষণ ভালবাসতুম। মা ছাড়া আমার জীবন অন্ধকার হয়ে যেত। আর একজনকে আমি ভীষণ ভালবাসতুম। সে হল আমার স্ত্রী সুধা। সুধার মধ্যে আমার মা বেঁচে উঠেছিলেন।'

‘একটু শীত শীত করছে রে। রাত বোধহয় শেষ হয়ে এল।’

‘একটা চাদর নেবে ?’

‘নাঃ, চাদর চাই না। তুই বল।’

‘মায়ের মৃত্যুর পর, হুডিনি পাগলের মত হয়ে গেল। আচ্ছা মাতৃভক্তি।’

শিবপদ জোরে নিঃশ্বাস টানলে। স্তব্ধ হয়ে রইলো বেশ কিছুক্ষণ। কোঁচার খুঁটে একবার চোখ মুছল।

‘মায়ের কথা মনে পড়ছে ? না রে ?’

‘কেমন মানুষ ছিলেন বল তো ! অমন স্নেহ, অত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা খুব কম দেখা যায় ! বাবা খুব ভাগ্যবান ছিলেন।’

‘তুইও ভাগ্যবান। সুধা ? সুধা কম কষ্ট করেছে। আজ বেঁচে থাকলে কত সুখী হত। নতুন বাড়িটাও দেখে যেত পারল না।’

‘ওই ভিত প্রতিষ্ঠাটা দেখে গিয়েছিল।’

‘অমিতাভর চাকরি ?’

‘না, সে আর দেখা হল কই।’

‘মানুষ কত কী দেখে যেতে চায় ! দেখা আর হয় না। শিব, মাকে তোর মনে পড়ে ?’

‘কী বলছিস ? মাকে মনে পড়বে না ! চোখ বুজোলেই চেহারাটা জ্বল জ্বল করে ভেসে ওঠে চোখের সামনে !’

‘মা কী করতেন জানিস, বাবাকে লুকিয়ে কুমুর জন্যে নানারকম জিনিস রেঁধে রেঁধে নিয়ে যেতেন। কুমু তখন মা হবে। আমি ভয়ে ভয়ে বলতুম, মা তুমি এস না। বাবা জানতে পারলে কুরুক্ষেত্র হয়ে যাবে। মা হাসতেন। কী ভাবে কুমুর বাচ্চাটা নষ্ট হয়ে গেল। আমার খুব মেয়ের শখ ছিল। কত প্ল্যান ছিল মাথায়। একটা মা আর মেয়ে সিরিজ করব। শিশু সিরিজ। যাই বল, তোর ভগবান বড় নিষ্ঠুর। তাঁর দয়া আর করুণার ওপর মানুষকে বড় বেশি নির্ভর করতে হয়।’

কৃষ্ণপদ কথা শেষ করে দাবায় একটা চাল দিল। শিবপদ অন্যমনস্ক একবার তাকাল। পিচবোর্ডের বাক্সে তিনটে বেড়ালছানা আর মা খড়খড় করে উঠল। সেই দুপুর থেকে মাটা সমানে বাচ্চা তিনটেকে দুধ খাইয়ে চলেছে। এর নাম সংসার। এর নাম মায়া।

‘শোনো, মায়ের মৃত্যুর সময় হুডিনি ছিলেন ইওরোপে। এত ভালবাসার মাকে শেষ দেখা আর দেখতে হল না। মায়ের কাছে তাঁর ছোট্ট একটা কথা জানার ছিল।’

‘কী কথা !’

‘হুডিনির এক ভাইয়ের নাম ছিল ন্যাট। তার বউ স্যাডি কী কারণে ন্যাটকে ছেড়ে বিয়ে করে বসল আর এক ভাই লিওপোলডকে। বিশ্রী ব্যাপার। কেলেঙ্কারির এক শেষ। অমার্জনীয় অপরাধ। একমাত্র মা যদি বলে যেতেন, লিওপোলডকে ক্ষমা করো, তাহলে ক্ষমা করা যেত। মা বলি বলি করেও শেষ কথাটি আর বলে গেলেন না। ম্যাজিসিয়ান হুডিনি হয়ে গেলেন স্পিরিচ্যুয়েলিস্ট হুডিনি। মা মারা গিয়েছিলেন রাত বারোটা পনের মিনিটে। রোজ রাত বারোটা পনেরয় হুডিনি মায়ের কবরের সামনে সাষ্টাঙ্গে শুয়ে পড়তেন। দু' হাতে স্পর্শ করে থাকতেন বেদী। আর আকুল হয়ে বলতেন, ‘বলো মা, বলো, তোমার না বলা শেষ কথাটি আমাকে বলো।’ হুডিনি স্পিরিটে বিশ্বাসী ছিলেন।

‘মানে ভূতে !’

‘না, ভূত বললে স্পিরিট শব্দটাকে অপমান করা হয়। স্পিরিট মানে আত্মা। ওই সময় হুডিনির মনে হত শেষ কথাটি মায়ের আত্মা যদি না বলেন, তাহলে তিনি পাগল হয়ে যাবেন। ওই সময় বেসের মত স্ত্রী পাশে না থাকলে হুডিনি সত্যিই পাগল হয়ে যেতেন।’

'আচ্ছা, শিব, তুই তখন থেকে হুডিনির কথা বলছিস কেন ?'

'তাই তো, কেন বলছি বলো তো ! ও মনে পড়েছে, সেই তুমি বললে না, সাত্যকি কেমন মুক্তি পেয়ে গেল। এক দেহ ছেড়ে আর এক দেহ পেতে আত্মার বেশ সময় লাগে। আর মুক্তি, মানে লীন হয়ে যাওয়া, সে কী সহজে হয় দাদা ! আমার কী মনে হয় জানো, সুধা এই বাড়িতে এখনও আছে।'

'কী করে বুঝলি ?'

'আমার মনে হয়।'

'সে তাহলে তোর মনে আছে। তোর ভালবাসায় মনের কোণে ঠাঁই করে নিয়েছেন। বাইরে কোথাও নেই।'

'তাহলে শুনবে ? বিশ্বাস করবে কী না জানি না, সন্ধেবেলা স্পষ্ট দেখলুম, লালপাড় শাড়ি পরে কে যেন একতলা থেকে দোতলায় উঠে গেল। নেশা নয়, স্বপ্ন নয়, স্পষ্ট চোখে দেখা। ঠিক সুধার মত দেখতে।'

'কেন আমাকে ভয় দেখাচ্ছিস ! তোর ওই বেলগাছটা দেখলে আমার গা ছমছম করে।'

'ভয়ের কী আছে। এ তো আনন্দের।'

'তুই তোর ওই হুডিনির কথা বল। মা কী উত্তর দিয়েছিলেন ?'

'মা সরাসরি কোনও উত্তর দেননি। হুডিনি শেষে একের পর এক মিডিয়ামের কাছে যেতে শুরু করলেন। তাঁর সঙ্গে কোনান ডয়েলেরও দেখা হয়েছিল। ডয়েলও প্রেতাত্মায় বিশ্বাস করতেন। ডয়েল হুডিনিকে বলেছিলেন, আপনি তো ম্যাজিসিয়ান নন, স্পিরিচ্যুয়ালিস্ট। আপনার খেলায় ম্যাজিকের চেয়ে দৈব শক্তিই বেশি। তুমি কী জান হুডিনিকে কায়দা করে মেরে ফেলা হয়েছিল।'

'সে কী ?'

'তলপেটে ঘুসি মেরে অ্যাপেনডিক্স ফাটিয়ে দিয়েছিল।'

'সে কী ! মারামারি হচ্ছিল বুঝি ?'

'না, না, মারামারি নয়। খুব কায়দার ব্যাপার। ঘটনাটা ঘটেছিল আমেরিকার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রেততত্ত্বের ওপর বক্তৃতা শেষ করে ড্রেসিংরুমে বসে চিঠিপত্র দেখছেন। একজন শিল্পী স্যামুয়েল স্মাইলি কিছু দূরে বসে স্কেচ করছেন তাঁকে। এমন সময় গর্ডন হোয়াইটহেড নামে এক ছাত্র এসে তাঁকে প্রশ্ন করল, বাইবেলে যে সব অলৌকিক ঘটনার কথা বলা আছে, সে সম্পর্কে তাঁর কী ধারণা। হুডিনি অন্যমনস্ক একটা উত্তর দিলেন। হোয়াইটহেড শয়তানটা তখন প্রশ্ন করলে, শুনেছি, আপনার পেটে যত জোরেই ঘুসি মারা হোক না কেন, আপনার কিছুই হবে না। হুডিনি বললেন, ঠিকই শুনেছ, তবে আচমকা নয়, আমায় প্রস্তুত হবার সুযোগ দিতে হবে। হোয়াইটহেড বললে, আসুন তাহলে, গোটাকতক মেরে দেখি। হুডিনি চেয়ার ছেড়ে সবে উঠে দাঁড়িয়েছেন, হোয়াইটহেড আচমকা ঘুসি মারতে শুরু করল। একের পর এক। যন্ত্রণায় যাদুকরের মুখ বেঁকে গেল। অন্য যারা ছিল, তারা হোয়াইডহেডকে ধরে ফেলল। সে তখন উন্মাদের মত হয়ে গেছে।'

'তারপর ?' কৃষ্ণর মুখচোখে উত্তেজনা। ভীষণ রেগে গিয়ে বললে, 'ইডিয়েট।'

'তারপর ! পেটে অসহ্য যন্ত্রণা। যোগী হুডিনি সেই অবস্থায় সন্ধের শোতে তাঁর সব খেলাই দেখালেন। রাতটা অসহ্য যন্ত্রণায় জেগে কাটালেন।'

'ডাক্তার ?'

'শোনই না। কী অসাধারণ ক্ষমতা ছিল তাঁর। পরের দিন শনিবার। ওই অবস্থায়, দুপুর আর সন্ধের শোতে পুরো খেলা দেখালেন। রাতে দলবল নিয়ে ট্রেনে চেপে বসলেন। যাবেন ডেট্রয়েট। ট্রেন চলতে শুরু করল। স্ত্রী বেসকে বললেন, আমি আর পারছি না। অসহ্য

যন্ত্রণা। এতক্ষণ স্ত্রীকেও বলেন নি, কী হয়েছে। ট্রেনেই প্রথম বললেন। ডেট্রয়েটে ডাক্তার দেখে বললেন, অ্যাকিউট অ্যাপেণ্ডিসাইটিস। এখুনি হসপিটেলে যেতে হবে। হুডিনি বললেন, অসম্ভব। এখুনি হাসপাতালে আমি যেতে পারব না। শো-র সব টিকিট বিক্রি হয়ে গেছে। দর্শকদের আমি হতাশ করতে পারব না। জীবনের শেষ দুটি খেলা ওই অবস্থায় দেখালেন। ভাবতে পারো তুমি! ফাটা অ্যাপেণ্ডিক্স নিয়ে, চাইনিজ ওয়াটার-টর্চার সেলের খেলা দেখাচ্ছেন হুডিনি। জানো, সে খেলাটা কী!'

'না। আমাদের যৌবনে হুডিনির নাম মুখে মুখে ঘুরত। বিশ্বের সেরা যাদুকর।'

'তা হলে শোন।'



॥ নয় ॥

একটা পাখি দু'বার কিচ কিচ করেই থেমে গেল।

কৃষ্ণপদ ঢুলুঢুলু চোখে বললে,' ভোর হয়ে এল। আমাদের জীবনের একটা বিফল দিন চলে গেল মহাকালের হাতে। কেমন কায়দা করে নিয়ে যায় দেখেছিস! যখন আমরা ঘুমে অচেতন। আজ আমরা জেগে আছি বলে বোঝা গেল। সাত্যকির কী মজা! ওর রেস্ত খালি। তস্কর মহাকাল কিছুই নিতে পারল না।'

শিব দাদার কথায় কান না দিয়ে বললে, 'আমি জানতে চাই। একটা কথা।'

'কী কথা? কার কাছে জানতে চাস। তুই হঠাৎ কেমন যেন হয়ে গেছিস! অন্যরকম। হ্যাঁরে কিছু ভর করেনি তো!'

'হুডিনির মত আমি সুধার কাছ থেকে একটা কথাই জানতে চাই, ফরগিভ, অর ডোণ্ট ফরগিভ।'

'কাকে?'

'অমিতাভকে। আমার একমাত্র পুত্রকে। যার জন্যে আমার জীবনের সব আয়োজন আজ এক উপহাস।'

'তোমার ওই গ্রেট ম্যাজিসিয়ান তো সে উত্তর পাননি তাঁর মায়ের কাছ থেকে। শেষ পর্যন্ত তিনি তো প্রেত-তত্ত্বের ঘোরতর বিরোধী হয়ে পড়েছিলেন।'

'তাই বা বলি কী করে। তাঁর জীবনের শেষটা শোন। ডেট্রয়েটের হাসপাতালে জীবন-মৃত্যুর লড়াই চলেছে। অহোরাত্র পাশে বসে আছেন, প্রিয়তমা জীবনসঙ্গিনী বেস। দীর্ঘকাল আগে বেসের সঙ্গে তাঁর এক চুক্তি হয়েছিল। তোমাকে আগেই বলেছি, বেস ছিলেন নিউইয়র্কের ফ্লোরাল সিস্টারস দলের গায়িকা-নর্তকী। তাঁর একটি গান হুডিনির ভীষণ প্রিয় ছিল,

Rosabelle, Sweet Rosabelle,
I love you more than I can tell;
Over me you cast a spell,
I love you my Rosabelle.'

'গানটা তুই মুখস্থ করে রেখেছিস শিব?'

'জানলে দাদা, বয়েস হলেও স্মৃতি আমার এখনও খুব প্রখর। আমি পুরো হ্যামলেট তোমাকে শুনিয়ে দিতে পারি।'

'আমার স্মৃতি ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে আসছে, কেন বলো তো!'

'ও তোমার মনে হচ্ছে। স্মরণ করার চেষ্টা করলেই স্মরণে এসে যাবে।'

'তা চুক্তিটা কী হয়েছিল?'

'হুডিনি বলেছিলেন, যেই আগে যাক, সেই পরপার থেকে বার্তা পাঠাবে সাংকেতিক ভাষায়। সংকেতটা কী, দশটি মাত্র শব্দ। প্রথম Rosabelle, তারপরের নটি শব্দ হল Answer tell pray Answer Look Tell Answer Answer Tell.'

'মানেটা তাহলে কী হল?'

'Rosabelle Believe'

'কী বিশ্বাস করতে হবে?'

'দেহ গেছে ; কিন্তু আমি আছি। রবিবার সকালে মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা আগে হুডিনি স্ত্রীর হাত ধরে বললেন, মনে আছে তোমার সেই কোড। আর একবার ঝালিয়ে নাও। আমার যাবার সময় হল। বেস ধীরে ধীরে বলে গেলেন। সন্তুষ্ট হুডিনি দু মুঠোয় স্ত্রীর হাতটি বুকের ওপর ধরে রেখে চিরবিদায় নিলেন। সুধাও ঠিক ওইভাবেই শেষরাতে চলে গেল। তখন শিশিরের কাল, ঝরা শিউলির কাল। আমি সুধাকে বলেছিলুম, দুটি শব্দ শুধু মনে রাখো, শিউলি শিশির। বড় একা হয়ে গেলুম, কেউ আর রইল না আমার। ওপার থেকে মাঝে মাঝে এই দুটি শব্দে আমার সঙ্গে যোগাযোগ কোরো।'

'তুই একটা চিরকালের পাগল।'

'আশীর্বাদ করো, যেন প্রকৃত পাগল হতে পারি। সুস্থ মানুষের জগৎ বড় অসুস্থ।'

'হুডিনি কী স্ত্রীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন?'

'রাত একটা ছাব্বিশ মিনিটে মারা গিয়েছিলেন। প্রতি রবিবার রাত একটা ছাব্বিশ মিনিটে বেস নির্জন ঘরে অন্ধকারে ধ্যানে বসতেন। স্বামীর পাঠান সঙ্কেত ধরার চেষ্টা করতেন। মাঝে মাঝে প্রেতচক্রে গিয়ে বসতেন। মিডিয়ামরা কখনও স্বামীর গলায় কথা বলতেন। অন্য খবরাখবর দিতেন। কিন্তু কোথায় সেই সঙ্কেত!'

'তবেই দ্যাখো!'

'আহা উতলা হচ্ছ কেন? সবটা শোন। পনের মাস পরে এক প্রেতচক্রে ভেসে এল হুডিনির মায়ের কণ্ঠস্বর। সেই আদেশ, যে আদেশ শোনার জন্যে হুডিনি রাতের পর রাত মায়ের কবরের পাশে শুয়ে থাকতেন। বললেন, ফরগিভ। লিওকে ক্ষমা করে দাও। চক্রে বেস উপস্থিত ছিলেন না। তাঁকে খবর পাঠান হল। পরলোকের সঙ্গে হুডিনি পরিবারের যোগাযোগের পথ এতদিনে খুলে গেল। উঠে পড়ে চেষ্টা চলল হুডিনির আত্মার সঙ্গে যোগাযোগের। ন' মাস আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। ন' মাস পরে নভেম্বরের এক রাতে এল সঙ্কেতের প্রথম শব্দ, রোসাবেল। পুরো সঙ্কেত আসতে মোট আটটা অধিবেশনের প্রয়োজন হল। প্রথমে এলোমেলো। পরে ঠিক ঠিক হুডিনি যেমন বলে গিয়েছিলেন, রোসাবেল, অ্যানসার, টেল, প্রে, অ্যানসার, লুক, টেল, অ্যানসার, অ্যানসার, টেল। তার মানে,রোসাবেল বিলিভ। আমি আছি। বিকেলের সংবাদপত্রে বড় বড় হরফে ছাপা হল, হুডিনি হ্যাড কাম ব্যাক। হি স্টিল লিভড। আফটার লাইফ অ্যাণ্ড স্পিরিট কমিউনিকেসান হ্যাভ বিন প্রুভড বিয়ণ্ড ডাউট।'

কৃষ্ণপদ এতক্ষণ আয়নায় ভাসমান নিজেদের প্রতিচ্ছায়ার দিকে তাকিয়েছিল। সশীবের আর অশরীরে এই যে দুপ্রান্তে অবস্থান সত্য হলেও হতে পারে। জ্ঞানের অভাব, তাই এত সন্দেহ। ঘড়ি পর পর তিনবার শব্দ করল। চারটে বাজল।

শিবপদ চমকে উঠল, 'সুধা ঠিক এই সময়ে চলে গিয়েছিল। নিঃশব্দে। শিশিরের ফোঁটার মত ঝরে গিয়েছিল। দাদা, সাত্যকির ঘরে গিয়ে একবার বসবে না কী! দেখাই যাক না কী হয়!'

'আমার তেমন সাহস নেই রে! মৃত্যুকে আমি ভয় পাই। মৃত আত্মারা প্রায়ই আমাকে ভয় দেখায়। বিশ্রী বিশ্রী স্বপ্ন দেখি।'

'তোমাকে আমি বলিনি, বিশ্বাসও হয়তো করবে না। বছরের পর বছর, আমার শোবার ঘরের টেবিলে একটা খোলা প্যাড, আর খোলা কলম রেখে শুতুম। আর মনে মনে ডাকতুম সুধা তুমি এস। হঠাৎ একদিন সকালে উঠে দেখি লেখা রয়েছে, শিউলি শিশির। সুধার হাতের লেখার সঙ্গে মিলিয়ে দেখলুম। এক। কোনও তফাৎ নেই।'

'দেখাতে পারিস'?'

'নিশ্চয় পারি। এর মধ্যে কোনও জোচ্চুরি নেই। কেন থাকবে? এ তো আমার একান্তই নিজস্ব ব্যাপার।' শিবপদ উঠে পড়ল। অনেকক্ষণ একভাবে বসার ফলে পা অসাড় হয়ে গেছে। পা ছাড়াতে গিয়ে দাবার ঘুঁটি উলটে গেল। কৃষ্ণ বললে, 'যাঃ সব চাল নষ্ট করে দিলি।'

'কী খেলাই হচ্ছিল! তার আবার চাল নষ্ট। এবার গুটিয়ে ফেল। ভোর হয়ে গেছে।'

'বলিস কী! রাত কাবার! আমি তাহলে এবার যাই। পাগলীটাকে একা রেখে এসেছি। কিন্তু শিব, শিব, আমার যে আদা দিয়ে এক কাপ গরম চা খেতে ইচ্ছে করছে।'

'আদা দিয়ে! আদা কী আছে রে দাদা!'

'তাও তো বটে! তোরও তো সব এলোমেলো হয়ে গেছে। মেয়েরা না থাকলে সংসারটা কেমন যেন হয়ে যায়! আমাদের যখন সবই গেছে, আয় একটা আশ্রম করি!'

'দ্যাখো দাদা, মনে বৈরাগ্য না এলে আশ্রম হবে বিড়ম্বনা। তার চেয়ে বরং দ্রুত হেঁটে চলে যাওয়াই ভালো।'

'ডিফিটিস্ট। ডিফিটিস্ট মেন্টালিটি। পালাবো কেন রে! সহ্য করব। এক সময় নবাব ছিলুম মরব ফকির হয়ে। কুছ্ পরোয়া নেহি। কিন্তু শিব, কে আমাকে পোড়াবে! আমার তো ছেলে নেই!'

শিবপদর পা ছেড়ে গেছে। ঘরের এ মাথা থেকে ও মাথায় পায়চারি করতে করতে বললে, 'অত ভাবার কী আছে! মরার পর আমাদের আর কী ল্যাঠা! তখন পাড়া-প্রতিবেশী বুঝবে! ওই তো সাত্যকি। কী আরামে শুয়ে আছে!'

'সাত্যকির জীবনটা ভাল করে জানা হল না। এত বছর পরে এল। জানিস, ও মনে হয় একজনকে খুন করেছিল! ঠিক খুন নয়। মৃত্যুর কারণ হয়েছিল।'

'সে আবার কী! খুন করলে পুলিস ছেড়ে দিত!'

'তা ঠিক। তবে ও সব সময় কেমন যেন একটা আতঙ্কে থাকত। ব্যাপারটা যে কী, স্পষ্ট করে কোনও দিনই আমাকে বলেনি, আমারও সাহস হয়নি জিজ্ঞেস করার, কিন্তু ওর একটা ভীষণ ভয় ছিল। অশনাক্ত কোনও মৃতের ছবি কাগজে দেখলেই, ভয়ে ওর মুখ সাদা হয়ে যেত। হাত-পা কাঁপত। সে যে কী ভীষণ আতঙ্ক তোকে বলে বোঝাতে পারব না।'

'যাক, মরে সেই আতঙ্ক থেকে তাহলে মুক্তি পেয়েছে। আমরা কেউই গোয়েন্দা নই, অতএব আমাদের কোনও দায়িত্বও নেই। এ কথা তুমি আর কারোকে বোলো না।'

'আমি মিশি কার সঙ্গে যে বলব! বন্ধু বলতে তো একমাত্র তুই-ই আছিস।'

'চা কী তাহলে চাপাব?'

'চাপা। ভোরের চা-টা খেয়েই যাই। এইবার যেন একটু ঘুম ঘুম পাচ্ছে!'

শিব চা চাপিয়ে, একটুকরো আদার জন্যে চারপাশ হাঁটকাচ্ছে। আনাজের ঝুড়িতে জিনিসের অভাব নেই। বিট, গাজর, লঙ্কা, ফুলকপি, সবই আছে, গোটা দুই পাতিলেবু। আদারই অভাব।

রান্নাঘর থেকে হেঁকে উঠল, 'দাদা, লেবু চা খাবে ?'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, সেও মন্দ হবে না। এক কাপ জল বেশি নিবি!'

'তুমি দু' কাপ খাবে ?'

'না রে! কুমুর জন্যে একটু নিয়ে যাব।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিচ্ছি। যেতে যেতে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে না!'

'জোরে পা চালাব।'

'দাঁড়াও, সে ব্যবস্থাও হবে। আমার একটা ফ্লাস্ক আছে।'

'তোকে কষ্ট দিতে ইচ্ছে করে না। কী করব বল, একা কিছু খেতে গেলেই কুমুর মুখ চোখের সামনে ভেসে ওঠে। জীবনের কত সুখের দিন, কত দুঃখের দিন এক সঙ্গে পার করেছি! জীবন এক তীর্থযাত্রা রে শিব! ওই গানটা আমার ভীষণ ভাল লাগেরে, আরও কতদূরে, আছে সে আনন্দধাম। আরও কতদূরে।' কৃষ্ণ একসময় সংগীতের চর্চাও করত। গলা এখনও বেশ আছে। আপনমনে গাইতে লাগল,

আমি শ্রান্ত, আমি অন্ধ, আমি পথ নাহি জানি ॥
রবি যায় অস্তাচলে আঁধারে ঢাকে ধরণী
করো কৃপা অনাথে হে বিশ্বজননী ॥
অতৃপ্ত বাসনা লাগি ফিরিয়াছি পথে পথে
বৃথা খেলা, বৃথা মেলা, বৃথা বেলা গেল বহে।
আজি সন্ধ্যাসমীরণে লহো শান্তিনিকেতনে,
স্নেহকরপরশনে চিরশান্তি দাহো আনি ॥

কৃষ্ণর দু'চোখের কোল বেয়ে জলের রেখা নেমে আসছে। 'চিরশান্তি দাহো আনি' বলার সময় গলা ধরে আসছে। এ বয়েসে শান্তি ছাড়া আর কী চাইবার আছে সেই পরমপদে। অনেক, অনেক দেখা হয়েছে জীবনে। রং, রূপ, ঐশ্বর্য। ভোগও হয়েছে খুব। আর না। বাড়ি গিয়ে কুমুকে তুলতে হবে ওষুধের নিদ্রা থেকে। দাঁত মাজাতে হবে। শিবের দেওয়া চা খাওয়াতে হবে। আর কপাল থেকে সযত্নে চুল সরিয়ে দিয়ে, এঁকে দিতে হবে গোল একটা সিঁদুরের টিপ। তখন কুমুকে দেখাবে ঠিক দেবীর মত। কুমুর চোখ দুটো ছিল অসাধারণ। যৌবনে ওই চোখে যার দিকে তাকিয়েছে সেই পাগল হয়ে গেছে। এখনও তাকায়; কিন্তু আগুন নেই। সাত্যকি মারা গেল। বেঁচে থাকলে, সত্যিই কি তাকে মনেপ্রাণে ক্ষমা করা যেত! সে অনেক কথা। এখন আর ভাবতে ভাল লাগে না। নিজের আগুনও নিবে গেছে। ইন্দ্রিয় হাই তুলছে। তাদেরও ঘুম এসে গেছে।

জেগে থাকার চেষ্টা করেও শেষরাতের দিকে দেবী ঘুমিয়ে পড়েছিল। ঘরের বাইরের একটা পুরুষকে রেখে ঘুমে অচেতন হয়ে যাওয়ার অনেক ঝুঁকি। যে পৃথিবীতে নারী-পুরুষের সম্পর্ক খাদ্য-খাদকের, সেই পৃথিবীতে নিশ্চিন্ত আরামে ঘুমোবার সাহস দেবীর নেই। ভালো মিষ্টির দোকানের শো-কেসের দিকে মানুষ যেভাবে তাকায় দেবীর দিকেও অনেকে সেই একইভাবে চেয়ে থাকে। এত চেষ্টা করেও শরীরে ভাঙন ধরছে না কিছুতেই। বড় সমস্যা। যৌবন যে লকারে রাখা যায় না!

দেবী কোনও স্বপ্ন দেখছিল। চমকে ঘুম ভেঙে গেল। ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। কিছুই যেন মনে পড়ছে না। পাশে তোতা শুয়ে আছে। ঘন চুলের ওপর ফুলের মত ফুটে আছে তার ঘুমন্ত মুখ। ভোরের সোনালী আলো আয়নায় প্রতিফলিত হয়ে মশারির যে জায়গায় এসে পড়েছে, সেই অংশটুকুতে যেন সোনার স্বপ্ন আটকে আছে।

একটু একটু করে দেবীর সব মনে পড়ছে। কাল রাতের ঘটনা। তাড়াতাড়ি মেঝের দিকে

তাকাল। শশধরকে যেখানে বিছানা করে শুইয়েছিল। এলোমেলো বিছানা। গোটানো পাকানো চাদর পড়ে আছে। মানুষটা নেই। দেবী সাবধানে তোতার পাশ দিয়ে মশারি তুলে নেমে এল। শশধরের কোনও চিহ্ন নেই। সদর দরজা সামান্য ফাঁক হয়ে আছে। বাতাসে দুলছে। শশধর বাইরে থেকে তালা দিয়ে, চাবিটা দরজার তলা দিয়ে গলিয়ে দিয়ে গেছে। মেঝেতে এলোমেলো কাদা পায়ের আর জুতোর ছাপ। নোংরামি দেবী একেবারে সহ্য করতে পারে না। গা জ্বলে যায়। বিছানাটা তার ছুঁতে ইচ্ছে করছে না। যেন মৃতের বিছানা। সারা ঘরে চাপা একটা অপবিত্র গন্ধ। দেবী সবার আগে একটা ধূপ জ্বালিয়ে দিল। তারপর মুহূর্তে ভেবে নিল, কী কী করতে হবে। সবচেয়ে বড় সমস্যা দরজা খোলান। বাইরের লোকের সাহায্য ছাড়া হবে না। রাতে আহত, অসহায় মানুষটার জন্যে তার করুণা হয়েছিল। মমতাব স্থানে একটা ব্যথা অনুভব করেছিল। এখন ঘৃণার জোয়ার বইছে।

দেবী দুর্গাকে ঘুম থেকে তুলে দিল।

'তুই আগে মেঝের বিছানাটা তোল। তুলে, পেছনের বাবান্দায়, যেখানে ভাঙা চেয়ারটা আছে সেইখানে রেখে আয়, খাড়া করে।'

'ওইখানে রাখবো দিদি ? নষ্ট হযে যাবে না ! জলের ছাট আসে।'

'আসুক। তুই রেখে আয়। বিছানা, চাদর, বালিশ সব আমি ফেলে দোবো।'

দুর্গা চাদরটা টেনে তুলতেই, মেঝেতে একটা ব্যাগ ছিটকে পড়ল। বহুদিন অমিতচারী একটি মানুষের পকেটে ঘুরে ঘুরে চরিত্রহীনের মত চেহারা হয়েছে ব্যাগটাব।

দেবী বলল, 'ওটা আবার কী ?'

উত্তর এল মশারীর ভেতর থেকে, 'ব্যাগ মা।'

তোতা কখন উঠে পড়েছে। উপুড় হয়ে শুযে আছে, বালিশে চিবুক রেখে। খবগোসেব মতো জ্বলজ্বলে দুটো চোখ। তোতার চোখের সব চেযে বড় সৌন্দর্য, দীর্ঘ আঁখিপল্লব। ছায়াব মত ঘিরে থাকে চোখ দুটিকে। তোতা খুব আরামে শুয়ে আছে। জ্বর নেই। বিছানা ছেড়ে ওঠার ইচ্ছেও নেই। আজ আর দাদাইযেব বাগানে মা ফুল তোলাব জন্যে যেতে দেবে না।

দেবী বললে, 'ও মা, তুই উঠে পড়েছিস !'

'শশধরকাকু কোথায় মা ?'

'কি জানি কখন উঠে চলে গেছে। দুর্গা ব্যাগটা খুলে দেখ।'

দুর্গা ব্যাগটা খুলে উপুড় করল, পনেরটা পয়সা মেঝেতে পড়ল। সাদা একটা ট্যাবলেট গড়াতে গড়াতে চলে গেল খাটের তলায়।

দেবী বললে, 'ব্যাগটাকে দূর করে ফেলে দে। পাপ।'

রাস্তার দিকের জানলা খুলল। ঘষা কাঁচের মত বিশ্রী আকাশ। প্রকৃতি থমকে আছে।

তোতা বললে, 'মা, আজ আর তুমি বেরিও না।'

'আমার যে আর ছুটি পাওনা নেই মা !'

তোতা আবদারের গলায় বললে, 'একটা দিন মা।'

'দাঁড়া বাবা, আগে কাউকে ধরে দরজার তালাটা খোলাই।'

বেশিক্ষণ দাঁড়াতে হল না। পাশের বাড়ির ঝুমু ছাতা মাথায় দিয়ে দুধ আনতে যাচ্ছিল। দেবী চাবিটা তার হাতে দিয়ে বললে, 'তালাটা খুলে দে তো মা।

মেয়েটি অনেকক্ষণ চেষ্টা করে হতাশ হয়ে বললে, 'মাসীমা, চাবি যে লাগছে না।'

'সে কি রে ? লাগছে না কী রে ? কই চাবিটা দে তো আমার হাতে।'

চাবিটা হাতে নিয়েই দেবী বুঝতে পারল ব্যাপারটা কী হয়েছে ! শশধর যে চাবিটা ঢুকিয়ে দিয়ে গেছে একই রকম দেখতে, কিন্তু অন্য তালার চাবি। একই কোম্পানির তালা। চাবি দেখে বোঝার উপায় নেই। শেষরাতের অন্ধকারে, নেশার ঘোরে কি করতে কি করে গেছে !

‘ঝুমু তুই যা। চাবি গোলমাল হয়ে গেছে।’

‘কি করে এমন হল মাসীমা ? আপনারা সবাই ভেতরে, বাইরে তালাচাবি !’

দেবী সহসা কোনও উত্তর দিতে পারল না। সামান্য ভেবে বললে, ‘কেউ বদমাইশি করে লাগিয়ে দিয়ে গেছে।’

ঝুমু দেবীর মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে চলে গেল। দূর থেকে বললে, ‘কি করে বেবোবেন ?’

দেবীব মুখে চিন্তার ছায়া নামল। সত্যিই তাই, কী করে বেরবে ! একটু পরেই দুর্গাকে দুধ আনতে যেতে হবে। তালার ডুপ্লিকেট চাবিটা অনেকদিন হারিয়ে গেছে। দেবীর এখন রাগ হচ্ছে ! ভীষণ রাগ। শশধর ইচ্ছে করেই এই কাণ্ড করেছে। করেছে তাকে বিপদে ফেলার জন্যে। যাতে লোক জানাজানি হয়। যাতে দেবীর বদনাম হয়ে যায়। শয়তান কখনও সাধু হয় না। হতে পারে না।

‘দুর্গা কি কবি বল তো !’

‘তোমাব সেই চাবির তাড়াটা বের করো না। একটা না একটা লেগে যাবে।’

‘এ তালা, সে তালা নয় বে !’

‘তাহলে চাবিঅলা ডাকতে হবে।’

‘তাকে কি আর সহজে পাওয়া যাবে !’

‘সেই চাবিটা তাহলে খোঁজ না আর একবার।’

‘একবার তো সারা বাড়ি হাঁটকেছি। পাইনি। তবু দেখি আর একবার।’

তোতা খুকখুক করে হেসে বললে, ‘কি মজা, তোমার আজ আর বেরনো হবে না।’

কৃষ্ণর হাতে ছোট্ট একটা ফ্লাস্ক। কুমুর ঘরের জানালা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল। ঘরের মেঝেতে তারই আঁকা একটা ক্যানভাস যেন উলটে পড়ে আছে। বহুকাল আগে এই ভঙ্গিতে শুয়ে থাকা কুমুর একটা ছবি সে এঁকেছিল। সে ছবি এখন বিদেশে। ছবির কুমুর বয়েস বাড়েনি। এই কুমুর বয়েস বেড়ে গেছে। শরীরের সুন্দর খাঁজ আর ভাঁজ হারিয়ে গেছে।

দরজার তালা খুলে কৃষ্ণ কুমুর মাথার কাছে গিয়ে হাঁটু মুড়ে বসল। বড় নিশ্চিন্ত আরামে বেহুঁশ। মুখে ভোরের আলো এসে পড়েছে। ফাটা সূর্য মেঘ ঠেলে উঠেছে আকাশে। কৃষ্ণ তার ঠাণ্ডা হাতেব তালুটা কুমুর কপালে রাখল। রোজই সে ভাবে, হয়তো আজ একটা অঘটন ঘটে যাবে। কুমু জেগে উঠবে সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে। পৃথিবীতে কত কিছুই তো ঘটে ! এই সামান্য ব্যাপারটা ঘটতে পারে না !

কৃষ্ণ কানের কাছে মুখ এনে ডাকল, ‘কুমু, কুমু।’ খাড়া নাকে হীরের নাকছাবি যত উজ্জ্বল, ভবিষ্যৎ কি তত উজ্জ্বল !



॥ দশ ॥

সাজান দাবার ছক মেঝেতে পড়ে আছে। খেলোয়াড়রা উঠে চলে গেছে। কৃষ্ণ চা খেয়েছিল। খালি কাপ পড়ে আছে একপাশে। শিবপদ ভয়ে ভয়ে সাত্যকির ঘরে একবার উঁকি মারল। ছোট্ট পাখির মত এক চিলতে সোনালী রোদ পশ্চিমেব দেয়ালে ডানা মেলে আটকে

গেছে। সাত্যকির মৃত মুখ মার্বেল পাথরের মত সাদা দেখাচ্ছে। খাড়া নাকটাকে মনে হচ্ছে মোমের তৈরি। উত্তাপে গলে যেতে পারে।

ধীরে ধীরে দরজা ভেজিয়ে দিল শিবপদ। শব্দে সাত্যকি চমকে উঠতে পারে। সাজান দাবার ছকের দিকে তাকিয়ে, এই কয়েকদিন আগে পড়া হাক্সলির কয়েকটা লাইন মনে পড়ে গেল। 'পৃথিবী এক দাবার ছক। আর ঘুঁটি ! ঘুঁটি হলো বিশ্বের বিচিত্র ঘটনা। খেলার নিয়মটা কি ? প্রাকৃতিক নিয়ম। ও পাশে যে খেলোয়াড় বসে আছেন, তিনি অদৃশ্য। আমরা এইটুকু জানি, তাঁর খেলায় জোচ্চুরি নেই। বিচারে ভুল নেই। অসাধারণ তাঁর ধৈর্য। আবার নিজেদের জীবনের মূল্যে এও আমরা জানি, আমাদের সামান্যতম বেচাল তাঁর দৃষ্টি এড়াতে পারে না। আমাদের অজ্ঞতা তাঁর এতটুকু ক্ষমাও পায় না।'

শিবপদ একে একে কৌটোয় ঘুঁটি পুরে, ছক গুটিয়ে রাখল। জ্ঞানেশ কি তাহলে সত্যিই আসবে না, সামান্য পান দোষ আছে। বলা যায় না, হয়তো বেলা এগারোটায় বিছানা ছাড়বে। শিবপদর একসঙ্গে অনেক কিছু করার ইচ্ছে হচ্ছে। দেবী কাল অত ভিজে কেমন রইল। তোতার জ্বর ছাড়ল কি না ? কুমু কাল সারা রাত একা ছিল। কিছু হয়নি তো ? অমিতাভর কথাও একবার মনে পড়ল। তনুর মুখ উঁকি মেরে গেল, মনের জানালায়।

আর বসে থাকা যায় না। কিছু একটা করতে হয়। কাজ চাই, কাজ। শিব বাথরুমে ঢুকে কোনও ভাবনা আসার আগেই দেবীর শাড়িটা কেচে নিঙড়ে ফেলল। উঠে গেল দোতলায়। দোতলার বারান্দায় যেতে হলে অমিতাভর ঘরের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। সারা ঘরের মেঝেতে ফিনকি ঝিনকি কাঁচ ছড়িয়ে আছে। উত্তরের জানালার শার্শির একটা কাঁচ ঝড়ে ভেঙে গেছে। সারা রাত সেই ভাঙা অংশ দিয়ে জল পড়েছে চুঁইয়ে চুঁইয়ে। ভাঙা কাঁচের জলসা এড়িয়ে দরজা খুলে শিবপদ বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। সামনে মুক্ত আকাশ। মেঘ সরে গেছে। বৃষ্টিধোয়া রোদ। গাছের পাতা। নোলকের মত জল দুলছে ডালে ডালে। দেবীর শাড়িটা ঝোলাতে ঝোলাতে শিবের মনে হল, এখানে মৃত্যু নেই। চারপাশে শুধু তাজা জীবনের আয়োজন।

দেবীর জানালার বাইরে সারি সারি মুখ। অবোধ শিশু আছে, সন্দেহপ্রবণ বৃদ্ধ আছে, কুচুটে মহিলা আছে। সকলেরই এক প্রশ্ন, 'কে বদমাইশি করে তালা ঝুলিয়ে গেল !' এ পাড়ায় এমন মন্দ লোক কে আছে। কেউই তাকে দেখেনি। তবে অনুমানে, নানা নাম ঘুরে ঘুরে আসছে। প্রশ্নের পর প্রশ্নে দেবী ক্লান্ত হয়ে বসে পড়েছে। মনে মনে যাঁকে সে স্মরণ করছে, তিনি ঈশ্বর নন, শিবপদ। একবার যদি তিনি আসেন সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। মানুষটির প্রতি তার অসীম বিশ্বাস। রোজ রাতে শোবার আগে মনে মনে প্রণাম করে শোয়। শিবপদ তার কাছে মন্দিরের মত। কি ভাবে তাঁর রাত কাটল জানার জন্যে মন ছটফট করছে। অথচ বেরোবার উপায় নেই। মাঝে মাঝে দেবীর ভাবনা হচ্ছে, শশধর আবার টলতে টলতে এসে হাজির না হয়। তাহলে আজই তাকে এপাড়া ছাড়তে হবে। এ বাড়ি থেকে তাকে ওঠাবার জন্যে বাড়িঅলা নানা ফন্দিফিকির আঁটছে। মাঝে জল বন্ধ করে দিয়েছিল। এ পাড়ার নেতার দাবড়ানিতে আবার জল এসেছে। এইবার চরিত্রের বদনাম দিয়ে একেবারে তুলে না দেয়। তার হাতে হাত মেলাবার লোকের অভাব নেই। কারুর অনিষ্ট করার ব্যাপারে বাঙালীর উদারতার অভাব হয় না। এইভাবে জোড়া জোড়া চোখের সামনে প্রদর্শনীর প্রাণী হয়ে কতক্ষণ বসে থাকা যায় ? দেশ স্বাধীন হবার পর বেশীর ভাগ মানুষেরই কাজ কর্ম নেই। যুবকরা বেকার। বৃদ্ধরা অবসর ভোগী। বারোয়ারী পূজা, আর পেছনে লাগা, এ ছাড়া আর কি-ই বা করার আছে।

দুর্গা জানালাটা একবার বন্ধ করার চেষ্টা করেছিল। সহানুভূতিশীল প্রতিবেশীদের ধাক্কায় আবার খুলে দিতে হয়েছে। তালা খোলার ব্যবস্থার চেয়ে, তালা কে দিয়ে গেছে, জানার জন্যেই সকলে আগ্রহী। ভেতরে যাবার উপায় নেই। বারে বারে ডাক পড়ছে। বার বার এক প্রশ্ন,

একই উত্তর। বাঁকা মন্তব্য। চাপা হাসি।

বারান্দায় দাঁড়িয়ে বৃষ্টিধোয়া, উজ্জ্বল সবুজ প্রকৃতির দিকে তাকিয়ে শিবপদ বিভোর হয়ে গিয়েছিল। এই কয়েক দিন আগেই শ্রীমদ্ বিজয় কৃষ্ণ গোস্বামীর পুনঃ প্রকাশিত বই, 'ব্রাহ্ম সমাজের বর্তমান অবস্থা এবং আমার জীবনে ব্রাহ্ম সমাজের পরীক্ষিত বিষয় ও কয়েকটি উপদেশ' পড়ে শিবপদ পথের ইঙ্গিত পেয়েছে। শুধু উপাসনা নয়, জীবন্তভাবে উপাসনা করতে হবে। উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মসাধন। প্রথমে বাহ্য জগতের শোভা সৌন্দর্যের মধ্যে ঈশ্বরের শোভাসৌন্দর্য উপলব্ধি করতে হবে। সেই অভ্যাস, বাইরের সৌন্দর্যে ঈশ্বরের শোভার দর্শন না হলে, সবই শূন্য।

শিবপদ এতই তন্ময় জ্ঞানেশ তিনবার হর্ন দিয়েছে শুনতে পায়নি। জ্ঞানেশ গাড়ি থেকে নেমে চিৎকার করছে 'মাস্টার মশাই, মাস্টার মশাই।'

শিবপদর ঘোর কেটে গেল। 'যাই' বলে উত্তর দিলেও জ্ঞানেশের কানে পৌঁছল না। জ্ঞানেশ কড়া নাড়ছে জোরে জোরে। ঘরের ভেতর দিয়ে আসার সময় শিবপদর কাঁচের কথা মনে রইল না। ছোট্ট একটা টুকরো পায়ে ঢুকেছে, সে খেয়ালও নেই।

দরজা খুলতেই জ্ঞানেশ বললে, 'খুব দেরি করে ফেলিনি তো মাস্টারমশাই ?'

শিবপদর সামনে তাজা একটি তরুণ। সদ্য ঘুমভাঙা ফোলা ফোলা মুখ। সবে দাড়ি কামিয়েছে। গাল দুটো গোলাপী হয়ে আছে। গেরুয়া পাঞ্জাবি। চাপা পাজামা। এলোমেলো এক মাথা চুল। শিবপদ যেন যৌবনের শিবপদকে দেখছে। এক সময় সেও এমনি সুন্দর ছিল। সুধা বলত, কি দেখে আমাকে বিয়ে করলে ? তোমার পাশে আমার দাঁড়াতে লজ্জা করে। শিবপদ বলত, তোমার বৈষ্ণব বিনয় রাখো। আত্মীয়-স্বজনরা দুজনকে পাশাপাশি দেখলে বলত, হর-গৌরী চলেছে।

জ্ঞানেশ বললে, 'কি ভাবছেন মাস্টারমশাই ?'

শিবপদ চমকে উঠে বললে, 'অতীত।'

'আমি কিন্তু আপনার প্রিয় ছাত্র ছিলুম।'

'এখনও তাই আছ।'

জ্ঞানেশ নিচু হয়ে পায়ের ধুলো নিতে গিয়ে থমকে গেল, 'এ কি, পা কাটলেন কি করে ? রক্ত পড়ছে ?'

আর তখনই শিবের মনে হল, পায়ের তলার বিশেষ একটা জায়গা ভীষণ জ্বালা করছে।

'কিসে কাটল বল তো ?'

'দেখি বসুন। এই চেয়ারে বসুন।'

শিবপদ চেয়ারে বসল। রক্তমাখা পদচিহ্ন পেছনে পড়ে আছে। নিজেই অবাক। হঠাৎ মনে পড়ল দোতলার ঘরে ছড়িয়ে পড়ে আছে ফালা ফালা কাঁচ।

উবু হয়ে বসে জ্ঞানেশ শিবের ডান পায়ের তলাটা পরীক্ষা করতে করতে বললে, 'কি একটা ফুটে আছে ?'

'কাঁচ ফুটে গেছে।'

'কাঁচ ? বের করা দরকার। পায়ের চাপে ভেতরে ঢুকে গেছে। ওষুধ-বিষুধ কিছু আছে বাড়িতে ?'

'তুমি বরং এক কাজ করো। তুমি দেবীকে একবার চট করে ডেকে আনবে ?'

'দেবী ? ও বুঝেছি।'

জ্ঞানেশ উঠে পড়ল। দেবীকে সে চেনে। দূর থেকে দেখেছে। পরিচয় হয়নি। মহিলাদের ব্যাপারে তার কোনও দুর্বলতা নেই। একটা জিনিসেই তার দুর্বলতা। গোলাপফুল। বাড়ির

ছাদে সারি সারি টব। অসংখ্য গোলাপের রকমারি বাহার। গোলাপ তার হাতে ফোটে ভালো।

দেবীর বাড়ির সামনে জটলা দেখে জ্ঞানেশ ঘাবড়ে গেল। সকলেই জানলায় উঁকি মারছে। হল কি! কেউ আবার গলায় দড়ি দিয়ে বসল না তো? জ্ঞানেশ ভয় পাবার ছেলে নয়। পাড়ায় তার দাপট আছে। রেখে ঢেকে কিছু করে না বলে, সুনামের চেয়ে বদনামই বেশি। যারা খুব কাছের মানুষ, তারা জানে জ্ঞানেশ কি ধাতুতে তৈরি।

একটা ছেলে জানালা দিয়ে উঁকি মারছিল। পেছন থেকে তার কলাব চেপে ধরে বেড়ালছানার মতো একপাশে সরিয়ে দিয়ে, আর একজনকে কনুইয়ের গুঁতো মেরে হটিয়ে, জ্ঞানেশ জানালায় দাঁড়াল। প্রথমেই তাকাল পাখার দিকে। না, কেউ ঝুলে পড়েনি। মরে যাওয়া ব্যাপারটা আজকাল কিছুই নয়। বেলুনঅলার বেলুন ফাটার মতো। ঘরে কেউ নেই।

জ্ঞানেশ চিৎকার করল, 'কে আছেন?'

বেশ ভারি আর দাপটের গলা শুনে দেবী ভয়ে ভয়ে বেরিয়ে এল। প্রথমে ভেবেছিল পুলিস। জ্ঞানেশকে দেখে মুখে হাসি ফুটল, 'আপনি?'

দেবী হাসলেও জ্ঞানেশ হাসল না। গম্ভীর মুখে বলল, 'মাস্টারমশাই আপনাকে একবার ডাকছেন। পায়ের তলায় কাঁচ ফুটিয়ে বসে আছেন।'

'সে কি? কিন্তু আমি বেরই কি করে?'

'কেন?'

'ওই দেখুন না, বাইরের দরজায় কে তালা মেরে দিয়ে গেছে, রাতের বেলা।'

মিথ্যে বলতে খুব খারাপ লাগছিল দেবীর। সাধারণত সে মিথ্যে বলে না। তা ছাড়া তোতার কাছে তার এই অসত্য ধরা পড়ে যাচ্ছে। তার বড় বড় নিষ্পাপ চোখের দিকে তাকালেই দেবী যেন কুঁকড়ে ছোট হয়ে যাচ্ছে।

জ্ঞানেশ বলল, 'একটা হাতুড়ি আর পেরেক দিন।'

'হাতুড়ি নেই যে।'

'শিল-নোড়ার নোড়া আছে?'

'তা আছে।'

জ্ঞানেশ জাদুকরের মতো নিমেষে তালা খুলে ফেলল। দরজার সামনে এক গাদা বাচ্চা জড় হয়েছিল। তারা হই হই করে উঠতেই জ্ঞানেশ প্রচণ্ড এক ধমক লাগাল। ঘরে ঢুকে সে নিজেই দরজা বন্ধ করে দিল।

দেবী একটা মোড়া এগিয়ে দিয়ে বললে, 'একটু বসুন। আমি তৈরি হয়ে আসছি।'

বসার আগে জ্ঞানেশ রাস্তার দিকের জানালার পাল্লা দুটো সশব্দে বন্ধ করে দিল। দরজার আড়াল থেকে তোতা ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছিল। এইমাত্র ফুড খেয়েছে। ওপরের পাতলা ঠোঁটের ধারে ধারে লেগে আছে। ডল পুতুলের মতো এমন সুন্দর মেয়ে জ্ঞানেশ খুব কমই দেখেছে। এ যেন আর এক গোলাপ!

জ্ঞানেশ ইশারায় কাছে ডাকল। তোতা পায়ে-পায়ে সামনে এগিয়ে এল। দেবী মেয়েকে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখে। বিছানা ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে কাচা ফ্রক পরায়। চুল আঁচড়ে, মুখ মুছিয়ে চোখে কাজল টেনে দেয়।

জ্ঞানেশ বললে, 'তোমার নাম কি মা?'

'তোতা।'

'ও তো তোমার ডাকনাম। ভালো নামটা বলো।'

'তাপসী।'

'বাঃ, চমৎকার নাম। কে রেখেছেন?'

তোতা ভেতরের ঘরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কে রেখেছে মা?'

দেবী শাড়ি পাল্টে ঘর থেকে বেরতে বেরতে বললে, 'আমি রেখেছি। আপনার পছন্দ হয়েছে ?'

'মেয়ের উপযুক্ত নাম হয়েছে।'

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেবী চুলের সামনের দিকটায় চট করে দু'বার চিরুনি বুলিয়ে নিল। আলমারি খুলে ছোট্ট একটা অ্যালুমিনিয়ামের সুটকেস বের করল। জ্ঞানেশের দিকে তাকিয়ে সসম্ভ্রমে বললে, 'নিন চলুন। আমি রেডি।'

তোতার দাড়িটা আদর করে নেড়ে দিয়ে জ্ঞানেশ উঠে পড়ল। হঠাৎ তার মনে হল, ঈশ্বর যদি তাকে এই রকম একটি মেয়ে দিতেন, তাহলে নাম রাখত, অতসী। অতসী আর গোলাপ দুটিই তার প্রিয় ফুল।

গালে আফ্‌টার শেভ লোশান ঘষতে ঘষতে অমিতাভ বললে, 'কতদিন তোমার এই গুমোট ভাব চলবে ?'

তনু বললে, 'তোমার স্বভাব-বিরুদ্ধ কাজ হচ্ছে। কোনও ব্যাপারে তুমি তো এতক্ষণ মাথা ঘামাও না।'

'ঘামাতে হচ্ছে। কারণ ব্যাপারটা আমার খুবই ইনসাল্টিং মনে হচ্ছে। হয় তুমি দপ্‌ করে জ্বলে ওঠো, নয় তো নিবে যাও। এমন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে জ্বোলো না।'

তনুর আর বাদানুবাদে যাবার ইচ্ছে নেই। প্রশ্নটা যখন মেনে নেওয়াব তখন দুর্বল পক্ষকে মেনে নিতেই হবে। অভিনয়ে তেমন রপ্ত নয় বলেই অভিনয় করতে পারছে না। তনু রান্নাঘরে চলে গেল। অমিতাভ ব্রেকফাস্ট সেরে নটার মধ্যে বেরিয়ে যাবে। অফিসের গাড়ি আসবে। আধুনিক রান্নাঘরে আয়োজনের অভাব নেই। আধুনিক ভাষায় এই সব সরঞ্জামকে বলে গ্যাজেটস। তনুর হাসি পাচ্ছে। সাহেব হবার কি করুণ চেষ্টা, এত কাল লাউ, সুক্তো, ঘণ্ট, মুগের ডাল খাবার পর, গ্রিলড, ফ্রিল্‌ড, স্মোকড, সিজল্‌ভ, বেকড, ডিপ ফ্রায়েড, তন্দুর। খাদ্যের শতনাম, আদতে সবই এক. যার নাম বংশবাটী, তারই নাম বাঁশবেড়ে। বাবা ছিলেন স্বদেশী। বাবাকে অবশ্য তনুর তেমন মনে পড়ে না। শৈশবের অস্পষ্ট স্মৃতি। কিন্তু মা ! বাবার আদর্শ মায়ের জীবনে এখনও জ্বলজ্বল করছে। বড় হওয়া মানে কি সাহেব হওয়া ! এই এত প্রাচুর্যের মধ্যে তনু আর অমিতাভকে দেখলেও কি তিনি খুশি হবেন। সব ছেড়ে অনেক অনেক উঁচুতে, প্রায় আকাশের কাছাকাছি দু'জনের বসবাস, স্বার্থপর, সুখী দুটি পাখি।

তনু স্যাণ্ডউইচ বানাতে বানাতে ঠিকই করে ফেলল, অমিতাভ বেরলেই সেও বেরিয়ে পড়বে। একটা ট্যাক্‌সি ধরে সোজা শিবপদর কাছে। দুপুরটা মনের আনন্দে কাটিয়ে আসবে তার প্রাণের পরিবেশে। ওইখানেই রাঁধবে, ভাত, লাউ দিয়ে মুগের ডাল, পোস্তর বড়া, বড়ির ঝাল। আসন পেতে, ঝকঝকে পেতলের থালায় বৃদ্ধকে খাইয়ে আসবে, সামনে বসে। কোনও তাড়া নেই। অমিতাভ আজ ফিরবে দেরিতে। পার্টি আছে।

সারা গায়ে শুকনো তোয়ালে ঘষে অমিতাভ 'ড্রাই মাসাজ' করছে। দেয়ালজোড়া কাচের জানালা দিয়ে সকালের রোদ এসে পড়েছে সবুজ কার্পেটে। উঁচুতলার জীবনের স্বাস্থ্য-সচেতনতা এসেছে অমিতাভর মনে। যোগাসন শুরু হয়েছে। রোয়িং ক্লাবের মেম্বার হবে। সুইমিংও বাদ থাকবে না। প্রোটিন, ভিটামিন, নিউট্রিশান এই সব ভাবনাও এসেছে। এখন স্পট জগিং শুরু হয়েছে। এরপর হয়তো ভোরে রাস্তায় নেমে পড়বে। ভবিষ্যৎ যখন অন্ধকার ভয়ঙ্কর রকম উজ্জ্বল তখন সুস্থ শরীরে বাঁচতে হবে অনেক দিন ! স্কুল-মাস্টারের ছেলে ছিল কোনও এক কালে। আর নয়। এখন নতুন জেনারেশানের বীজ বুনবে সে। নতুন ধরনের জীবনযাত্রা, মূল্যবোধ।

বিশাল বাথরুম। ঠাণ্ডা জল, গরম জল, বাথটাব। ভাবতে হয়. কোনটা কি করবে। শুয়ে

স্নান, না দাঁড়িয়ে স্নান। জীবনটাকে এমন সিনেমার মত কে করে দিলে? ঈশ্বর? দৈব? তা কেন? পুরুষকার। ঈশ্বরভাবনা তার আসে না। মাথাটা যার কম্পিউটারের মত, তার জন্যে ঈশ্বর নয়। তার জন্যে জগৎ। রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ সব কিছু নিয়ে দাপটে বেঁচে থাকা।

ঝকঝকে রুপোলি 'নব' ঘোরাতেই 'শাওয়ারের' মুখ বেয়ে হিস্ হিস্ শব্দে, তোয়ালে ঘষা গরম শরীরে ঠাণ্ডা জলের ফিন্‌কি ধারা নেমে এল।

জ্ঞানেশ বললে, 'স্যুটকেসটা আমার হাতে দিন।'

দেবী বললে, 'এমন কিছু ভারি নয়।'

'হালকা অথবা ভারি, সে জন্যে নয়, আমিও কাজে লাগতে চাই।'

জ্ঞানেশ ছোট্ট বাক্সটা দেবীর হাত থেকে নিয়ে নিল। মেয়েদের দিকে সে ভালো করে কদাচিৎ তাকায়। তাকাবার কোনও প্রয়োজন বোধ করে না। দেবীর হাত থেকে বাক্সটা নেবার সময় ক্ষণিকের জন্যে তার মনে হল, ভদ্রমহিলা অসাধারণ সুন্দরী। সচরাচর এমনটি দেখা যায় না। কেমন একটা বিমুগ্ধতার ভাব এসে গেল মনে। আচ্ছন্ন করে ফেলার মত অদ্ভুত এক ভালো লাগা। মনের এই অবস্থায় ভালো লাগার বস্তুকে তার প্রণাম করতে ইচ্ছে করে। জ্ঞানেশের মা বলতেন, যা কিছু সুন্দর তাই ঈশ্বর।

দেবী বললে, 'কি আছে বলুন তো?'

জ্ঞানেশ একটু আনমনা ছিল। কথা কানে যায়নি। বুদ্ধিমানের মত, হেসে জবাব দেবার চেষ্টা করল। দেবীর মুখ দেখে মনে হল, প্রশ্নের উত্তর হাসি হতে পারে না।

দেবী যেন মজা পেয়ে গেল। বললে, 'বলতে পারলেন না তো? ওটা আমার ফার্স্ট-এড বক্স। সব আছে ওর ভেতর, ছুরি, কাঁচি, তুলো, সিরিঞ্জ।'

'আপনি কি ডাক্তারি পড়েছিলেন?'

'না, সে সুযোগ হয়নি। শখ করে নার্সিং, ফার্স্ট-এড এই সবের ট্রেনিং নিয়েছিলুম রেড ক্রস থেকে।'

'এখন কাজে লাগছে।' জ্ঞানেশ হাসল।

'তা লাগছে। আজকাল ডাক্তারবাবুদের তো ডাকলেই পাওয়া যায় না। তাঁরা আসার আগে একটু থামা দেওয়া যায়।'

বৃষ্টিধোয়া উজ্জ্বল সকাল। পেছনে দুধের ক্যান ঝুলিয়ে সাইকেল চলেছে শব্দ করে। ব্যস্ত মানুষজন হনহন করে হেঁটে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। কিছু হকার এখনও খবরের কাগজ দেওয়া শেষ করতে পারেনি। তীর বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে বাতাসের ঝটকা মেরে। প্রায় পাশাপাশি দু'জন হেঁটে চলেছে, দেবী আর জ্ঞানেশ।

কৃষ্ণ কুমুর ঘরে একটা ধূপ জ্বেলেছে। সকালে এইটাই তার প্রাথমিক কাজ। কৃষ্ণ শেষ বয়সে সার বুঝেছে ধার্মিক না হলে, এই দুঃখ, কষ্ট আর প্রবঞ্চনার পৃথিবীতে বসবাস বড় দুঃখের। সেই অদৃশ্য, অজ্ঞাত, রহস্যময় পুরুষটির কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ না করতে পারলে সব কিছু এলোমেলো, লক্ষ্যহীন, বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।

কৃষ্ণ এও লক্ষ করেছে, ধূপ জ্বাললে, কুমুর আচরণে অদ্ভুত এক পরিবর্তন আসে। কেন আসে, কৃষ্ণ তা জানে না। ধূপ জ্বালা মাত্রই কুমু তাড়াতাড়ি মাথায় আঁচল তুলে দেয়। কেউ যেন আসবে। নব বধূ তাই যেন ঘোমটা টেনে প্রস্তুত হয়ে বসল। প্রথমে ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ দুলবে, আপন মনে বিভোর হয়ে। তারপর মুখ উঁচু করে দেখতে থাকবে ধূপের ধোঁয়া কি ভাবে পাকিয়ে পাকিয়ে সুতোর মত ঊর্ধ্বে উঠে যাচ্ছে। কোথা থেকে উঠে কোথায় চলেছে। এই সময় বারে বারে সেই গানের লাইনটি মনে পড়ে যায় কৃষ্ণর, 'কোথা হতে আসি, কোথা ভেসে

যাই ।' কুমুর এই ভাব দেখলে কৃষ্ণর মনে হয়, কুমু পাগল নয়, সে এমন একটা কিছু পেয়েছে বা দেখেছে যার ফলে তার মন স্তম্ভিত হয়ে গেছে । হতে পারে ? কুমুর দেহ নিয়ে এত বেশী নাড়াচাড়া হয়েছে, মন সেই অসহ্য উৎপাতে দেহ-ছাড়া হয়ে গেছে । কুমু কিছু একটা ধরেছে । পাছে কেউ তাকে ধরে ফেলে, সেই ভয়ে নিজেই অধরা হয়ে আছে ।

কৃষ্ণ এতক্ষণ কুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল । কই, অন্য দিন চোখ দিয়ে এমন জল পড়ে না তো ? চোখ দুটো বেশ লাল হয়েছে । কাল রাতে কৃষ্ণ যখন শিবের বাড়িতে ছিল, সেই সময় কুমু কি করেছে কে জানে ? একটা জানালা খোলা ছিল । হুহু করে জোলো বাতাস ঢুকেছে ।

কৃষ্ণ 'আইড্রপস্'-এর শিশিটা খুঁজে বের করল । এ চোখে দু ফোঁটা, ও চোখে দু ফোঁটা । একটু জ্বালা করবে তা করুক । কৃষ্ণ কাছে যেতেই কুমু স্থির দৃষ্টিতে কৃষ্ণর দিকে তাকাল ।

সেই সুন্দর দুটি চোখ । যে চোখকে সৌন্দর্যের ব্যাকরণ বলেছে, বাদামচেরা চোখ । কৃষ্ণ বেশ কিছুক্ষণ চোখে চোখে তাকিয়ে রইল । ভাষা কি ফিরে আসছে ? কুমু কি সত্যিই তাকে দেখছে ! না । সেই অনির্দিষ্ট তাকান । যা কোনও বস্তুকে ধরে না । শূন্য দৃষ্টি ।

কৃষ্ণ বললে, 'চোখে ঠাণ্ডা লাগালে কি করে ? লাল হয়েছে । জল গড়াচ্ছে ।'

কুমু উত্তরে তিনবার হাততালি দিয়ে দুলতে লাগল আগের মত । কৃষ্ণ পেছনে এসে কুমুর মুখটা উঁচু করে দু হাঁটুর মাঝখানে চেপে ধরল । কুমু দাঁতে দাঁত চেপে উঁউঁ শব্দ করছে । দু আঙুল দিয়ে চোখ ফাঁক করে কৃষ্ণ প্রথমে ডান চোখে,তারপর বাঁ চোখে দ্রুত ফোঁটা ফেলে দিল।

কৃষ্ণ এবার স্নান করবে । শরীরের কোথাও তেল ছোঁয়াবার অভ্যাস নেই । স্নানের আগে কাচাকুচি তার নিত্য দিনের কাজ । আলস্যের পথ ধরে আসে নোংরামি । নোংরামির পেছন পেছন আসে দারিদ্র্য । বাড়ি, দেহ, সব কিছুই থাকবে মন্দিরের মত । যে কোনও কাজ অভ্যাসের মধ্যে নিয়ে এলে মন আর বেঁকে বসতে পারে না ।

কৃষ্ণ ঘরের সব কটা জনলা খুলে দিল । এইবার রোদ আসুক, বাতাস আসুক । লাল একটা প্রজাপতি উড়তে উড়তে ঘরে এসে ঢুকল । কৃষ্ণ শিল্পী । তার চোখ রঙ-পাগল । প্রজাপতির উজ্জ্বল লাল রঙের দিকে তাকিয়ে মন তার খুশিতে ভরে উঠল । নিমেষে বয়েস কমে গেল পঞ্চাশ বছর । নিজের মনকেই বললে, কত বড় শিল্পী তুমি ঈশ্বর ! কার ক্ষমতা আছে পৃথিবীর রঙ দিয়ে এমন রঙ মেশায় ।

প্রজাপতিটা উড়তে উড়তে কুমুর খোঁপায় গিয়ে বসল । কৃষ্ণর মনে হল খুব শুভ লক্ষণ । কাল রাত থেকেই মনে হচ্ছে, কুমু আবার ভাল হয়ে যাবে । সাত্যকি তার ভাল করতে এসেছিল । সাত্যকির আত্মা তার ভাল করবে । করবেই করবে । মানুষের চেয়ে, মানুষের আত্মা আরও শক্তিশালী ।

বেশ খুশি খুশি মনে কৃষ্ণ বাথরুমে প্রবেশ করল । মৃত্যুর বিশাল ছায়া সরিয়ে দিয়েছে সামান্য একটা প্রজাপতি । নিজেকেই প্রশ্ন করল, 'জগতের মূল বস্তুটি কি কৃষ্ণ ?'

'আনন্দ ।'

সেই আনন্দকে ধরো । প্রজাপতি যেমন ধরেছে ডানায়, ফুল ধরেছে পাপড়িতে । পাখি ধরেছে কণ্ঠে । নদী ধরেছে তরঙ্গে । কৃষ্ণ ভাবতে ভাবতে বিভোর । সারা ভারত ঘুরেছে । চোখের সামনে ভেসে উঠল হিমালয় । তুষার কিরীট ঝলমল করছে রোদে । কলের মুখ থেকে জল পড়ছে ভরা বালতিতে, যেন ঝরনার শব্দ । জীবন মানে কল্পনা । দুঃখের কল্পনায় দুঃখ । সুখের কল্পনায় সুখ ।

হেসে যা কৃষ্ণ । প্রাণ খুলে হেসে যা । দেখে যা । গান গেয়ে গেয়ে, নাচতে নাচতে চলে যা ।

'বাব্বা, পাটাকে একেবারে ফালা করে ফেলেছেন !'

দেবীর কোলের ওপর শিব-এর ডান পা। দেবীর কথা শুনে শিবের মনে একটু হাসি খেলে গেল। স্নেহের তিরস্কার কত মধুর লাগে।

দেবী রাগ রাগ গলায় বললে, 'পায়ের তলায় এত বড় একটা কাঁচের টুকরো ঢুকে আছে, চলবার সময় একবারও টের পেলেন না ? সঙ্গে সঙ্গে বের করে দিলে এই অবস্থা হত না।'

দেবীর পাশে সহকারীর মতো বসে আছে জ্ঞানেশ। দেবী যা আদেশ করছে সঙ্গে সঙ্গে তা পালন করছে বাধ্য ছেলের মতো।

'দিন, একটু তুলো ছিঁড়ে দিন।'

দেবী এত আত্মমগ্ন, কাকে কি বলছে, কি ভাবে বলছে, কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই। শিবের পায়ের তলায় বুড়ো আঙুলের মাথা ঘষতে ঘষতে জিজ্ঞেস করলে, 'কি, খচ্‌খচ্ করছে।'

সুড়সুড়ি লেগেছে। পা টেনে নেবার চেষ্টা করতে করতে শিব বললে, 'খচখচ নয়। সুড়সুড়ি লাগছে।'

দেবী ধমকে উঠল, 'সুড়সুড়ি লাগছে ? অথচ এত বড় এক ফালা কাঁচ ফুটে রইল, সেটা আর বোঝা গেল না ?'

'কি করে বুঝবো মা ! তখন জ্ঞানেশ যে আমাকে ডাকছিল ?'

দেবী সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেশকে ধমক লাগাল, 'ও ভাবে মানুষকে ডাকেন কেন ?'

জ্ঞানেশ অপরাধীর মতো বললে, 'কি করব, আমি যে ডেকে ডেকে সাড়া পাচ্ছিলুম না।'

'দেখি ব্যাণ্ডেজ দিন। কাঁচটা বের করুন।'

পা ব্যাণ্ডেজ করতে করতে দেবী বলল, 'একটা টেট ভ্যাক নিতে হবে।'

'এ তো বাড়ির কাঁচ। রাস্তার কাঁচ হলে ভয় ছিল।'

'ও সব ফাঁকিবাজি চলবে না। সাবধানের মার নেই।' জ্ঞানেশের দিকে মুখ ঘুরিয়ে বললে, 'যান একটা ভ্যাকসিন কিনে আনুন।'

শিব বললে, 'মনে পড়েছে। এখনও তিন মাস হয়নি। তুমিই দিয়েছিলে।'

দেবী গম্ভীর মুখে বললে, 'আমার মনে পড়ছে না।'

'ঠিকই মনে পড়ছে। তুমি আমার সঙ্গে দুষ্টুমি করছ।'

'চটিটা পায়ে দিয়ে ঘুরতে কি হয় ?'

'বাড়ির চটিটা ছিঁড়ে গেছে যে।'

'আমাকে বলতে কি হয়।'

কোনও উত্তর না দিয়ে শিবপদ ভালোমানুষের মতো মুখ করে বসে রইল। দেবী ব্যাণ্ডেজে শেষ পাক মারল। কোল থেকে পা নামিয়ে শিব বলল, 'জ্ঞানেশ, চলো তাহলে, এবার আমরা আমাদের কাজে যাই।'

'আপনি হাঁটবেন কি করে মাস্টারমশাই ?'

'কেন ? তেমন ব্যথা তো হয়নি। সামান্য একটু জ্বালা জ্বালা করছে।'

দেবী বললে, 'জ্বালা জ্বালা। কি সাংঘাতিক ব্যথা হয় দেখবেন। কাঁচে কাটা।'

'সে আর কি করা যাবে। যেতে তো হবেই। আর কতক্ষণ রাখা যায়।'

জ্ঞানেশ বললে, 'সেই ক্যাশমেমোটা আমাকে দিন। আমি সব ব্যবস্থা করে আসছি।'

'তুমি একা যাবে ! আর আমি আরাম করে বসে থাকব স্বার্থপরের মতো ?'

দেবী বললে, 'বাড়িতে তো একজনকে থাকতেই হবে। পা না কাটলেও আপনাকে থাকতে হত। জ্ঞানেশবাবুকে আমি ক্যাশমেমোটা দিচ্ছি। উনি সব ঠিক করে আসবেন। ভাববার কিছু নেই।'

দেবী সব জানে কোথায় কি আছে। ক্যাশমেমোটা এনে জ্ঞানেশের হাতে দিল। জ্ঞানেশ উল্টেপাল্টে দেখে বললে, 'ভদ্রলোক প্রায় দেড়শোটাকার ওষুধ কিনেছিলেন। ওষুধেই

বেঁচেছিলেন দেখা যাচ্ছে। আচ্ছা আমি তাহলে আসি।'

জ্ঞানেশ বেরিয়ে গেল। কিছুক্ষণ পরেই গাড়িতে স্টার্ট দেবার শব্দ ভেসে এল। দেবী বললে, 'চা খেয়েছেন ?'

'হ্যাঁ, আমি আর দাদা সারারাত দাবা খেলে কাটিয়েছি। শেষ রাতে চা করেছিলুম।'

'আর একবার চা খাবার সময় হয়েছে। আমি করে দিচ্ছি।'

'তুমি একটু অপেক্ষা করো, আমি দুধটা এনে ফেলি।'

দেবী প্রায় ধমকে উঠল, 'না। দুধ, বাজার, হাঁটা চলা কিচ্ছু আজ চলবে না। খাবার আমি করে আনব। দুধ দুর্গাকে দিয়ে আনাচ্ছি। হ্যাঁ, কাঁচ কোথায় পড়ে আছে ?'

'দোতলায়। অমিতাভর ঘরে। কালকের ঝড়ে শার্শির একটা কাঁচ ভেঙে গেছে।'

'বেশ ঠিক আছে। আপনি আর ওপরে যাবেন না। আমি আসছি। এসে সব পরিষ্কার করব। প্ল্যাস্টিকের বড় খাপ আছে বাড়িতে ?'

'কি করবে ?'

'আপনার পায়ে পরিয়ে দোব। তা না হলে এক্ষুনি আপনি ব্যাণ্ডেজটা ভিজিয়ে ফেলবেন। জল লাগলেই পেকে যাবে।'

'সে রকম কি বাড়িতে কিছু আছে ?'

'আচ্ছা আমি নিয়ে আসছি। যেমন বসে আছেন, আপনি সেই রকম বসে থাকুন।'

দেবী বেরিয়ে গেল হন হন করে। শিব স্নেহের দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল চলে যাওয়া মেয়েটির দিকে। পর এইভাবেই আপন হয়। আবার আপন কি ভাবে পর হয়ে যায়। সম্পর্ক যেন আকাশ! কখনো তকতকে নীল। কখনও মেঘলা।

অমিতাভ লিফ্‌টের বোতাম টিপল। উঠে আসছে লিফ্‌ট। মাথার ওপর আলো জ্বলছে, নিবছে। অমিতাভর শিস্ দিতে ইচ্ছে করছে। মনের খাঁচায় একটা সুখ-পাখি ঢুকেছে। লিফ্‌ট ওপরে চলে গেল। ওপর থেকে নেমে আসছে আবার। শাড়ির আঁচল খসার মৃদু শব্দে দরজা সরে গেল। ভেতরে একজন মাত্র যাত্রী। ব্রিফকেস সামলে ভেতরে ঢুকতেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। অসহ্য সুন্দরী এক মহিলা। ঘাড়-ছাঁটা চুল। পশম কোমল, ফিরোজা শাড়ি। করমচা ঠোঁট। ধোঁয়াটে গগলস। লাল নখ। দামী নেশার মত সেন্টের গন্ধে বাতাসের মূর্ছা। অমিতাভর ভীষণ মন কেমন করছে। সিল্কের শাড়িতে ঢালাই একটি দীর্ঘ শরীর। যেন উল্টো বিস্ময় চিহ্ন। নামছে। অমিতাভ ক্রমশই নিচে নামছে। পায়ের তলায় ভাসমান পোস্টকার্ড।



॥ এগার ॥

লেক মেডিকেল স্টোরসের পাশে জ্ঞানেশ গাড়ি দাঁড় করাল। পাশেই একটা আঁস্তাকুড়ের ঢিবি। এক ঠ্যাঙে দাঁড়িয়ে আছে হতশ্রী একটা ল্যাম্পপোস্ট। যেখানে বাঙালী সেইখানেই আঁস্তাকুড়। চারপাশে ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা, সুন্দর সুন্দর সব বাড়ি। বারান্দায় বারান্দায় ফিনফিনে, দামী দামী শাড়ি বাতাসে কাঁপছে। সকলেই উচ্চবিত্ত কিন্তু পরিচ্ছন্নতার ব্যাপারে অদ্ভুত উদাসীন।

দোকানে ফ্যাকাসে চেহারার এক ভদ্রলোক বসে আছেন। দেখলেই মনে হয় বহু টাকা এবং বহু অসুখের মালিক। জ্ঞানেশ ক্যাশমেমোটা ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললে, 'দেখুন তো, এই ডাক্তারবাবুর চেম্বারটা কোথায় ?'

রিমলেস চশমার ভেতর দিয়ে চিলের মতো তাকিয়ে, জ্ঞানেশের দিকে চোখ তুলে ভদ্রলোক প্রশ্ন করলেন, 'আপনি কি পুলিসের লোক ?'

'কেন বলুন তো ?'

'না, মানে হঠাৎ ডাক্তারবাবুর খোঁজ করছেন ? আগে আপনাকে কখনও দেখিনি তো !'

'এই অঞ্চলের সকলকে আপনি চেনেন ?'

'হ্যাঁ, মোটামুটি সকলকেই চিনি।'

'এই ক্যাশমেমোয় যিনি ওষুধ কিনেছিলেন তাঁকে চেনেন !'

'নামে চিনি না, তবে দেখলে চিনতে পারব। আপনি কি পুলিসের লোক ?'

'না, আমি একজন সাধারণ মানুষ। বলুন, ডাক্তারবাবুর চেম্বার কোথায় ?'

'এই রাস্তা ধরে আপনি সোজা বেরিয়ে যান। ডানদিকে মোড় নিন। চারটে রাস্তা যেখানে মিলেছে, সেইখানে কোনও দিকে না বেঁকে সোজা গেলেই দুধের ডিপো। ডিপো পেরলেই চারতলা একটা বাড়ি। সেই বাড়ির নিচে ডক্টর কুণ্ডুর চেম্বার।'

'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'হ্যাঁ, মশাই কোনও গোলমেলে ব্যাপার নয় তো !'

'না, না, ভয় পাবার কিছু নেই।'

ম্যাক্সি পরা একটি মেয়ে রাস্তা ঝাঁট দিতে দিতে দোকানে এসে ঢুকলো। বাতাস আর সেন্টের ঝাপটা এসে লাগল জ্ঞানেশের নাকে। আর এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে জ্ঞানেশ বাইরে বেরিয়ে এল। ভদ্রলোক মৃদু গলায় বললেন, 'খুবই সন্দেহজনক।'

মেয়েটি মৃদু হেসে একটা প্রেসক্রিপসান এগিয়ে দিতে দিতে বললে, 'এক, তিন, পাঁচ।'

ভদ্রলোক অন্যমনস্কভাবে প্রেসক্রিপসান নিলেন, চোখ এখনও রাস্তার দিকে। জ্ঞানেশ গাড়িতে স্টার্ট দিল। একটু ব্যাক করে, ডান দিকে কাটিয়ে তীব্র বেগে বেরিয়ে গেল সোজা। জ্ঞানেশ আস্তে গাড়ি চালাতে পারে না।

মেয়েটি বললে, 'কি হল, দিন, এক নম্বর, তিন নম্বর, পাঁচ নম্বর।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আজকের কাগজ পড়েছেন আপনি ?'

'হ্যাঁ, পড়েছি। কেন কি হয়েছে !'

'সাংঘাতিক কোনও খবর আছে কি ?'

'না, সেরকম কিছু চোখে পড়েনি। তবে কাগজটা এখনও ভাল করে পড়া হয়নি।'

ভদ্রলোক আলমারি খুলে ওষুধ বের করতে লাগলেন। খুবই চিন্তিত দেখাচ্ছে। ওষুধবিষুধের লাইন ক্রমশই জটিল হয়ে উঠছে।

জ্ঞানেশ ডিপোর পাশে গাড়ি থামাল। ডিপো খোলা। তিনটি মেয়ে হিসেব মেলাচ্ছে। তারের খাঁচার খোপে খোপে খালি বোতল। ফুটপাথে সারসার সাজানো। কৃশ চেহারার একটা বেড়াল ভয়ে ভয়ে চারপাশে ঘুরছে। কাউকে আসতে দেখলেই থমকে দাঁড়িয়ে সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে।

ডক্টর বি কুণ্ডু। একগাদা টাইটেল। এম বি বি এস ছাড়া সবই দুর্বোধ্য। বেশ সুন্দর চেহারার এক মা তাঁর শিশুটিকে কোলে নিয়ে ফুটপাথে পায়চারি করছেন। শিশুটি মাঝে মাঝে কেঁদে উঠছে। মা ভোলাবার চেষ্টা করছেন। জ্ঞানেশের গাড়িটা দেখিয়ে বলছেন, 'ওই যে গাড়ি।'

জ্ঞানেশের সঙ্গে মহিলার একবার দৃষ্টি-বিনিময় হল। জ্ঞানেশের মনে হল মহিলাটিকে সে চেনে। কবে কোথায় যেন দেখেছে। ডিস্‌পেনসারির সিঁড়িতে একটা পা রেখে জ্ঞানেশের হঠাৎ মনে হল, মেয়েটির নাম সুলতা। তার সঙ্গে স্কটিশে পড়ত। জ্ঞানেশ ফিরে তাকাল। আবার ঠোকাঠুকি হয়ে গেল চোখে চোখে।

জ্ঞানেশ ফিরে এল, 'আপনার নাম কি সুলতা ?'

'তুমি জ্ঞানেশ না ! বাব্বা কি মোটা হয়ে গেছ তুমি ?'

'আর তুমি যে মা হয়ে গেছ !'

জ্ঞানেশ আর সুলতা দু'জনেই হেসে উঠল। কোলের শিশুটি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল জ্ঞানেশের মুখের দিকে।

সুলতা বললে, 'তুমি কি এইখানেই থাক ?'

'না না, আমি অনেক দূরে থাকি সুলতা। নর্থে।'

'সাতসকালে এখানে কি করতে এসেছ ?'

'একটা কাজে এসেছি তোমার এই ডাক্তারবাবুর কাছে। কি হয়েছে এর ?'

'আর বোলো না, দাঁত উঠছে।'

'আচ্ছা। কি নাম রেখেছ ?'

'কৃশানু।'

'বাঃ, বেশ আধুনিক নাম। তোমার কত্তা কি করেন ?'

'ইঞ্জিনিয়ার। হিল্লিদিল্লি করে বেড়ায় সারা বছর।'

'আহা রে ! বড় একা !'

সুলতা সুর করে বললে, 'বড় একা ? বিয়ে করেছ ?'

'হ্যাঁ করেছি।'

'তোমার জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ সব ভেসে গেল !'

'কি করব বলো, মায়ের জন্যে।'

'সেবাদাসী এনেছ ! গাড়ি কিনেছ ! বেশ বড়লোক হয়েছ !'

'ব্যবসাদার গাড়ি ছাড়া অচল। শখের গাড়ি নয়, কাজের গাড়ি।'

'তোমাকে দেখে আবার পুরনো দিনের কথা মনে পড়ছে।'

'আমারও। ছাত্রজীবন আর ফিরবে না সুলতা !'

'নাঃ। তুমি সুখী হয়েছ ?'

'দুঃখ-সুখ বোঝার মনটাই নষ্ট হয়ে গেছে ! বেঁচে আছি। তুমি সুখী হয়েছ ?'

'নাঃ। আমার জীবনটা নষ্ট হয়ে গেছে বুড়োটে এক লোকের পাল্লায় পড়ে। কলকবজা, মেসিন ছাড়া কিছুই বোঝে না।'

'তুমি তো খুব সূক্ষ্ম রুচির মেয়ে ছিলে ?'

'আমার সব গেছে। এই ছেলেটাকে না পেলে কি যে হত আমার ! তোমার বউ কেমন হয়েছে ?'

'ওই চলে যায় আর কি, চালিয়ে নিতে হয়।'

'মোটা হলে কি করে ? বেশ তো ছিপছিপে ছিলে ! মদ ধরেছ বুঝি !'

'সামান্য। এখনও খেতে পারেনি আমাকে। তোমার ডাক্তারবাবু আছেন ভিতরে ?'

'দাঁড়াও, অত সহজে তিনি দর্শন দেবেন ?'

'কখন আসবেন ?'

'আসবেন কি, বলো নামবেন। এই বাড়িটাই তো ডাক্তারবাবুর ! তিনি এখন যোগাসন করছেন।'

'আসন শেষ হবে কটার সময় ?'

'আজ একটু দেরি হচ্ছে। অন্যদিন এইসময় এসে যান। দেরি হয়ে ভালই হচ্ছে, তবু তোমার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথা বলা যাচ্ছে। আমাদের কলেজের সেই কমানরুমের সামনেটা তোমার মনে পড়ে?'

'তোমাদের আর আমাদের কমানরুম তো আলাদা ছিল !'

'আমাদের দিকটায় তোমরা তো প্রায়ই চলে আসতে ! আর একটু পরেই কলেজ শুরু হয়ে যাবে, তাই না জ্ঞানেশ !'

'হ্যাঁ, তা হবে।'

'এখনও বাইবেল ক্লাস হয় ?'

'কি জানি সুলতা ! বহুকাল আর কলেজের দিকে যাওয়া হয়নি।'

'তুমি রিইউনিয়ানের কার্ড পাও ?'

'আগে পেয়েছি কয়েকবার। এখন আর আসে না।'

'বিশ্বাস কর জ্ঞানেশ, এই যে তোমার সঙ্গে দাঁড়িয়ে আছি, আমি সেই বিশাল দেবদারুর পাতায় বাতাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছি। পাখির ডাক শুনতে পাচ্ছি। কল্যাণ যেন দূর থেকে হেঁটে আসছে। এলোমেলো একমাথা চুল। মুখে সেই শিশুর মতো একমুখ হাসি।'

'কল্যাণকে তুমি ভালবেসেছিলে, তাই না সুলতা !'

'বোধ হয়।'

'তা হলে ওর সঙ্গে অমন ব্যবহার করলে কেন ? তোমার জন্যেই কল্যাণ আত্মহত্যা করেছিল। এ কি, তোমার চোখে জল !'

সুলতা ছেলের বুকে মুখ লুকালো। ফর্সা ঘাড়ে আলগা খোঁপা দুলছে। নীল সিল্কের শাড়ির আঁচল উড়ছে বাতাসে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত ছিমছাম, সুবেশা এক তরুণী। দেহে সামান্য মেদ আসছে। মুখ আগের চেয়ে ভারি হয়েছে।

জ্ঞানেশ বললে, 'অতীতের কথা থাক সুলতা। মনে আছে আমাদের প্রিনসিপ্যাল প্রায়ই বলতেন, ডোণ্ট লিভ ইন দি পাস্ট। বর্তমানে ফিরে এস।'

সুলতা মুখ তুলল। চোখের পাতা ভিজে ভিজে। কপালের টিপ বাঁপাশে সরে গেছে। জ্ঞানেশ বললে, 'টিপটা সেণ্টারে নিয়ে এস। সরে গেছে।'

সুলতা আন্দাজে টিপটা ভুরুর মাঝখানে এনে আঙুল দিয়ে টিপে বসিয়ে দিতে দিতে বললে, 'চলো, ডাক্তারবাবু এসে গেছেন।'

জ্ঞানেশ সিগারেট বের করেছিল। প্যাকেটে ঢুকিয়ে রাখল। সেতারের ভুল তারে হাত দিয়ে ফেলেছে। কল্যাণের প্রসঙ্গ এলেও, কল্যাণের আত্মহত্যার জন্যে সুলতাকে দায়ী করা ঠিক হল না। জ্ঞানেশের হঠাৎ মনে হল, তার বয়েস অনেক বেড়ে গেছে। মনে হল, সে আর বেশিদিন বাঁচবে না। হঠাৎ একদিন মৃত্যু হবে। মন থেকে সমস্ত বিষণ্ণতা ঝেড়ে ফেলার জন্যে জ্ঞানেশ অকারণে সিঁড়িতে জুতোর শব্দ করল।

বাইরে থেকে বোঝা যায়নি ভেতরে তীর্থের কাকের মত নানা বয়েসের রুগী ব্যাজার মুখে বসে আছে। ডাক্তার কুণ্ডু, সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, সাত্ত্বিক চেহারার মানুষ। দেখে শ্রদ্ধা হয়। জ্ঞানেশ টেবিলের সামনে এগিয়ে গেল, 'নমস্কার ডাক্তারবাবু, আমি রুগী নই, মেডিকেল রিপ্রেজেণ্টেটিভও নই।'

'তাহলে ইনকামট্যাক্স !' ডক্টর কুণ্ডু হাসলেন।

'আজ্ঞে না, তাও না। আমি একটা খবর নিতে এসেছি।'

'কি খবর ?'

'সাত্যকি বোস নামে আপনার কোনও রুগী ছিলেন ?'

'সাত্যকি বোস !' ডাক্তারবাবু চোখ বুজিয়ে স্মৃতি অনুসন্ধান করতে লাগলেন।

'এই ক্যাশমেমোটা দেখুন। এটা দেখলে হয়তো মনে পড়তে পারে।'

ডাক্তারবাবু চোখ খুললেন। মুখে মৃদু হাসি। 'মনে পড়েছে। বুঝলেন ! সাধারণত রুগীদের আমি ভুলি না, এই ভদ্রলোক অকেসানালি আমার কাছে আসতেন। একটু বোহেমিয়ান টাইপের। আচ্ছা এই ভদ্রলোক সম্পর্কে আপনি আমাকে প্রশ্ন করছেন কেন ? এনি থিং রং ?'

'মারা গেছেন।'

'তাই না কি ? যেতেই পারেন। সময় ধার করে বেঁচেছিলেন। শরীরের অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। এসব কেস জেনার‍্যালি বাঁচে না।'

'এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে মারা গেছেন। ডেডবডি সেইখানেই পড়ে আছে। নিয়ারেস্ট বিলেটিভের সন্ধানে বেরিয়েছি।'

'এখানে ওঁর নিয়ারেস্ট রিলেটিভ হলেন মিস পামেলা বোস।'

'কি ভাবে যাব ?'

'এই রাস্তা ধরে সোজা চলে যান। বাড়ির ঠিকানা আমি বলতে পারব না। আই ক্যান গিভ ইউ ডিরেকসান ওনলি।'

পথ নির্দেশ নিয়ে জ্ঞানেশ বেরতে যাবে, ডাক্তার কুণ্ডু বললেন, 'ডেথসার্টিফিকেটটাও নিয়ে যান। নয়তো আবার আপনি ফিরে আসবেন।'

'না দেখেই সার্টিফিকেট দেবেন ?'

'দেখার দরকার হবে না।'

'খুব ব্লিডিং হয়েছে।'

'হবেই তো, হবেই তো। এসব কেসে সাধারণত তাই হয়। আপনি একটু বসুন, আমি দু'লাইন লিখে দি।'

ডাক্তারি শব্দে বোঝাই দুর্বোধ্য হস্তাক্ষরে একটা সার্টিফিকেট পকেটে পুরে জ্ঞানেশ উঠে দাঁড়াল। জ্ঞানেশের পেছন পেছন সুলতাও বেরিয়ে এল ফুটপাথে। করুণ মুখে বললে, 'তুমি তাহলে চললে !'

জ্ঞানেশ মৃদু হেসে বললে, 'যাই। ওদিকে একজন মরে পড়ে আছে।'

'অমন অশ্রদ্ধা করে বলছ কেন ?'

'অশ্রদ্ধা নয়। মৃত্যু-ফৃত্যু আজকাল আর মনে তেমন দাগ কাটে না। কল্যাণের মৃত্যু...' জ্ঞানেশ ঢোঁক গিলে বললে, 'আই অ্যাম সরি।'

সুলতা বললে, 'আমার ওপর সেই ঘৃণাটা তুমি এখনও বয়ে বেড়াচ্ছ। কিছুতেই ভুলতে পারছ না। কল্যাণের মৃত্যুর পর তোমরা আমার নাম রেখেছিলে, ডাইনী সুলতা। তোমরা কেউই জানতে না কল্যাণ কেন আত্মহত্যা করেছিল। আমি জানতুম। তোমাদের বলিনি। বলতে পারিনি।'

সুলতা এবার অঝোরে কেঁদে ফেলল। জ্ঞানেশ নিজের ওপর অসম্ভব বিরক্ত হয়ে বললে, 'কেন যে আজ বারে বারে কল্যাণের কথা এসে পড়ছে।'

সুলতা ধরাধরা গলায় বললে, 'আসুক, আসুক, আসতে দাও। তুমি আজ, এতদিন পরে অন্তত জেনে যাও, কেন কল্যাণ আত্মহত্যা করেছিল ! কল্যাণের কুষ্ঠ হয়েছিল।'

'কুষ্ঠ !' জ্ঞানেশ অবাক হল, 'কুষ্ঠ হয়েছিল বলে বোকার মত আত্মহত্যা করল। চিকিৎসা করে দেখল না সারে কি না ?'

সুলতা নির্বাক্। দৃষ্টি তার বহু দূরে। আকাশের গায়ে। হঠাৎ এক সময়ে বললে, 'তোমার ঠিকানাটা দেবে যদি আপত্তি না থাকে !'

'আপত্তির কি আছে ?'

জ্ঞানেশ মানিব্যাগ থেকে একটা কার্ড বের করে সুলতার হাতে দিল।

সুলতা বললে, 'আমার ঠিকানা আর টেলিফোন তুমি লিখে নাও। তোমাকে আমি আসতে বলছি না। বলার স্বাধীনতা নেই। তবু এই বিশাল শহরে ডুবে যখন ভেসে উঠেছি, তখন আবার যেন তলিয়ে না যাই ! দুপুরের দিকে তুমি আমাকে ফোন করতে পার নির্ভয়ে। অবশ্য রবিবার নয়।'

'তুমি দেখছি খুব সেকেলে পরিবারে পড়ে গেছ ?'

'ঠিক সেকেলে নয়, আরও সাংঘাতিক। সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত। সুখ আছে স্বাধীনতা নেই। কো-এডুকেশান কলেজে পড়া মেয়ে। কোথায় কি করে বসে আছি !'

জ্ঞানেশ হাসল, 'নারী স্বাধীনতা কথার কথাই হয়ে রইল ? আসলে সেই সোনার খাঁচা। আচ্ছা কল্যাণ তো ক্রীশ্চান ছিল ?'

'হ্যাঁ।'

'ওকে কোথায় কবর দেওয়া হয়েছিল ?'

'প্রিন্‌স আনোয়ার শা রোডের কবরখানায়।'

'সুলতা, আজ আমি তাহলে যাই। সময় সুযোগ মত ফোন করব। একটার পরে, তাই তো !'

'হ্যাঁ। তোমাকে কখন পাওয়া যাবে ?'

'দুপুরে। ধরো একটা থেকে চারটের মধ্যে।'

জ্ঞানেশ গাড়িতে উঠল। এগিয়ে এনে সুলতার পাশে দাঁড় করিয়ে বললে, 'চলো না একদিন দুপুরে কোথাও বেড়িয়ে আসা যাক।'

'তুমি ফোন কোরো।'

জ্ঞানেশ গাড়ি ছেড়ে দিল। বাড়ি খুঁজে বের কবা যতটা সহজ হবে ভেবেছিল ততটা সহজ হল না। এ তল্লাটে বাড়ির নম্বরের কোনও মাথামুণ্ডু নেই। একে তাকে বার বার জিজ্ঞেস করে করে জ্ঞানেশ অবশেষে পার্ল গ্রে রঙেব ছিমছাম একটা বাড়ির সামনে এসে দাঁড়াল। বাইরে নেম-প্লেট। মিস পামেলা বোস। তারপর একগাদা লেখা। বহু সমিতির নাম সংক্ষিপ্ত করে লাগান। ফলে দুর্বোধ্য। বোঝাব চেষ্টা না করাই ভাল। এতে মানুষের দাম বাড়ে না কমে জ্ঞানেশের জানা নেই।

দরজার মাথায় একটা বোতামের তলায় লেখা আছে 'পুশ'। জ্ঞানেশ আদেশ পালন করল।

ভেতরে যেন দমকলের ঘণ্টা বেজে উঠল। এ ধরনের কলিংবেল পৃথিবীর কোন্ দেশে তৈরি হয়। রাবণ মনে হয় এক পিস তৈরি করিয়েছিলেন কুম্ভকর্ণের ঘুম ভাঙাবার জন্যে। রামায়ণী যন্ত্র, খুঁজেপেতে এই বাড়িতে লাগান হয়েছে। ভেতরে যেন দক্ষযজ্ঞ শুরু হয়ে গেল। বন্যার মত এক ঝাঁক কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল দরজার দিকে। জ্ঞানেশ ভুল করে কেনেলক্লাবে চলে এল না কি ! এক বাড়িতে এত কুকুর। এক একটার এক একরকম ডাক। মোটা, মিহি, মাঝারী।

বন্ধ দরজার ওপাশে কোনও এক মহিলা বললেন, 'শাট আপ।'

মন্ত্রের মত কাজ হল। সব কটা কুকুর একেবারে চুপ। দরজায় একটা ম্যাজিক-আই লাগান। কি মনে হওয়ায় জ্ঞানেশ চোখ লাগাল। প্রথমটায় হকচকিয়ে গেল। চোখের সামনে গোটাকতক ফুল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে শব্দ করে হেসে উঠল। বিলিতি মিস্ত্রির কাজ। ম্যাজিক আই উলটো করে লাগিয়ে গেছে। ভেতর থেকে দেখতে পাবার কথা। তার বদলে জ্ঞানেশ বাইরে থেকেই সব দেখতে পাচ্ছে। যা ফুল বলে মনে হচ্ছে তা হল স্বাস্থ্যবতী কোনও মহিলার বুকের ওপর উঁচু হয়ে থাকা শাড়ির আঁচলের ডিজাইন।

দরজা খুলে গেল। সামনেই এক মহিলা। জেমস্-বণ্ড ছবির লাস্যময়ী নায়িকার মতো। দু'

ঠোঁটের মাঝখানে চেপে ধরা টুকটুকে লাল একটি টুথব্রাশ। একমাথা এলো চুল। পেছন থেকে আলো পড়ে চিকচিক করছে। ধারালো মুখ। ফর্সা টুকটুকে গালে ভালবাসার অঞ্জলির মত তিনটে কি চারটে লাল ব্রণ। বেশ-ভুষা মারাত্মক রকমের এলোমেলো। জ্ঞানেশ কোথায় চোখ রাখবে ঠিক করতে পারছে না। নারী শরীর সহসা তাকে কাবু করতে পারে না। অনেক দিন পরে তার ভেতরটা ওলট-পালট হয়ে গেল। ভেতরে অদৃশ্য কোনও ফোয়ারার মুখ যেন খুলে গেছে।

ঠোঁট থেকে ব্রাশ খুলে মহিলা লখ্নৌ-এর গলায় প্রশ্ন করলে, 'বাতাইয়ে।'

জ্ঞানেশ তিন-চার বার ঢোঁক গিলে বললে, 'পামেলা বোস।'

'হ্যাঁ, হ্যায়। কাঁহাসে আপ আয়ে হেঁ?'

হিন্দিতে সুবিধে করতে পারবে না বলে জ্ঞানেশ ইংরেজীতে চলে গেল, 'ফ্রম হার ব্রাদার, সাত্যকি বোস।'

'প্লিজ কাম ইনসাইড অ্যাণ্ড বি সিটেড।'

ভদ্রমহিলা যতক্ষণ স্থির ছিলেন ততক্ষণ জ্ঞানেশ যদিও বা নিজেকে সামলে রেখেছিল কোনওরকমে, তাঁর হাঁটাচলার ছন্দে ভেতরে ভূমিকম্প শুরু হয়ে গেল। একটু উঁচু করে পরা অতি সূক্ষ্ম শাড়ি। কেন যে অন্তর্বাস নেই। বোধহয় সরাসরি স্নানঘর থেকে বেরিয়ে এসেছেন। শরীরের এমন গঠন কদাচিৎ চোখে পড়ে। জ্ঞানেশ মনের চারপাশে একটা বাঁধ তৈরি করেছিল সযত্নে। শক্ত হাতে তৈরি শক্ত সেই বাঁধ সহসা ভেঙে গেল। জ্ঞানেশ বুঝতে পারছে তার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে, কিন্তু কিছুই করার নেই। আগুনে কাগজ পোড়ার মত পড়্পড় শব্দ হচ্ছে ভেতরে।

'আপ বইঠিয়ে।' বলে ভদ্রমহিলা ভেতরে চলে গেল। যত দূর দেখা যায়, জ্ঞানেশ দেখছে, লম্বা করিডর ধরে ভদ্রমহিলা হাঁটছে। শেষপ্রান্তে একটি খোলা দরজা। দরজার ওপারে খোলা জানলা। জানলার ওপারে আলোমাখা সবুজ গাছের পাতা। ভদ্রমহিলা খোলা দরজা দিয়ে দৃষ্টির বাইরে চলে গেল। লালাসিক্ত লম্বা জিভের মত পড়ে রইল ঝকঝকে করিডর। লালসার বিস্তার দেখে জ্ঞানেশ স্তম্ভিত হয়ে গেল। বয়ামে প্রাচীন তেঁতুলের আচারের মত এত পাপও জমা আছে ভেতরে। সংযমের অহঙ্কার কোথায় ভেসে গেল! কুচো কুচো ফুল-ধরান শাড়ি, কোথাও উঁচু কোথাও বড় বেশি নিচু। একই সঙ্গে মধুর নেশার মত চোখের সামনে ভাসছে পর্বত আর উপত্যকা।

গোটাপাঁচেক বিভিন্ন মাপের আর জাতের কুকুর এখানে ওখানে ঠ্যাং ছড়িয়ে বসে আছে অলসভঙ্গিতে। সব কটারই নজর পড়ে আছে জ্ঞানেশের দিকে। কোনও কিছুতে হাত দিলেই ঘ্যাঁক করে উঠবে। কুকুর মানুষের হাতকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারে। চোখকে কি পারে? জ্ঞানেশের চোখ আটকে আছে লম্বা করিডরের শেষ প্রান্তে খোলা দরজায়। ওপাশের রহস্যালোকে কি আছে! পামেলা বোস কত পয়সার মালিক? এমন সুন্দর ঝকঝকে নতুন বাড়ি! যেন রাজভবনের ক্ষুদ্র সংস্করণ!

জ্ঞানেশ চমকে উঠল। দরজা দিয়ে একটা প্যারাম্বুলেটার বেরিয়ে আসছে। ঝকঝকে অ্যালুমিনিয়ামে সকালের আলো ঝিকমিক করছে। যিনি বসে আছেন তাঁর মাথায় এক মাথা বব করা দুধের মত সাদা ধবধবে চুল। অসম্ভব কচি একটি মুখ।

সেই অবাঙালী ভদ্রমহিলা প্যারাম্বুলেটার ঠেলে আনছেন। কাঁধের দু'পাশ বেয়ে চুল ঝুলে পড়েছে সামনের দিকে। দীর্ঘ দুটি বাহুর সৌন্দর্য পদ্মফুলের ডাঁটাকেও হার মানায় এতই সুললিত। সামনে ঝুঁকে থাকার ফলে শরীরের এমন এক অংশ ফুটে আছে, যার দিকে তাকাবার মত মনের জোর জ্ঞানেশের নেই। ওই গোলাপী নরম জগৎ পৃথিবীর আর কোথাও নেই। সৃষ্টি স্বার্থপরের মত তাবৎ মানুষের সীমানার বাইরে এমন এক কাণ্ড করে বসে থাকে, যাকে ধরার জন্যে আকুল হয়ে ভেতরে ভেতরে জ্বলতে হয়। কি এক নেশা ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে

জ্ঞানেশের দিকে। হঠাৎ জ্ঞানেশের মনে হল, এই বাড়িতে তার আসা শেষ আসা নয়। আবাব আসতে হবে। জীবনের ভবিষ্যৎ এক জটিল দিকে মোড নেবে। নির্যাতিব হাসি শুনতে পাচ্ছে, বড় স্পষ্ট।

মহিলা সহ প্যারাম্বুলেটার জ্ঞানেশের সামনে হাত দুয়েক তফাতে থামল। অবাঙালী ভদ্রমহিলা সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে চুল ঝাঁকাল। সমস্ত শরীর নেচে উঠল তালে তালে। কোনও কোনও অংশে সেই কাঁপন ধরা রইল বেশ কিছুক্ষণ।

জ্ঞানেশ একটা ঘোরের মধ্যে রয়েছে। বৃদ্ধা কচি কচি মুখে জ্ঞানেশকে দেখছেন। জ্ঞানেশের হঠাৎ খেয়াল হতেই তাড়াতাড়ি হাত তুলে নমস্কার করল। বৃদ্ধা হাসলেন। এত ছোট ছোট ঝকঝকে দাঁত জ্ঞানেশ কখনও দেখেনি। এক মুখ মুক্তোর মত হাসির সঙ্গে ঝবে ঝরে পড়ছে। পঙ্গু অথচ কি সুন্দর মানসিক আনন্দে রয়েছেন মহিলা!

'আপনার ভাইয়ের নাম সাত্যকি বোস?'

'সাত্যকি! হ্যাঁ, হ্যাঁ, সাত্যকি। সে কোথায়? এই আসে, এই যায়। মানুষ না হয়ে ওব পাখি হওয়াই উচিত ছিল। এমন ডানাঅলা মানুষ আমি খুব কমই দেখেছি!'

বৃদ্ধা ওপর দিকে মুখ তুলে, চোখ ঘুরিয়ে পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা মহিলাকে মৃদু গলায় বললেন, 'নীলা, গো, গেট ইওর বাথ।'

মহিলা মৃদু স্বরে বললে, 'আপ ঠিক হ্যায় তো।'

'হ্যাঁ, বিলকুল ঠিক হ্যায়।'

জ্ঞানেশের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে নীলা চলে গেল ধীবগতিতে। জ্ঞানেশ আব তাকাতে পারছে না। ভেতরটা তার পুড়ে যাচ্ছে। এইভাবে একজন নাবী কোনও পুরুষকে সমুদ্রের মত উদ্বেল করে তুলতে পারে তার ধারণা ছিল না। মানুষ যে সময় সময় এইভাবে প্রার্থনা করতে পারে—'তুমি আমায় সম্পূর্ণ নষ্ট করে দাও', তাও জ্ঞানেশের জানা ছিল না। 'আমি তোমার সঙ্গে নরকেও যেতে প্রস্তুত আছি।'

বৃদ্ধা শিশুর কণ্ঠে হেসে উঠলেন। জ্ঞানেশ চমকে উঠে আত্মস্থ হল।

বৃদ্ধা বললেন, 'আমার সহায়-সম্বল, রাইটহ্যাণ্ড, নীলা সুব্রাহ্মনিযাম। দক্ষিণ ভারতীয় মেয়ে। স্যোসিওলজিতে ডক্টরেট কবেছে। ভীষণ সাহসী। ভীষণ স্মার্ট।'

বৃদ্ধা চোখ বুজিয়ে মাথা ঝাঁকালেন। তারপর চোখ খুলে নেশা নেশা চোখে বললেন, 'আপনি কে?'

কি উত্তর দেবে জ্ঞানেশ ভেবে পেল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'আমি আপনাকে একটা দুঃসংবাদ দিতে এসেছি।'

'দুঃসংবাদ! আমার কাছে কোনও সংবাদই আর দুঃসংবাদ নয়।'

'সাত্যকিবাবু মারা গেছেন।'

বৃদ্ধা ডাইনে বামে ঘাড় ঘোরালেন, তারপর ওপর দিকে মুখ তুলে, জ্ঞানেশের দিকে না তাকিয়ে বললেন, 'যাক, বেঁচে গেছে। হি ওয়াজ এ মিসফিট। সব পুরুষই অপদার্থ, ও ছিল একটু বেশি অপদার্থ। খবরটা শুনে আমি খুব সুখী হলুম। রিয়েলি হ্যাপি। ডোণ্ট মাইণ্ড, একটা সত্য কথা আপনাকে বলি। বাট হু আর ইউ?'

'আপনি আমাকে তুমি বলতে পারেন। আমার নাম জ্ঞানেশ। সাত্যকিবাবু যে বাড়িতে গিয়ে হঠাৎ মারা গেছেন, তিনি আমার শিক্ষক ছিলেন। নাম শিবপদ। তাঁর বড় ভাই কৃষ্ণপদ একজন বড় শিল্পী।'

'আই সি। নাম শুনেছি। ইয়াংম্যান, ক্যান ইউ ডু ওয়ান থিং?'

'বলুন।'

'তুমি আমাকে এই চেয়ার থেকে ওই শোফাটায় সিফট করে দিতে পারো! ডোণ্ট

হেজিটেট। বেশিক্ষণ এটায় বসা যায় না। টেরিবলি আনকমফারটেবল্।'

জ্ঞানেশ একটু হকচকিযে গেল। বৃদ্ধা খুব দামী একটা গরদের শাড়ি পরে আছেন। দেখলেই বোঝা যায় এক সময় পুরুষের মাথা ঘুরিয়ে দেবার মত রূপ ছিল। ভাবলে চলবে না। জ্ঞানেশ উঠে দাঁড়াল। হাঁটুর তলা দিয়ে সাবধানে হাত ঘুরিয়ে জ্ঞানেশ সাবধানে মহিলাকে তুলে সোফায় ধীরে ধীরে বসিয়ে দিল। খুব নরম কিন্তু ভীষণ ভারি শরীর। ব্যায়াম করা শরীর না হলে জ্ঞানেশ বিপদে পড়ে যেত। বেশ একটু দমের অভাব বোধ করছে।

বৃদ্ধা বললেন, 'বোসো। আমার এই শারীরিক দুভার্গ্যের জন্য অপদার্থ কতকগুলো পুরুষ দায়ী। তবু আমি বেঁচে আছি। শুধু বেঁচে নেই, প্রতি মুহূর্তে নতুন জীবন পাচ্ছি।'

'আধ্যাত্মিক শক্তিতে ?'

'নাথিং অফ দ্যাট সর্ট। আই অ্যাম পোলস অ্যাপার্ট ফ্রম স্পিরিচুয়ালিজম। আমার থিওরি হল জীবন ভোগের জিনিস। লিভ এ টোট্যাল লাইফ। আই ম্যারেড ফোর টাইমস, অ্যাণ্ড ওযাজ ডিভোর্সড ইকোযাল টাইমস। আমাব প্রথম স্বামী একজন নর্তক। ফেমাস ড্যানসার। হি ওয়াজ মোর এ উত্তম্যান দ্যান এ ম্যান। দি সেকেণ্ড ওয়ান, একজন আই· পি· এস। ব্লক হেডেড ম্যাসকুলাইন। ম্যান উইদাউট টেস্ট। থার্ড ওয়ান বিদেশী অ্যামবাসাডার। এ কস্টলি টয়। ফোর্থওযান. এ ক্রিমিন্যাল। সাত্যকি ডিসপোজড্ হিম অফ ভেরি ক্লেভারলি। তার আর তালাস পাওয়া যাচ্ছে না দীর্ঘকাল। সাত্যকি কিছু একটা করেছিল, তা না হলে সব সময় ও এত ভয় পেত কেন ? রাতে ঘুমোতে পারত না। স্লিপিং পিলস্ ইভন ফেলড্। আমি জানি না, ও কি করেছিল, বাট দ্যাট বিজনেস টাইকুন ইজ টোট্যালি লস্ট ফ্রম মাই লাইফ। প্রতিটি ডিভোর্স আমাকে ধনী করেছে। নাও, আই অ্যাম প্যারালিটিক বাট এ ভেরি রিচ প্যারালিটিক। শুধু তাই নয়, আমি একজন ইণ্টারন্যাশান্যাল সমাজসেবী। কোনও দিন ম্যাগসেসে অ্যাওযার্ড পেলে ডোণ্ট বি সারপ্রাইজড। তোমার কৌতূহল হচ্ছে ইয়াংম্যান ? শুনতে চাও আমি কি নিয়ে আছি ?



॥ বার ॥

বিশাল কাঁচের জানালা দিয়ে তনু একবার পশ্চিমে তাকাল। জাহাজের সার সার মাস্তুলের মাথার ওপর নীল আকাশ চাঁদোয়ার মত ঝুলছে। একটা চিল অনেকক্ষণ আপন মনে উড়ছে। বহু নিচে একটা বাড়ির সবুজ লন রোদ পোহাচ্ছে। ধবধবে সাদা একটা কাপড় টান টান করে বিছানো।

ঠিক এক ঘণ্টা হল। অমিতাভ বেরিয়ে গেছে। এই সময়টুকু পার করার অপেক্ষায় তনু ছটফট করছিল। টেলিফোনটা রিসিভার থেকে তুলে টেবিলে নামিয়ে রাখল : । অমিতাভ হঠাৎ যদি অফিস থেকে ফোন করে, লাইন পাবে না। এই ঝুঁকিটুকু নেবার জন্যে তনু মনে মনে প্রস্তুত। শিবপদর কাছে তাকে আজ যেতেই হবে। আসার সময় অমিতাভের সামনে কোনও কথাই বলা হয়নি। বউরাই কোলে পিঠে মানুষ করা ছেলেকে এক কথায় বের করে নিয়ে যায়। সুখের সংসারে ভাঙন ধরায়। আজ গিয়ে বৃদ্ধ যদি সেই রকম কিছু ভেবে থাকেন, ভুল ভাঙাতে

হবে। দোষী বউ নয়, দোষী তাঁর নিজের সন্তান।

দরজা লক করে তনু এল নিচে। শরীরে যেমন পরিবর্তন এসেছে, মনেও এসেছে। একটা অস্থির ভাব। বিষণ্ণ মন। মা হবার আগে কি কি হয় তার কিছুই জানা নেই। সব সময় মনে হয়, কেউ তার কাছে থাকুক। প্রাচীন কালের কথা শোনাক। সে যে একা নয়, নিঃসঙ্গ নয় এইটুকু তাকে বুঝতে দেয়। ভীষণ ভয় এসেছে মনে। অকাবণ ভয়। ওই বিশাল ফ্ল্যাটে যতক্ষণ একা ছিল, এই ভর সকালেও তার গা ছমছম করছিল। মনে হচ্ছিল, কেউ তাকে হঠাৎ ছুরি মেরে পালাবে। অমিতাভকেও তার আজকাল ভয় ভয় করছে। মাঝে মাঝে কেমন যেন জন্তুর মত মনে হয়। সভ্য খোলসের ভেতরটা সে দেখে ফেলেছে। সেখানে দেবতা নেই। শূন্য দেউল।

বেশ অক্লেশেই তনু একটা ট্যাকসি পেয়ে গেল। চালক বেশ সুদর্শন এবং ভদ্র। মিটার নামিয়ে প্রশ্ন করল, 'কোথায় যাবেন?'

তনু নির্দেশ দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে আসনে হাত ছড়াতেই, আঙুলে কি একটা ঠেকল? চশমা। একটা চশমা পড়ে আছে আসনের পেছন ঘেঁষে। সোনালী ফ্রেম। চশমাটা তুলে নিয়ে চালককে বললে, 'একটা চশমা পড়ে আছে।'

'চশমা?' পেছন দিকে বাঁ হাত ঘুরিয়ে চশমাটা নিলেন।

'কার চশমা? কে ফেলে গেল বলুন তো?'

একটা সমস্যার ইঙ্গিত পেয়ে তনু বেশ উৎসাহিত হল। প্রশ্ন করল, 'আমার আগে কে উঠেছিলেন?'

সামান্য ভেবে ভদ্রলোক বললেন, 'মনে পড়েছে। আপনি কিছু মনে করবেন, চশমাটা যদি ফেরত দিয়ে আসি? আমি মিটার আপ করে দিচ্ছি। ভাড়া উঠবে না।'

'না না, মনে করব কেন? যাঁর চশমা তিনি হয়তো এতক্ষণ অচল হয়ে বসে আছেন।'

'না, অচল ঠিক হবেন না, মাইনাস লেন্স। চশমা ছাড়া লেখাপড়া চলবে।'

গাড়ি ঘুরে গেল ভিন্ন পথে। কোথায় চলেছে কে জানে? তনু নিজেকে এই মুহূর্তে সম্পূর্ণ ছেড়ে দিয়েছে সময়ের হাতে। চলছে চলুক। এক সময় কোথাও না কোথাও পৌঁছোবে। বেশ একটা গতির আমেজ আসছে। কিছুই আর ভাবতে ইচ্ছে করছে না।

এ রাস্তা, সে রাস্তা করে ট্যাক্সি একটা সাদা রঙের দোতলা বাড়ির সামনে থামল। গাড়ি থেকে নেমে দরজা বন্ধ করতে করতে ভদ্রলোক মৃদু হেসে বললেন, 'একটু বসুন। আমি চশমাটা দিয়ে আসি।'

তনু দেখছে। বাড়িটা বেশি শান্ত। বিষণ্ণ। সাদা রঙ ঘোলাটে হয়ে এসেছে। আর একবার রঙ পড়লে ভাল হয়। বাইরের ঘরের দুটো জানলার একটা খোলা। জানলায় পর্দা নেই। পেছনের আসনে বসে থাকায় তনু ঘরের একটা অংশ দেখতে পাচ্ছে। দেয়ালে একটা অয়েল পেন্টিং সামান্য কাত হয়ে ঝুলছে। ছবিতে একটি যুবক দাঁড়িয়ে আছে। বাড়িটা যত প্রাচীন, ছবিটা তত প্রাচীন নয়। এখনও তেমন অস্পষ্ট, ধূসর হয়ে যায়নি। তনু একটু অবাক হচ্ছিল। এই ধরনের ছবিতে সাধারণত বৃদ্ধ আর বৃদ্ধাকেই দেখা যায়। আলো-আঁধারি ঘর। ছবির যুবক তনুর দিকেই তাকিয়ে আছে। বড় সুন্দর, বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। ছবিতে যে থাকে সে আর দেহে থাকে না। কত অল্প বয়সে মারা গেছে। এই বাড়ি, এই বারান্দা, আজকের এই সকাল সব ছেড়ে শুধু একটি ছবি। সামান্য কয়েক বর্গফুট স্মৃতি। জীবিত থাকলে দরজায় এসে দাঁড়াত। চোখের পাতা কাঁপত।

দরজা খুলে গেল। প্রসন্ন চেহারার এক প্রবীণা সামনে এসে দাঁড়ালেন। তনু দেখেই চমকে উঠল। এক কালের বিখ্যাত গায়িকা। যাঁর ভক্তিমূলক গানের অনুষ্ঠানে এক সময় ভিড় ভেঙে পড়ত। মায়ের সঙ্গে সেই সব অনুষ্ঠানে তনু কতবার গেছে। এখনও কণ্ঠ হারাননি। তবে যুগ এগিয়ে গেছে। ভক্তিও নেই। ভক্তও নেই।

মহিলা চশমাটি হাতে নিয়ে বললেন, 'ফিরে পাবার আশা ছেড়েই দিয়েছিলুম। তুমি আমার ছেলের মতো। ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন।'

তনু আর বসে থাকতে পারল না। নেমে এল। মহিলা স্নেহের দৃষ্টিতে তাকালেন। চোখ দুটো অল্প চিক চিক করছে।

তনু পা ছুঁয়ে নমস্কার করতেই, মহিলা বললেন, 'সুখী হও মা। তুমি কে?'

'আমি যাত্রী। পেছনের আসনের এক পাশে চশমাটা পড়েছিল।'

'তুমি আমাকে চেন মা?'

'খুব চিনি। কত আসরে আপনার গান শুনেছি। আপনার সেই গানটি, আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে, তুমি অভাগারে চেয়েছ, ভোলার নয়। আমার শ্বশুরমশাই আপনার গান শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলেন।'

'আমার ভাগ্য মা। এখনও দু'একজন সমঝদার আছেন।'

ট্যাকসি চালক অবাক হয়ে গেছেন। 'আপনি গায়িকা?'

'হ্যাঁ বাবা। এক সময় আমার গান মানুষে শুনত। এখন ঈশ্বরকে শোনাই নির্জনে।'

ট্যাকসি চালক পায়ের ধুলো নিতে নিতে বললেন, 'এইবার চিনেছি আপনাকে। আপনার রেকর্ড আমাদের বাড়িতে এখনও আছে,এখনও বাজে। সমান আগ্রহে এখনও আমরা শুনি।'

'তার মানে তোমরা এখনও যথেষ্ট মডার্ন হতে পারনি। তোমরা এলেই যখন, একটু ভেতরে এস না। গিরিধারীর প্রসাদ পেয়ে যাও।'

ট্যাকসিচালক তনুর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'আপনার আপত্তি আছে?'

'আপত্তি? এ তো আমার সৌভাগ্য।'

ঘরে ঢুকতেই সেকালের বিখ্যাত গায়িকা আশাময়ী সদর দরজা ভেজিয়ে দিলেন।

'তোমরা কি আমার গিরিধারীকে দেখবে? তোমাদের সে বিশ্বাস আছে, মন আছে? আচ্ছা, তোমাদের দু'জনের নাম জানা হয়নি এখনও।'

ট্যাকসিচালক বললেন, 'আমার নাম অসীম।'

'আমার নাম তনু।'

তনু উত্তর দিলেও, সে তখনও অবাক হয়ে অয়েলপেন্টিং-এর যুবকের দিকে তাকিয়ে আছে।

'কি দেখছ মা অমন করে? চিনতে পারলে, কে?'

'চেনা চেনা মনে হচ্ছে, অথচ ঠিক ধরতে পারছি না। আপনার ছেলে?'

'না রে মা। আমি তো বিয়েই করিনি। উনি হলেন বিখ্যাত গায়ক ডি· ভি· পালুসকর।'

'ও পালুসকর? কিন্তু মাথায় যে সেই টুপিটা নেই।'

'টুপি ছাড়া একটা ছবি ছিল আমার কাছে, সেই ছবিটা দেখে আমার এক গুণগ্রাহী, বিখ্যাত শিল্পী কৃষ্ণপদ এই ছবিটা এঁকে দিয়েছেন। বিখ্যাত শিল্পীর আঁকা বিখ্যাত শিল্পীর ছবি।'

তনু ছবিটার আরও কাছে এগিয়ে গেল। এক কোণে শিল্পীর স্বাক্ষর 'কৃষ্ণ' এখনও স্পষ্ট। তনু বললে, 'শিল্পীই আমার জাসশ্বশুর।'

'আরে তাই না কি! কেমন আছেন তিনি? সাংঘাতিক সঙ্গীত-প্রেমী মানুষ। কত রাত কাটিয়ে গেছেন এই বাড়িতে। কত স্মৃতি জমা আছে জানো? প্রতিটি ইটে ইটে সুর। কি আশ্চর্য দ্যাখো, কত দিনের ছিঁড়ে যাওয়া সুতোকে তুমি আজ আবার জুড়ে দিলে?'

এত পরিচ্ছন্ন ঠাকুরঘর তনু আগে কখনও দেখেনি। তকতকে মেঝে। বেদী। বেদীর ওপর গিরিধারী। মুখে একটা দুষ্টু-দুষ্টু, মিষ্টি হাসি। তনু মেঝেতে বসে পড়ল। কে যেন জোর করে বসিয়ে দিলে। আশাময়ী তাড়াতাড়ি বললেন, 'দাঁড়াও, দাঁড়াও একটা আসন দি।'

শ্বাস ভরে ধূপের গন্ধ নিতে নিতে তনু হঠাৎ বলে ফেলল, 'আসন লাগবে না মা।'

মা সম্বোধনে তার ভেতরটা অদ্ভুত এক আনন্দে ভরে গেল। আশাময়ী স্থির দৃষ্টিতে তনুর দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে ধীরে ধীরে বললেন, 'আমার গিরিধারীর মতো তোমার একটি সন্তান হোক।'

একটু দূরে অসীমও বসে পড়েছে। এই ঘরের পরিবেশে একটা কিছু আছে। একটা চৌম্বক শক্তি। তনুর চোখ বুজে আসছে। গর্ভস্থ সন্তানের সামান্য নড়াচড়াও যেন টের পাচ্ছে। এই আধুনিক, বল্গাহীন শহরে সে আর নেই। চাকচিক্যময় নিজের আবাসস্থলের কথা সে ভুলে গেছে। আফটার শেভিং লোশান মাখা অমিতাভর ফোলা ফোলা ভোগী মুখ তার স্মরণে আসছে না। বহু দূরে চলে গেছে তনু। গিরিধারী হাসছেন মনের আকাশে।

ছোট্ট একটি রেকাবিতে এক মুঠো ধবধবে সাদা নকুলদানা। আশাময়ী বললেন, 'আর তো আমার বিশেষ কিছু নেই। আমাকে যে একটু কষ্টে রেখেছেন। সে যে আর এক আনন্দ। শূন্য তবু পূর্ণ।'

গোটাকতক নকুলদানা তুলে, হাতের মুঠো মাথায় ঠেকাতে ঠেকাতে অসীম বললে, 'আমাকে একটা অনুমতি দেবেন!'

'বলো বাবা।'

'ট্যাক্সি ভাড়াটা আমি ফেরত দিতে চাই।'

'আমি যে ভিক্ষে নিই না বাবা।'

অসীমের চোখে হঠাৎ জল এসে গেল। আশাময়ী কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে গেলেন। অসীম নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'কিছু মনে করবেন না, আপনার সাধনভজন সবই ব্যর্থ হয়েছে।'

তনু চমকে চোখ মেলল। কি বলছেন ভদ্রলোক! কাকে কি বলছেন!

আশাময়ী বললেন, 'তুমি ঠিক ধরেছ। তুমি আমার ভেতরটা দেখে ফেলেছ। আহত অহঙ্কার সেখানে কোমর-ভাঙা সাপের মতো ফণা তুলে দাঁড়াতে চাইছে বারে বারে। আমার গিরিধারীর বাঁশী নয়, নিজের বাঁশীই শুনছি কেবল। এক সময় বড় রাজসিক ছিলুম। সাত্ত্বিক হবার চেষ্টা করছি। থেকে থেকে তামসিকতার কাছে হার মেনে যাচ্ছি।'

অসীম মাথা নিচু করল। 'আমাকে নিজের ছেলের মতো ভাবতে পাবলে কখনই এমন কথা বলতে পারতেন না।'

'কারুর কাছে হাত না পাতার এই অহঙ্কারটুকু আমার থাক বাবা, তা না হলে আমার ওই দুষ্টু ছেলেটার শক্তির পরীক্ষা হবে না। তুমি দাও তাই আমাব চলে। এমন সময়ও আসে, দু'জনে জল খেয়েই দিন কাটাই। মানুষের ভরসা ছাড়তে না পারলে তাঁর ভরসায় পুরোপুরি বিশ্বাস আসে না। দু নৌকো নয়, এক নৌকোতেই পা রাখতে হয় বাবা।'

'আমার মুখ দিয়েই যে আপনার গিরিধারী কথা বললেন না, তা বুঝলেন কেমন করে?'

'তুমি নিজেই জানো বাবা, কথা বলছেন তোমাব দয়া, তোমার করুণা। তাঁব যে কথা নেই শুধু কাজ আছে। তিনি যে শূন্য পূর্ণ করেন, তা এই চোখে দেখা যায় না, কেবল অনুভব করা যায়। এ এমন এক নদী যাতে জল নেই কিন্তু জোয়ার-ভাঁটা খেলে।'

'আমি কিন্তু খুব আপন ভেবেই কথাটা বলেছিলুম।'

তনু একটু বিরক্ত হয়ে বললে, 'বেশ করেছিলেন। কেন তর্কাতর্কি করে পরিবেশটা নষ্ট করছেন? কিছুক্ষণ চুপ করে বসুন না। নিজের ভেতরের কথা শুনুন না।'

অসীম ধমক খাওয়া শিশুর মতো তনুর দিকে তাকাল। তেজস্বী মূর্তি। তনু মা হতে চলেছে, তাই যেন রূপ ফেটে পড়ছে। মুখের চামড়া টান টান, উজ্জ্বল। ধারালো নাকে হীরের নাকছাবি। অসীম মাথা নীচু করে আপন মনে বললে, 'আমার অন্যায় হয়ে গেছে।'

আশাময়ী অসীমের মাথার পেছনে হাত রেখে বললেন, 'আজকালকার ছেলেরা সব রাগী

বাবু।'

তনু বললে, 'এখুনি আপনি সব রাগ জল করে দিতে পারেন।'

'কি ভাবে ?'

'হারমনিয়ামটা বের করে।'

আশাময়ী হাসলেন। মেঝেতে ছোট্ট একটা কার্পেট বিছোতে বিছোতে বললেন, 'শোনো আমি বসছি। যদি সুর একবার লেগে যায়, তোমরা আমাকে থামাবার চেষ্টা করবে না। তোমাদের সময় হলেই উঠে চলে যাবে। আমি কিছু মনে করব না।'

জ্ঞানেশ বললে, 'আমি একটা সিগারেট খেতে পারি ?'

পামেলা বললেন, 'অ সিওর। আমাকেও একটা দিও।'

জ্ঞানেশ দামী সিগারেটই খায়। প্যাকেট খুলে পামেলার দিকে একটা এগিয়ে ধরল। সিগারেটটা হাত বাড়িয়ে নিতে নিতে ভদ্রমহিলা বললেন, 'জীবনটাই ধোঁয়া। স্রেফ উড়িয়ে দাও, পুড়িয়ে দাও।'

'সত্যিই কি আপনি তাই মনে করেন ?'

'না, আমার জীবনটা আমি অন্য নীতিতে চালিয়েছি অ্যাণ্ড পারশিয়্যালি সকসেসফুল।'

'সে নীতিটা কি ?'

'শুনলে তুমি আমাকে ঘৃণা করবে। তবে তোমার ঘৃণা বা শ্রদ্ধায় আমার কিছুই যায় আসে না। সারা জীবন আমি মনে-প্রাণে চেষ্টা করেছি একটা স্ত্রী-মাকড়শা হতে। আকর্ষণ করেছি। আমার ছলাকলার সূক্ষ্ম জালে শিকার কখন আটকে পড়েছে নিজেই জানে না। আমি ধীরে ধীরে একটু একটু করে...।'

শিশুর গলায় মহিলা খিল খিল করে হেসে উঠলেন। এই চড়া দিনের আলোতেও জ্ঞানেশের সারা গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল। এক ভলক ধোঁয়ার আড়ালে মহিলার মুখ। কথা শোনা গেল, 'দ্যাটস অ্যান আর্ট টু স্লোলি কিল এ ম্যান। সব পুরুষই আমার কাছে শিকার। যা শুরু করেছিলুম তা শেষ করে যেতে পারলুম না। ইললাক। যৌবন বড় ক্ষণস্থায়ী। কি যেন নাম বললে তোমার ?'

'জ্ঞানেশ।'

'ইয়েস জ্ঞানেশ। মেয়েরা শুধু ভোগের জিনিস, তাই না ?'

'তা কেন ?'

'শাট আপ, ইউ ফুল। ডু ইউ ওয়ানট্‌ মি টু রিড মাই অটোবায়োগ্রাফি ? ডু ইও নো, আয় অ্যাম অ্যান ইন্টারন্যাশান্যালি ফেমাস উওম্যান। পুতনাম আমার আত্মজীবনী ছাপছে।'

নেকড়ে বাঘ দৌড়ে আসার মতো শব্দ হল। স্কিন কলারের একটা সুইমিং কস্ট্যুম পরে নীলা ছুটে আসছে। লম্বা লম্বা সুগঠিত পা। দুটো লম্বা হাত। সুঠাম শরীরের স্পষ্ট আঁক-বাঁক, 'এনি থিং রং এনি থিং রং! আই ওয়াজ ডুয়িং মাই যোগ।'

জ্ঞানেশ মাটির দিকে চোখ ফিরিয়ে রইল। অতিকায় মাকড়শার শিকার ধরা সে দেখেছে।

পামেলা বললেন, 'সরি টু ডিস্টার্ব ইউ, গিভ মি এ সিপ।'

'আর ইউ অলরাইট ?'

'ইয়েস, আয় অ্যাম এভার রাইট।'

নীলা পেছন ফিরে চলে যাচ্ছে। সে এক দুঃসহ দৃশ্য। জ্ঞানেশের মনে হল সে এক সম্মোহনী শক্তির পাল্লায় পড়ে গেছে। মহিলার চোখের দিকে যত বার তাকাচ্ছে ততই তার চেতন-শক্তি কমে যাচ্ছে। মনে কেমন যেন অদ্ভুত অদ্ভুত সব ঘোলাটে ভাব আসছে। নিজেকে কখনও মনে হচ্ছে পশু, কখনও মনে হচ্ছে ক্রীতদাস। হাতের আঙুলে সিগারেটের আগুনের ছেঁকা লাগতেই

চমকে উঠল। মুখ তুলে তাকাল সামনের দিকে। নীলা সুব্রহ্মনিয়াম করিডরের মাঝামাঝি এসে গেছে। হাতে একটা রূপোলী ট্রে। ছোট্ট দুটো স্ফটিকের গেলাসে বিচিলি রঙের তরল পদার্থ তির তির কাঁপছে। পেছন থেকে আলো এসে পড়েছে দীর্ঘ শরীরে। কপালে চুল পেছনে ধরে রাখার জন্যে সাদা একটা হেয়ার-ব্যাণ্ড। নীলা এগিয়ে আসছে। কাছে। আরও কাছে।



॥ তের ॥

মেরে তো গিরিধর গোপাল
দুসরো ন কোই ॥
জাকে শির মৌর মুকুট
মেরো পতি সোই।
তাত যাত ভ্রাত বন্ধু
আপনো ন কোই ॥

আশাময়ী চোখ বুজিয়ে গেয়ে চলেছেন আপন মনে। ঘরে আরও দুজন বসে আছে, সে খেয়ালই নেই। অন্য জগতে চলে গেছেন। তনু ভাবছে, জগতের মোড়কে কত রকমের জগৎ আছে! দুঃখ আর আনন্দের মাঝখানে মাকড়সার জালের চেয়েও পাতলা এক পর্দা দুলছে। সরালেই সরে সরে যায়। এ যেন এ-ঘর থেকে ও-ঘরে পা ফেলা!

অসীম কেঁদে ফেলেছে। গাড়ি, স্টিয়ারিং, চাকা, রাস্তা, ধুলো, যাত্রী, ভাড়া নিয়ে খ্যাচাখেচি। প্রতিদিনের এই অন্তঃসারশূন্য বেঁচে থাকায় যেন প্রথম বর্ষার জল পড়ল। একটু আগে রেগে গিয়ে সে আশাময়ীকে যা-তা বলেছে। এখন তার পায়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। কি করলে কি হয় কিছুতেই ভেবে পাচ্ছে না। আশাময়ীর মুখের দিকে তাকিয়ে তার বাবে বারে মনে হচ্ছে, মানুষ ভগবানের পর্যায়ে চলে যেতে পারে। সে মানুষের কাছে টাকা, পয়সা, সুখ, দুঃখ, অর্থ, অনর্থ কিছুই কিছু নয়। তাঁর বেঁচে থাকাটা তখন শুধু আনন্দ। সে জীবন তখন বাতাসের মতো বয়ে চলে।

অসীম চোখ বুজলেই সেই দীঘিটা দেখতে পাচ্ছে। তাদের গ্রামের বাড়ির অদূরেই ছিল সেই দীঘি। যার জলে তার মা ডুবে মরেছিলেন এক গ্রীষ্মের দুপুরে। সকলের যখন সন্দেহ হল, সবাই ছুটল দীঘির পাড়ে। অসীমও ছিল সেই দলে। শেষ বেলার ছায়া নেমেছে কালো জলে। ঝিরিঝিরি বাতাস, হৃদয়ের ছোট ছোট স্পন্দনের মতো, ঢেউয়ের চেহারায় একের পেছনে আর এক, গোল হয়ে ঘিরে ঘিরে নেচে নেচে চলেছে। এখনও মনে আছে অসীমের, সাদা কালো, ঠিক সাতটা হাঁস, পাড়ে উঠে ডানা ঝাড়ছে। কেউ তখনও জানে না, গভীরে শুয়ে আছে মৃত্যু, ঝাঁজি আর শাপলার দঙ্গলে, অথচ ওপরে কি অপার শান্তি! অসীম সেই দীঘিটা দেখতে পাচ্ছে। সেই সাতটা হাঁস ডানা ঝাড়ছে। গভীর জল থেকে সন্ধের মুখে মায়েব দেহ যখন তোলা হল, হাতের ওপর মা যেন ভিজে কাপড়ের মত এলিয়ে আছে। সব পাওয়া গেল। কোথাও একটু প্রাণ পাওয়া গেল না। বাবার চরিত্রের কথা ভাবলে তার ভীষণ ভয় করে। তার গাড়িতে বহু রকমের অমানুষ যাত্রী দেখেছে। বাবার মত অমানুষ এখনও চোখে পড়েনি। তিনি

এখন কোথায় আছেন ? কেমন আছেন। জীবিত না মৃত ! তিন বছর আগে নারকেলডাঙ্গার এক বস্তির ধারে রাস্তার কলে এক বৃদ্ধ জল নিচ্ছিল। পরনে ময়লা লুঙ্গি, ছেঁড়া গেঞ্জি। তার বাবার সঙ্গে দেহের আর মুখের অদ্ভুত মিল। অসীম দাঁড়িয়ে পড়েছিল। লাল, ঘোলাটে চোখে লোকটি দু'বার তাকিয়ে, হাতে একটা ভাঙা প্ল্যাস্টিকের বালতি নিয়ে হন হন করে বস্তির মধ্যে ঢুকে গেল। অসীমের ভয় করে। তার চরিত্রেও তো বাবা বসে আছে। অসুস্থ কাম, উদগ্র লালসা নিয়ে। কেমন করে পালাবে অসীম। যেখানেই যাক, ধমনীতে সেই একই রক্তস্রোত।

তনু অসীমের গায়ে আস্তে আঙুলের টোকা মারল। চমকে উঠল অসীম। বহু দূর থেকে ফিরে আসতে হল এক টোকায়। তনু ইশারায় জানাল, এবার উঠতে হবে। আশাময়ী গাইতে গাইতে চোখ মেলে দু'জনের দিকে একবার তাকিয়ে সঙ্গে সঙ্গে চোখ বুজলেন। দেখলেন কিন্তু দেখা হল না। অসীম ছলছলে চোখে তনুব দিকে তাকাল। চোখে জল থাকলে মানুষকে কত পবিত্র দেখায় ! অসীম ফিসফিস করে বললে, 'টাকা রেখে যাব ?'

তনু প্রবল বেগে ঘাড় নেড়ে জানাল, 'না, না।'

মাটিতে মাথা ছুঁইয়ে অসীম ধীরে ধীরে দেহটাকে তুলে দাঁড় করাল।

পামেলা বোস রুপোর ট্রে থেকে একটা গেলাস দু আঙুলে তুলে নিলেন। নীলা ট্রেটা জ্ঞানেশের সামনে এগিয়ে ধরল। জ্ঞানেশ নীলার মুখের দিকে তাকাল। চোখের অদ্ভুত একটা ভঙ্গি করে নীলা ট্রেটাকে জ্ঞানেশের বুকে প্রায় ঠেকিয়ে দিল। ভালো লাগল না জ্ঞানেশের। কেমন যেন একটা উদ্ধত তাচ্ছিল্যের ভাব : ক্লিওপেট্রার কাল কি এখনও শেষ হয়নি ! নীলা বললে, 'টেক ইট, টেক ইট।'

জ্ঞানেশের মোহাচ্ছন্ন আত্মসম্মানবোধ হঠাৎ জেগে উঠল। এই সব পিচ্ছিল মুহূর্তে পায়ের তলায় আস্থার মাটি খুঁজে পাবার একটিই মন্ত্র : নিজেকে প্রশ্ন করা, 'তুমি কে ?' 'তুমি কোন বাপ-মায়ের ছেলে ?'

জানলার দিকে মুখ ফিরিয়ে জ্ঞানেশ বললে, 'নো, থ্যাঙ্কস্।'

নীলা ব্যালে নতর্কীর ভঙ্গিতে হাত দুয়েক পেছিয়ে গেল। তারপর, টান টান সোজা হয়ে বললে, 'ডোণ্ট্ একসাইট হার জেণ্টলম্যান।'

পামেলা গেলাস-ধরা হাতে নীলাকে চলে যাবার ইঙ্গিত করতে করতে বললেন, 'ও নো নো, ডোণ্ট বি ওরিড, নীলা। হি ইজ এ পারফেক্ট জেণ্টলম্যান।'

নীলা নাচের পুতুলের মত ঘুরে গেল। তার চলে যাওয়ার দিকে জ্ঞানেশ আর তাকাতে চায় না। কাল রাতেই সে পড়ছিল যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ। আশেপাশে জীবিত মানুষের সংখ্যা নেই বললেই চলে, যাঁদের কাছে গেলে বিক্ষিপ্ত মনকে বশে আনার কৌশল শেখা যায়। বই-ই এখন গুরু। শ্রীরাম বশিষ্ঠকে বলছেন, শিরা, কঙ্কালগ্রন্থি ও মাংসময় রমণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে যথার্থ শোভার জিনিস কি আছে ? হে জীব ! রমণীর খঞ্জননিন্দিত লোচন, চর্ম, মাংস, রক্ত, এই সব বিশ্লেষণ করিয়া দেখ, যদি ওই সব বস্তু রমণীয় হয় ত উহাতে আসক্ত হও, নতুবা অযথা উহাতে আসক্ত হও কেন ! এখানে কেশ, ওখানে নখ, সেখানে রক্ত এই সবের সমবায়েই ত রমণীর শরীর।

পামেলা বোস ইস্পাত কণ্ঠে বললেন, 'কেমন লাগল'?'

জ্ঞানেশ চমকে উঠল। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে ?'

'এই যে, যে-চরিত্রটা এতক্ষণ আঁকলুম তোমার সামনে। একটি স্ত্রী-মাকড়সা। বুঝলে প্রায় মাঝামাঝি এসে গেছি !'

'কার মাঝামাঝি ?'

'আমার উপন্যাসের। বুঝলে, একটা থ্রিলিং, ব্রেদ টেকিং ফিক্সান। কোথায় কি ভাবে শেষ

করব জানি না। রোজ আমি এগার, বারো স্লিপ টাইপ করি।'

'আপনি কি ভাবে এই সব কথা বলছেন জানি না। আপনার ভাই মারা গেছেন। এই দেখুন, আমি কোথা থেকে কোথায় এসে ডেথ সার্টিফিকেট যোগাড় করলুম!'

'ইউ আর মাই সান। তুমি আমার ছেলের মতো! আমি তোমার মা হতে পারি না!'

'আমার মা সিগারেট খেতেন না, সাত-সকালে মদের গেলাস ধরতেন না।'

'তুমি কি জান, আদিবাসী রমণীরা ধূম এবং মদ্য দুটিই পান করে। সেকালের হিন্দু মুসলিম রমণীরা হুঁকো খেত। টোব্যাকো, ওয়াইন, দুটোই ট্যাবু হল কখন, যখন অন্য পাপ এসে আমাদের গ্রাস করল। ভাইসেস অফ সিভিলাইজেসান। পবিত্রতা ভেতর থেকে বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। দেবতা থাকেন মন্দিরের ভেতরে, বাইরে নয়। আমি কত সন্তানের মা জানো! মেনি চিলড্রেন নিড মেনি ফ্রেণ্ডস। আমাদের একটা অরফ্যানেজ আছে। সারা পৃথিবীতে অনাথ শিশুদের জন্যে আমরা সুখের ঘর খুঁজে বেড়াই। স্নেহময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা। ওই তো দুপাশের দেয়ালে সার সার ছবি ঝুলছে। যাও না দেখে এস। মানুষের পরিচয় তার কাজে। আহারে, বিহারে নয়।'

'সাত্যকি বসু মারা গেছেন।'

'আবার জন্মাবে, আবার মরবে, আবার জন্মাবে, আবার মরবে। এজ ওল্ড প্রসেস।'

জ্ঞানেশ রাগের গলায় বললে, 'কাল থেকে মৃতদেহ পাহারা দিয়ে বসে আছেন আমার বৃদ্ধ মাস্টারমশাই।'

'সকলেই তো আমরা আমাদের মৃত্যু আগলে বসে আছি। ইয়াং ম্যান, রেগে যেও না। আমি ইনভ্যালিড। টেকিং মাই টাইম। লেট নীলা ফিনিশ হার ডেলি মর্নিং-কোর। পুশ দ্যাট বাটন।'

কৃষ্ণপদ হুঁ হুঁ করে গান গাইছে, আর স্টেনলেস স্টিলের কড়ায় স্টিলেরই খুন্তি নেড়ে যাচ্ছে। আজ কুমুকে সে সুক্ত খাওয়াবে। হঠাৎ মনে হল গান গাওয়াটা ঠিক হচ্ছে না। সাত্যকির কথা মনে পড়ে গেল। দিন দিন মনটা কেমন যেন নিরেট ইটের মতো হয়ে যাচ্ছে। কতরকমের অনুভূতি যে মরে আসছে! এই রকমই হয় বুঝি! শিবকে জিজ্ঞেস করতে হবে, তোরও কি এইরকম হচ্ছে! কোনও কিছুই আর মনকে স্পর্শ করছে না! কুমুর মত একটা খেলনা যদি তার জীবনে না থাকত, সারাদিন কি নাড়াচাড়া করত! ভালবাসার কিছু তলানি জীবন নামক এই ঠুনকো গেলাসে এখনও পড়ে আছে। শিবের জীবনে তো কিছুই নেই। ছেলে আর ছেলের বউ খাঁচা খালি করে অন্য খাঁচায় উড়ে গেছে। পূর্ণ শূন্য হয়ে গেলে বড় বেশি শূন্য মনে হয়। নাঃ, শিবটাকে আজ খাওয়াতে হবে। ঘাড় ধরে টেনে এনে জোর করে খাওয়াতে হবে। কোন্ মৃত্যু মানুষ চিরকাল মনে রাখে? যে অতিথি রোজ আসে, তার কি আর তেমন কদর থাকে! কড়ায় জল ঢালার সময় কৃষ্ণ ভীষণ ভয় পায়। এমন ফ্যাঁস করে শব্দ করে! বেশ একটু পেছিয়ে গিয়ে, ডান হাত বাড়িয়ে, চোখ বুজিয়ে কৃষ্ণ জল ঢেলে দিল কড়ায়!

অসীম গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে বললে, 'কি সুন্দর!'

তনু বললে, 'কি সুন্দর?'

'আপনাদের জীবন! আপনারাও মানুষ। আমিও মানুষ! কত তফাত!'

'কোনও তফাতই নেই। সবই বাইরের। আমি সাততলায় থাকি, আপনি হয়তো একতলায়। আমি একটু বেশি আলো-বাতাস পাই। আপনি একটু কম। আমার মনেও যা আছে, আপনার মনেও তাই আছে।'

অসীম হাসল। তনুর মনে হল, হাসলে অসীমকে আরও বেশি সুন্দর দেখায়। গাড়ি ছুটছে

তীব্র গতিতে। অসীম পাকা ড্রাইভার। পথের পাশে একটি মন্দিরের সামনে অসীম হঠাৎ গাড়ি দাঁড় করাল। কালীমন্দির : তনুকে বললে, 'একটু বসুন। যে টাকাটা ওঁকে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছিলুম, মায়ের পায়ে দিয়ে আসি।'

তনু বললে, 'আসুন।'

তনু চোখ বুজিয়ে মায়েব মূর্তি ভাববার চেষ্টা করল। একঝলক আসার পরই এসে গেল অসীমের হাসি হাসি মুখ। তনু একটু বিব্রত হয়ে পড়ল।

বোতামে হাত ঠেকান মাত্রই দূরে কোথাও ঘণ্টা বেজে উঠল। একগাদা চুড়ি-পরা হাত নেচে উঠলে যেমন শব্দ হয়! সব কটা কুকুর একসঙ্গে গা-ঝাড়া দিয়ে উঠল। পামেলা বোস বললেন, 'সিট ডাউন।' সব কটা আবার বসে পড়ল যে যার জায়গায় সামনে পা ছড়িয়ে।

পামেলা বললেন, 'সাত্যকির দেহটাই বুড়িয়েছিল। মনটা ছিল শিশুর মতো। দেবতার পৃথিবী তো এখন শয়তানের পৃথিবী। সাত্যকি এখানকার হিসেব মেলাতে না পেরে সরে পড়ল। হি হ্যাজ ডান দি রাইট থিং। আই উইল সি হিম দেয়ার। শোন ইয়াংম্যান, তোমাকে এখন কি করতে হবে শোনো!'

জ্ঞানেশ বললে, 'বলুন।'

'নীলাব সঙ্গে তুমি আমাদের অরফ্যানেজে যাবে, কেমন?'

'তারপর?'

'সেখান থেকে তুমি আমাদের স্টেশান ওয়াগনটা নেবে। আমাদের সুপরিনটেনডেন্ট ধ্রুবকে নেবে। সোজা চলে যাবে তোমাদের ওখানে। হ্যাণ্ডওভার দি বডি টু ধ্রুব। বাকিটা তার দায়িত্ব। হি ইজ অ্যান এক্সপার্ট। তুমি আবার আমাকে প্যারাম্‌বুলেটারে শিফ্‌ট করো। টেক মি টু মাই স্টাডি। লেট মি রাইট, এ চিট টু মাই ধ্রুব।'

জ্ঞানেশ পামেলাকে সন্তর্পণে হুইল চেয়ারে বসাতেই পামেলা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, 'ও মাই দিস একসপেনসিভ ইনভ্যালিডিটি! ইয়াংম্যান, এভরি থিং ইন দিস লাইফ ইজ এ ফার্স! পুশ!'

জ্ঞানেশ হুইল চেয়ার ঠেলতে লাগল। সেই করিডর। ঝকঝকে মেঝে। মুখ দেখা যায়। সদ্য রঙ করা অফ-হোয়াইট দেয়াল, পামেলা বললেন, 'এই ছবিগুলো তোমাকে দেখতে বলছিলুম। বিদেশী পিতা-মাতার হাতে আমরা অনাথ শিশুদের তুলে দি। আফটার প্রপার ভেরিফিকেসান। এ দেশে যাদের কোনও ভবিষ্যতই নেই, কুকুর, বেড়াল, ছাগল, তাদের ভবিষ্যত তৈরি হয়।'

'স্বদেশী নয় কেন?'

'স্বদেশী?' ছেলেমানুষের গলায় পামেলা হাসলেন, 'এ দেশে, যাদের টাকা আছে, তারা সবচেয়ে বেশি স্বার্থপর। আমাকে যেমন অসুখে ক্রিপল করেছে, এ দেশের ধনীদের তেমনি অর্থ ক্রিপল করে দিয়েছে। মেণ্টালি দে আর রিটারডেড। পুশ, ইয়াংম্যান, পুশ। পুশ মি টু দি এণ্ড অফ দি ওয়ার্লড।'

পামেলা দু হাত দিয়ে মাথার পেছন দিকে রুপোলি চুল ঠেলতে লাগলেন। জালে পড়া মাছের মত একমাথা ছোট করে ছাঁটা চুল চিক চিক করতে লাগল। হেয়ার লোশানের মিষ্টি দামী গন্ধ জ্ঞানেশের নাকে আসছে। মন কেমন-করান গন্ধ। ভদ্রমহিলার ঘাড়ের দিকে তাকিয়ে জ্ঞানেশের মনে হল, কি ভয়ানক ফর্সা। গোটা গোটা মুক্তোর মালা করুণ চোখে জ্ঞানেশের দিকে তাকিয়ে আছে। জীবনের অশ্রু-বিন্দু যেন মালা হয়ে গেঁথেছে।

জ্ঞানেশ ভেবেছিল করিডর যে ঘরেব দরজায় গিয়ে মিশেছে, সেই ঘরেই মহিলাকে নিয়ে যেতে হবে। পামেলা বললেন, 'টার্ন রাইট।'

ডান দিকে ঘুরতেই জ্ঞানেশ মুগ্ধ হয়ে গেল। এত সুন্দর একটা বাড়ির নকশা কার মাথা থেকে বেরিয়েছিল ! করিডর ঘুরে চলে গেছে জাহাজের ডেকের মত রেলিং ঘেরা খোলা এক ছাদে। এদিককার দেয়ালের রঙ আবার হালকা হলুদ। কোথা থেকে গুন গুন করে গানের শব্দ ভেসে আসছে মেয়েলীগলায়।

পামেলা বললেন, 'এবার বাঁ দিকে।'

বেশ বড় মাপের একটি ঘর। প্রচুর আলো বাতাস। একদিকে সেই ডেকের মতো খোলা ছাদ। আর একদিকে বাগান। পরিচ্ছন্ন একফালি সবুজ লন। ঘরে ঢুকতেই সামনের দেয়ালে বিশাল এক অয়েল পেন্টিং। ছবির দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল জ্ঞানেশ। ছবির নারী তার ভীষণ পরিচিত।

পামেলা বললেন, 'সাত্যকির বন্ধু কৃষ্ণপদর আঁকা।'

জ্ঞানেশ বুঝতে পারল, মহিলা আর কেউ নয়, তাঁরই স্ত্রী। পামেলা বললেন, 'তুমি আমাকে ওই টেবিলে সেট করে দাও।'

ফিকে একটা বাতাস বারকতক পায়চারি করে গেল ঘরে। দেখে গেল সব ঠিকঠাক আছে কি না ! টেবিলের ড্রয়ার টানলেন পামেলা। টুংটাং শব্দে ড্রয়ার খুলে গেল। মিউজিক্যাল সিগারেট কেস জ্ঞানেশ দেখেছে। মিউজিক্যাল টেবিল এই প্রথম।

জ্ঞানেশ বললে, 'আমাকে ওই ছাদে যাবার অনুমতি দেবেন ?'

'অফকোর্স ! বড় লোভনীয় জায়গা। শীতের সকাল আর দুপুর আমার ওইখানেই কাটে। যাও দেখে এস। আমি ততক্ষণ চিঠিটা লিখি।'

জ্ঞানেশ খোলা ছাদে এসে দাঁড়াল। একপাশের রেলিং ধরে দাঁড়ালে নিচেই কার্পেট-সবুজ-লন। মাছি গোলাপের বেড দিয়ে ঘেরা। সেই গুন গুন গানের শব্দ আরও স্পষ্ট এবার। ওপাশের ঘরের খোলা জানলায় নীলা। মাথার চুলে হেয়ার ড্রায়ার চালাচ্ছে আর গুন গুন করে গান গাইছে। জ্ঞানেশের সঙ্গে চোখাচোখি হতেই, নাচের মুদ্রার ভঙ্গিতে হাত তুলে জানাল, আসছি।

জ্ঞানেশের ভীষণ হিংসে হচ্ছে। কিছু মানুষ কেন এত সুখে থাকবে ! এরা আবার দুঃখের কারবারী ! অনাথদের নাথ খুঁজে বেড়ায় সারা বিশ্বে ! এই শিশুদের নিয়েই এক সময়ে কাগজে কাগজে খুব হইচই হয়েছিল। সত্য কোথায় কি ভাবে চাপা পড়ে আছে, কে আর সরিয়ে দেখছে ! জ্ঞানেশ গোয়েন্দা নয়, তবু তার কেমন যেন সন্দেহ হচ্ছে ! বাড়িতে তৃতীয় আর কোনও প্রাণী নেই বলেই মনে হচ্ছে, অথচ চারপাশ এত পরিচ্ছন্ন সুন্দর ! এত ঐশ্বর্যই বা এল কোথা থেকে ! এ তো পড়তি বড়লোকের অবস্থা নয়, উঠতি বড়লোকের ব্যাপার।

ঝিন ঝিন করে টেলিফোন বাজছে। পামেলা বোসের মাথার ওপর সুইস ঘড়ির সুদৃশ্য খাঁচা থেকে লাফিয়ে বেরিয়ে এল ছোট্ট একটি পাখি। কুক্‌কু, কুক্‌কু করে এগারবার ডেকে আবার ঢুকে গেল খাঁচায়।

॥ চোদ্দ ॥

শশধরের ভাইয়ের নাম জলধর। যারা ভয় পায় তারা জলো, জলোবাবু বলে ডাকে। যারা তার অশুভকারক বৃত্তের বাইরে তারা বলে জলোগুণ্ডা। পৈতৃক বাড়িটি একতলা। একতলা হলেও বেশ ফলাও। পূর্বপুরুষের অর্থ ছিল। প্রতিপত্তিও ছিল। বাঙালীর বোলবোলা সাধারণত উত্তরপুরুষে বর্তায় না। এক পুরুষেই উড়েপুড়ে শেষ হয়ে যায়। বছর দুয়েকের মধ্যে বাড়িটার সংস্কার না হলে একটা পাশ ধসে পড়বে।

জলোর পয়সা আছে। কাঁচা টাকা। যৌথ সম্পত্তিতে ঢালার ইচ্ছে নেই। কয়লা আর সিমেন্টের কারবার ফেঁদেছে। কিছু চামচা পোষে। আর পোষে বাঘের মত একটা অ্যালসেসিয়ান কুকুর। বয়েসের চেয়ে বয়স্ক দেখায়। সূর্য ডোবার পর জলোও ডুবে যায় রঙিন জলে। কিছু করার নেই। পয়সা হল সাপ। ছোবল মারবেই। ছুঁচ হয়ে ঢোকে। ফাল হয়ে বেরিয়ে যায়। বিয়ে করেনি, প্রয়োজনও নেই। সংসার বড় মিনমিনে, ঘিনঘিনে জিনিস। জীবনের স্বপ্ন ছিল ফুটবল-প্লেয়ার হবে। জার্সি পরে দুনম্বর ক্লাবের হয়ে কিছুকাল দৌড়দৌড়ি করেছে মাঠে। প্রতিভার অভাব। গোলপোস্টের কাছে এলেই, গোলপোস্ট নাচিয়ে মেয়ের মত এমন কোমর দোলাত, বল চলে যেত বাইরে। বহু সুযোগ পেয়েছে একটাও গোল করতে পারেনি। সবাই রসিকতা করে বলত, তুমি গোলে বল ঢোকাবার চেষ্টা না করে, বলে গোল ঢোকাও। কাগজে একবার ছবিও ছাপা হয়েছিল। স্কোরার বা প্লেয়ার হিসেবে নয়। বাপের পয়সা মেরে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিল। বোম্বে গিয়েছিল বচ্চন হতে। প্রায় সব কাগজেই ছবি ছাপা হয়েছিল। বাবা জলধর, ফিরে এসো। মা মৃত্যুশয্যায়। যা করেছ করেছো। কোনও ভয় নেই। বাবা।

গিয়েছিল প্যাসেঞ্জার ট্রেনে। ফিরে এল মালগাড়িতে। যে কটা টাকা পকেট কেটে ছিল, বোম্বে পৌঁছবার একঘণ্টার মধ্যেই সাফ হয়ে গেল। সব জায়গাতেই দাদারও দাদা আছে। বাবা মায়ের ই সি জি করাবে বলে টাকার যোগাড় করেছিল। বাবার দাদা হয়ে জলো ঝেড়ে দিয়েছিল। বোম্বের দাদা দু' আঙুলের ভেলকিতে ফাঁক করে দিলে। মালগাড়িতে চোরাই মালের মত ফেরত আসার পথে জলো চিনেছিল মাল কাকে বলে। কোন্ মালের কি কদর।

এক জ্যোতিষী হাত দেখে বলেছিলেন, কালো আর ছাই ছাই সাদা, ফুঁ দিলে ওড়ে না, ফেললে ওড়ে, নাকে গেলে কাশি হয়। হাতে লাগলে খসখস করে। জলে পড়লে জমে যায়। এমন জিনিসের কারবারে লক্ষ্মীলাভ। আর তোমার পথ স্থলপথ নয়, জলপথ। স্টিম-লঞ্চ চালাবে। আর প্রতি রাতেই তোমার বউ পাল্টাবে। কত বড় ভাগ্য তোমার!

বাড়ির পেছন দিকে ভাঙা একটা ঘর। বাঁশের ঠেকনা দিয়ে পূর্বপুরুষের ছাদকে কোনরকমে অধঃপতনের হাত থেকে ঠেকিয়ে রাখা হয়েছে। এই ঘরেই জলোর সোনার কারবার। টাকায় টাকা ফলছে। জ্যোতিষী বলেছিলেন জল পড়লে জমে যায়। জলো আর একটু জলবৎ করে নিয়েছে। জমে না, গুলে যায়। বস্তার পর বস্তা গঙ্গা-সিমেন্ট। জলপথেই জলো আছে।

পলির কারবার।

চেক চেক লুঙ্গি। স্যাণ্ডো গেঞ্জি। পায়ের ফুটবল এখন পেটে উঠেছে। ছোটখাট একটা ডিস্টিলারি। চোখ দুটো কাতলা মাছের মত। সোনার চেনে সোনা বাঁধানো একটা বাঘনখ ঝুলছে। শত্রুনিধন মন্ত্রে গাঁথা মহামূল্য জিনিস। ঠোঁটে একটা সিগারেট। অন্ধকার অন্ধকার ড্যাম্পঘরে একশো পাওয়ারের একটা আলো জ্বলছে। সিমেন্টের গুঁড়ো লেগে মহাদেবের মত চেহারা হয়েছে বাল্বটার। দুটো জোয়ান ছেলে ঘরের মধ্যে বস্তা চালাচালি করছে। হিঁয়া কা মাল হুঁয়া। আগে জলে দুধ মেশাত। এখন দুধে জল। ভেজাল সিমেন্ট, ভেজাল সিমেন্ট করে লোকে একেবারে হেদিয়ে মরছে। একটু সাবধান হতে হয়েছে। যারা এক-আধ বস্তার খদ্দের তাদের জন্যে ফর্মুলা, আশি, কুড়ি। আর যারা বস্তা বস্তার, তাদের জন্যে চানাচুর। কোনওটা আশি কুড়ি, কোনওটা চল্লিশ ষাট, কোনওটা পঞ্চাশ পঞ্চাশ। আজকাল আবার ছা-পোষা কিছু মধ্যবিত্ত, ঘুপচি, ঘাপচি হেগো ডাঙা, মেগোডাঙা যেখানেই পাচ্ছে সেখানেই একটু খুপরি তুলে বাড়িঅলা হয়ে বসছে। প্রভিডেন্ট ফাণ্ড, বউয়ের গয়না, ইনসিওরেনসের টাকা সব ভিতে ঢেলে, কলার ফাটা জামা পরে, কচু পোড়া আর ভাতের লাঞ্চ খেয়ে, চাতালে বসে আছে জমিদারী মেজাজে। চারপাশে চিল, শকুনের মত পাওনাদার উড়ছে। কেউ ইট সাপ্লাই করেছিল। কেউ বালি। কেউ ঢালাইয়ের লোহা। এই সব অতি সাবধানী খদ্দের সিমেন্টের গুলি বানায়। রাতভর জলে চুবিয়ে রেখে সকালে মেঝেতে আছাড় মারে। ভেঙ্গে গেলেই তেড়ে আসে। কি বোলচাল! তুলে নিয়ে এস তোমার বস্তা।

বুকের ওপর এই বাঘনখ, পেটে চোলাই আব চোখে বাবা ভোলানাথের দৃষ্টি, আর মামারা হাতে না থাকলে, জলোকেই মামারবাড়ি দেখিয়ে দিত এতদিনে। স্রেফ পুজোপার্বণ আর সন্ধ্যাহ্নিকের জোরে চালিয়ে যাচ্ছে।

জলো কথা বলে আস্তে আস্তে। জড়িয়ে জড়িয়ে। ভালো কথা বলছে, কি গালাগাল দিচ্ছে বোঝার উপায় নেই। চুড়িব শব্দে জলো ফিরে তাকাল। ছ্যাতলা পড়া উঠনে বউদি দাঁড়িয়ে। পায়ের পাতা আর গোছ চোখে পড়ছে। কাল থেকে জলো ঘাড় উঁচু করতে পারছে না। দাদাকে ঘাড়ধাক্কা আর গোটা দুই আপার কাট মারতে গিয়ে ঘাড়ে খটকা লেগে গেছে। সিমেন্টের বস্তা মাথায় নিয়ে একজন লগবগ লগবগ করছে। জলো তাকে মুখ খারাপ করল। এমন ভাষা, যা কোনও মহিলার সামনে বলা যায় না। শশধরের স্ত্রীও অবশ্য কম যায় না। মুখ যদি একবার খোলে ভলকে ভলকে আগুন বেরতে থাকে। ফায়ার ব্রিগেডেরও ক্ষমতা নেই থামায়। ওপর থেকে দেখলে যে কোনও পুরুষই আকৃষ্ট হবে। সুন্দর স্বাস্থ্য। মুখ-চোখ ভালো। বেশ একটা চটক আছে; কিন্তু ভীষণ স্বার্থপর এবং নিষ্ঠুর। লোভী, সঙ্কীর্ণ। খুব কাছে এলে, দূরে পালাবার জন্যে মানুষ হাঁকপাঁক করবে। পালানো কিন্তু সহজ হবে না। কাঁকড়ার দাড়া। ধরলে নিষ্কৃতি নেই। ব্যাঙ্কে নিজের নামে একটা অ্যাকাউন্ট খুলেছে। এখান থেকে ওখান থেকে কুড়িয়ে বাড়িয়ে মন্দ জমেনি।

জলো তার জড়ানো কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'কি চাই?'

'এত বেলা হল, এখনও তো এল না!'

'তাতে তোমারই বা কি আর আমারই বা কি?'

'কেন জানি না আমার আজ একটু ভয় ভয় করছে।'

'ভয়! কিসের ভয়! এই দিনের বেলায় তোমার ভয় করছে! হাসালে। যাও যাও চা করে আন তো এক-কাপ।' শশধরের স্ত্রীর নাম গোপা। গোপা শ্যাওলা-ধরা উঠোনে সাবধানে পা ফেলে ফেলে চলে গেল। এলোমেলো, অগোছালো মহিলা। সকালেই পান খেয়েছে। জলো জর্দার নেশা ধরিয়েছে। গোপার হাঁঠাচলার ভঙ্গিতে একটা অসভ্যতা আছে। এ ব্যাপারে খুব একটা সচেতন নয়। লজ্জা-শরমও কম। কোনও দিন তাকে শুধরে দেবার চেষ্টা করেনি। বরং

পুরুষরা গোপার এই দজ্জাল ভাবটা অন্যভাবে উপভোগ করেছে। গোপার চলে যাওয়ার দিকে জলো কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল। যে শাড়িটা পরে আছে, এবারের পুজোয় সেই শাড়িটা জলোই কিনে দিয়েছিল। গোপা জলোর চেয়ে বছর পাঁচেকের বড় হবে। ভেতরে যাবার সময় উঠনের একপাশে পানের পিক ফেলে গেছে। লাল দগ দগ করছে।

সিমেন্টের বস্তা গুনতে গুনতে জলোর হঠাৎ ছেলেবেলার কথা মনে পড়ে গেল। দাদার সাইকেলের সামনে বসে স্কুলে যাচ্ছে। খেলার মাঠ থেকে পা মচকে ফিরেছিল, দাদা চুন-হলুদ লাগিয়ে দিয়েছিল। দুপুরে পাশে বসিয়ে দাদা তাকে অঙ্ক শেখাত। বাবার মৃত্যুর পর, নতুন কাপড়ের টুকরোয় চাবি বেঁধে দাদা তার গলায় ঝুলিয়ে দিচ্ছে। দুজনে একসঙ্গে খেতে বসলে, পরীক্ষা করে দেখতো কার পাতে মাছের টুকরো বড় পড়েছে। নিজেরটা বড় মনে হলে সঙ্গে সঙ্গে তার পাতে তুলে দিত। দাদার কথা ভেবে জলো কেমন যেন হয়ে গেল। উঠনের একপাশে দাদার সেই সাইকেল। দেযালে এলিযে আছে। সাইকেল নিয়ে জলো পেছনের দরজা দিযে বেরিয়ে এল রাস্তায়। চায়ের কথা আর মনেই রইল না। অতীতের কুয়াশা নেমেছে। মনের আকাশে।

সরু গলি। দু'পাশে আবর্জনার স্তূপ। রাস্তাঘাট আজকাল মানুষের মনের মতই হয়েছে। মাঝে মাঝে পত্রপত্রিকায় বিদেশের পথ, ঘাট, জনপদের ছবি দেখে জলোর মনটা কেমন যেন করে ওঠে। সুন্দর পরিবেশে, সুস্থ, সুন্দর জীবনের স্বপ্ন কি ভাবে চুরমার হয়ে গেল! নিজেদের বাড়িটারই কি শোচনীয় অবস্থা! শ্যাওলাধরা উঠন। যত্রতত্র কাপড় জামা শুকোতে দেবার দড়ি এপাশ থেকে ওপাশে চলে গেছে। বউদির অন্তর্বাস আর শাড়ি ঝুলেই থাকে। তোলার কোনও গরজ নেই। আসা যাওয়ার পথে মুখে মাথায় লাগে। মাঝে মাঝে বক্ষবন্ধনী বাতাসে উড়ে মেঝেতে পড়ে থাকে। যেন এই মাত্র কোনও সুন্দরী উন্মোচনী-নৃত্য সেরে সাজঘরে ফিরে গেছে।

সাইকেল নিয়ে বড় রাস্তায় পড়ে, জলোর হঠাৎ মনে হল, দাদাকে শেষ করেছে বউদি। কিছু মেয়ে থাকে যারা সংসারের নয়। জন্মগত ত্রুটি। এক আধ দিন সঙ্গ করা যায়। সংসার করা যায় না। বউদির অশুভ প্রভাব সর্বত্র। একটাই বাঁচোয়া, ছেলেপুলে হল না। হলে কি হত! কে মানুষ করত!

সত্যর চায়ের দোকানে সকালে এক জাতের খদ্দের, রাতে আর এক জাতের। জলো সাইকেল থেকে না নেমে, রাস্তায় পা ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'দাদা কাল এসেছিল?'

'এসেছিল।'

'খেয়েছিল?'

'খেয়েছিল।'

'তারপর?'

'তারপর? দ্যাখো কোন্ মেয়েছেলের ঘরে গিয়ে পড়ে আছে।'

দোকানে গোটা চারেক আধবুড়ো লোক বসেছিল। সত্যর কথা শুনে তারা দাঁত বের করে হাসতে লাগল। জলোর সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে গেল। অন্য দিন হলে এমন হত না। এতকালের বিকর্ষণে আজ যেন আকর্ষণের জোয়ার লেগেছে। দাদার ক্ষত-বিক্ষত করুণ মুখ চোখের সামনে ভাসছে।

জলো ধীরে ধীরে সাইকেল থেকে নেমে পড়ল। চরম উত্তেজনার মুহূর্তে ধীর স্থির থাকাই জলোর স্বভাব। তার ভিতরে একটা চিতা বাঘ আছে। প্রয়োজনে জেগে ওঠে। সাইকেলটাকে স্ট্যাণ্ডে খাড়া করে রাখল। চায়ে চিনি গোলাতে গোলাতে সত্য দাঁত বের করে হাসল। সত্য এক সময় একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোরে সেলসম্যানের কাজ করত। চুরির দায়ে চাকরি যায়। সেই পয়সাতেই চায়ের দোকান দিয়েছে। সকালের চেয়ে রাতের রোজগার বেশি।

জলো ধীরে ধীরে দোকানে ঢুকল। পেছন দিক থেকে সত্যর ঘাড়টা খপ্ করে চেপে ধরল। চায়ের কাপটা উলটে অ্যালুমিনিয়ামের থালায় কাত হয়ে গেল। সত্যকে পেছন দিকে টেনে এনে, জলো দাঁতে দাঁত চেপে বললে, 'কি বললে ? আর একবার বলো। মেরে তোমার থোবনা ঘুরিয়ে দোব। শালা হারামির হাতবাক্স।'

সত্য ঘাড় ঘোরাতে পারছে না। জলোর দু আঙুলের প্রচণ্ড চাপে চোখ দুটো ঠেলে বেরিয়ে আসছে। কিছু একটা বলার চেষ্টা করছে। গলা দিয়ে স্বর বেরোচ্ছে না। জলো একবারই কথা বলেছে। এখন সে নীরব। সত্যকে টানতে টানতে দোকানের বাইরে নিয়ে এসেছে। যারা দাঁত বের করে হাসছিল তারা একে একে সুটসুট করে দোকান থেকে বেরিয়ে পালাল। জলোর একবার মনে হয়েছিল, পেছনে পা ঘুরিয়ে কষে একটাকে লাথি মারে। অতি কষ্টে সে ইচ্ছা দমন করতে হল।

সত্যর মুখটা পাশের নর্দমায় চেপে ধরারই ইচ্ছে ছিল জলোর। নর্দমার মতো মুখে নর্দমার জল ঢুকুক। খানিকটা নাকানি-চোবানি হোক।

সত্য অতি কষ্টে বললে, 'ক্ষমা করে দাও। এবারের মতো ক্ষমা করে দাও।'

জলো শীতল গলায় বললে, 'তুমি আমার দাদার চরিত্র জানো ?'

'জানি '

ঘাড়ে ঝাঁকানি মেরে জলো বললে, 'কি জানো !'

'ওই সুন্দরী বিধবাটার পেছন পেছন ঘুরছে, কে না জানে !'

'কোন্ বিধবা ?'

'ওই যে দেবী যার নাম। যার স্বামী অ্যাকসিডেন্টে মারা গেল।'

'কে বলেছে ?'

'সবাই জানে। তুমিও জান।'

সকালের রাস্তা। লোক জড়ো হয়ে গেছে। সবাই দেখছে। এরপর প্রশ্ন শুরু হবে। পারিবারিক কেচ্ছা বেরিয়ে পড়বে সকলের সামনে। জলো দেবীকে চেনে। দাদা ও বাড়িতে যায় আসে, তাও জানে। শেষ ঝাঁকানি মেরে সত্যর ঘাড় ছেড়ে দিল। সত্য টাল খেয়ে পড়ে যেতে যেতে নিজেকে সামলে নিল। ঘাড় ছিঁড়ে যাবার মতো হয়েছিল।

জলো সাইকেলের দিকে এগোতে এগোতে সত্যর দিকে একবাব ফিরে তাকাল; সত্যর চোখে জল এসে গেছে। সত্যর ঘাড়ে যত না লেগেছে, তার চেয়ে ঢের বেশি লেগেছে মনে। এইভাবেই তাকে বেঁচে থাকতে হবে। কখনও পুলিসের ধোলাই। কখনও পাবলিকেব ধোলাই। নরকের দরজার চৌকিদার হয়ে দগ্ধে দগ্ধে বেঁচে থাকা।

সত্যর চোখে জল দেখে জলোর সমস্ত রাগ নিমেষে উড়ে গেল। জলোর স্বভাবই এইরকম। দপ করে জ্বলে উঠে, দপ করে নিবে যাওয়া। তাব শত্রুর সংখ্যা যত, বন্ধুর সংখ্যাও তত। যার জন্যে করবে, জীবন লুটিয়ে দেবে। যার সর্বনাশ করবে, তাকে একেবারে শেষ করে দেবে। কখনও দানব, কখনও দেবতা।

জলো ফিবে এল। চায়ের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে সত্য চোখ মুছছে।

জলো পিঠে হাত রেখে বললে, 'লেগেছে ?'

সত্য ঘাড় নেড়ে জানাল, 'না।'

'এক কাপ চা খাওয়াবে ?'

সত্য ঘাড় নেড়ে জানাল, 'হ্যাঁ।'

জলো দোকানের বেন্‌চে বসে বাইরের দিকে তাকাল। থমকে থাকা ভিড় ধীরে ধীরে পাতলা হয়ে আসছে। মজা তেমন জমল না। সবাই ভেবেছিল, আরও কিছু দূর এগোবে। সত্যকে সবাই জব্দ করতে চায়। পারে না। ক্ষমতা নেই।

জলো বললে, 'জানো ? দাদা কাল রাত থেকে এখনও বাড়ি ফেরেনি। মনটা বিশ্রী হয়ে গেছে।'

গাঢ় এক কাপ চা জলোর সামনে ধরে দিতে দিতে সত্য বললে, 'তুমি ওই মহিলার বাড়িতে একবার খোঁজ কর।'

'বাইরের লোকের সামনে তুমি ফট করে অমন একটা কথা বললে ! মাথায় রক্ত চড়ে গেল।'

'জানো তো চায়ের দোকানে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলে। তোমার দাদা, তুমি কেউই বাদ যায় না।'

'আমি ! আমাকে সবাই চেনে। আমিও সকলকে চিনি।'

'তোমার বউদিকে ধরে টানাটানি করে।'

'তাদের নাম বলতে পার ?'

'ক'জনের নাম বলব ?'

'বুঝেছি।'

জলো উঠে পড়ল। আবার সেই দানবটা জাগছে। চায়ের কাপ পড়ে রইল।

'কি হল ? চা পড়ে রইল !'

কোনও জবাব না দিয়ে জলো সোজা সাইকেলে গিয়ে উঠল। একটা নয়, পর পর গোটাকতক লাশ ফেলতে হবে। ভয়ই হল মধ্যবিত্তদের শাসনে রাখার রাজদণ্ড। গত ছ'সাত বছরের জীবনে জলো এই সত্যটি আবিষ্কার করে ফেলেছে। যত লপচপানি মুখে। বেদ, বেদান্ত, গীতা, ভাগবত, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ। বেশির ভাগই ভেড়ুয়া।

জলো সিগারেটের দোকানের সামনে সাইকেল থামাল। সিগারেট ধবাতে ধরাতে ভেবে নিলে, এখন সে কি করবে ! লোহা গবম থাকতে থাকতেই ঘা মারা উচিত। দেবীকে পাড়া ছাড়া করতে হবে। যে সব মেয়েরা অন্যের ঘর-সংসার ভেঙে দিতে চায়, তাদের একটু টাইট দেওয়াই উচিত। তাছাড়া দেবীর বাড়িঅলা একটা টোপ ফেলেই রেখেছে। দেবীদের কোনও ভাবে উঠিয়ে দিতে পারলে জলোকে একটা লরির পারমিট আর ব্যাঙ্ক-লোনের ব্যবস্থা করে দেবে। মন্দ কি ? টাকাব নেশার চেয়ে বড নেশা আর কি আছে ! সারা জীবন মানুষকে বুঁদ করে রাখতে পাবে।

তোতা বললে, 'মা, তুমি কি একটু দুষ্টু হয়ে গেছ !'

দেবী স্নান করে এসে চুল ঝাড়ছিল। ভিজে কাপড়ে একটু উঁচু করে পরা। শরীরের সঙ্গে সেঁটে আছে। জায়গায় জায়গায় সোনার বর্ণ ত্বক ফুটে বেরচ্ছে। ঈশ্বর দেবীকে রূপ দিয়েছিলেন ; কিন্তু ভাগ্যটা কেড়ে নিয়েছেন।

মাথা ঝাঁকিয়ে বিশাল কেশভার পিঠের দিকে দুলিয়ে দিয়ে দেবী বললে, 'কেন ?' একটু শঙ্কিতও হল। মেয়ে বড় হচ্ছে। স্বল্প বেশভূষায় তার সামনে দাঁড়ানোয এই মন্তব্য নয তো !

তোতা বললে, 'আমার অসুখ সেরে গেছে, তবু তুমি আমাকে দাদার কাছে যেতে দিচ্ছ না। একা একা যাচ্ছ। একা একা আসছ।'

মেয়ের দিকে পেছন ফিরে শায়া পরতে পরতে দেবী বললে, 'যাবি, যাবি, তোর দাদা যে ভীষণ ঝামেলায পড়েছেন।' তোতা মায়ের অনাবৃত পিঠের দিকে তাকিয়ে বললে, 'মা, তুমি কি সুন্দর !'

'তুই যে আমার চেয়েও সুন্দর।'

ড্রেসিং টেবিলের আয়নায় তোতা আর দেবী, দু'জনেরই প্রতিফলন। একের পাশ থেকে আর এক মাথা তুলেছে বৃক্ষের শাখার মতো। তোতার প্রতিফলিত মুখের দিকে তাকিয়ে দেবীর

সেই ভীষণ দুশ্চিন্তাটা আবার ফিরে এল। পাখির বাসায় ছানার মতো চিন্তাটা বসেই আছে। মাঝে মাঝে চিঁ চিঁ করে ওঠে। তোতাও একদিন দেবী হয়ে উঠবে। তারপর!

জলো বাড়ির সামনে সাইকেল থেকে নামল। ইচ্ছে করেই দুবার বেল বাজাল জোরে জোরে। যেন শমন এসেছে। প্রথম থেকেই সে চড়া সুরে ধরতে চায়। তা না হলে মেয়েরা বড় দুর্বল করে দেয়। ফুল! ফুল ছিঁড়তে হয়।



॥ পনের ॥

দামী ক্রিম রঙের কাগজে কালো কালিতে, ছোট ছোট অক্ষরে পামেলা বোস অরফ্যানেজের ধ্রুবকে চিঠি লেখা শেষ করলেন। দু ভাঁজ করে মনোগ্রাম আঁকা একটা খামে ভরে, আঠা দিয়ে মুখ আটকে দিলেন। সাবধানী মহিলা। চিঠিটা যাকে লেখা সে-ই শুধু পড়বে। টেবিলের পাশে লাগানো কলিং বেলের বোতাম টিপলেন তিনবার। কৌক কৌক শব্দ হল ঘরের বাইরে।

জ্ঞানেশ অন্যমনস্ক ছিল। তাকিয়ে ছিল সবুজ লনের দিকে। দুটো কাঁটা বুলবুলি ওড়াউড়ি করছে। ঝুঁটিন নাচিয়ে মাঝে মাঝে ডেকে উঠছে। ছোট ছোট পোকা উড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়ছে। বেশ লাগছিল দেখতে। এই অশান্ত পৃথিবীতে ছোট ছোট সব শান্তির কোণ আছে। ক্ষুদ্র এলাকা ঘাপটি মেরে বসে আছে এখানে ওখানে। সন্ধান করে নিতে হয়।

জ্ঞানেশ ছাদ ছেড়ে ভেতরে আসার জন্যে পা বাড়াল। বেল শুনে নীলা করিডর ধরে তাড়াতাড়ি আসছে। সাজ পোশাক হয়ে গেছে। জ্ঞানেশ থমকে দাঁড়াল। নীলা আড় চোখে একবার তাকাল। এখন আর তেমন উগ্র লাগছে না। জ্ঞানেশের হঠাৎ মনে হল, নীলার কোনও অপরাধ নেই। নিজেকে সে সোচ্চার করতে চায় না। যার যেমন ধরন। ত্রুটি জ্ঞানেশের। পাপ ঘাপটি মেরে বসে আছে নিজের ভেতরে। চশমার কাঁচের রঙ যেমন হবে, জগতের রঙও ঠিক সেই রকম হবে। জ্ঞানেশ কথামৃত পড়ে। মরুক বাঁচুক, জল হোক ঝড় হোক একটা পরিচ্ছেদ সে পড়বেই। ঠাকুরের বলা সেই গল্পটা তার মনে পড়ল। অন্ধকার প্রান্তরে একটা ঢিবি। প্রথম রাতে একজন মাতাল ফিরছে টলতে টলতে। দূর থেকে ঢিবিটাকে দেখে ভাবলে আর এক মাতাল। নেশায় বুঁদ হয়ে মাঝ মাঠে বসে আছে। জড়ানো গলায় বললে, কি বাবা, টেনে বসে আছ টং হয়ে! ঢিবি নিরুত্তর। মধ্য রাতে এক চোর ফিরছে। দূর থেকে দেখে ভাবলে, আর এক চোর। পাশ দিয়ে যেতে যেতে বললে, কি বাবা, ঘাপটি মেরে বসে আছ! শেষ রাতে এলেন এক সাধু। তিনি বললেন, বাঃ, ধ্যানে বসে গেছে! একেবারে সমাধিস্থ! আর আমি এখনও ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। সাধু সঙ্গে সঙ্গে বসে পড়লেন ধ্যানে।

পামেলার দরজায় দাঁড়িয়ে নীলা ইশারায় জ্ঞানেশকে ডাকল। ইংরেজীতে বলে, প্যারাগন অফ বিউটি। এই মুহূর্তে নীলাকে জ্ঞানেশের তাই মনে হচ্ছে। হাল্কা নীল রঙের সিল্কের শাড়ি। দুধের মত সাদা হাতাকাটা ব্লাউজ। সোনালী চুলের ঢেউ খেলছে পিঠে। একমাত্র বিদেশিনীদেরই এই রকম চুল হয়। নীলার মা নিশ্চয়ই ইউরোপীয়। সেই কারণেই নীলা এত ফ্রি। জ্ঞানেশের গড়িমসি দেখে নীলা বললে, 'প্লিজ হারি আপ জেন্টলম্যান।'

জ্ঞানেশ মুচকি হেসে এগিয়ে গেল। পামেলা বোস চেয়ারে বসে বসেই চারপাশে হাত ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ঘরে সেন্ট স্প্রে করছেন। মৃদু মিষ্টি গন্ধে ঘর ভরে গেছে। দরজায় জ্ঞানেশকে দেখে পামেলা বললেন, 'এসো, এসো। এরই মধ্যে তোমাকে আমি ভালোবেসে ফেলেছি, মাই ডিয়ার স্যার। সব ইনস্ট্রাকশান আমি দিয়ে দিয়েছি। তোমার তো গাড়ি আছে?'

'হ্যাঁ।'

'তাহলে নীলা আর গাড়ি বের করছে না। তোমার গাড়িতেই নিয়ে যাও।'

'কোথায় যেতে হবে?'

'ঠাকুরপুকুর। আর দেরি নয়। বুঝলে জ্ঞানেশ এইবার আমার মন খারাপ হচ্ছে। ফিলিং ভেরি মাচ ডিপ্রেস্‌ড। বুঝলে, পৃথিবীতে রক্তের সম্পর্কে আর কেউ রইল না। লাইফস লাস্ট জার্নি ইজ বেটার মেড অ্যালোন। আর কি! দীর্ঘপথ তো পাড়ি দিয়েই এলুম, থোড়ি হ্যায় বাকি, থোড়ি কে লিয়ে তাল নেহি ছোড়ি। শোনো ইয়াংম্যান, সাত্যকিকে এখানেই যেন নিয়ে আসে। শেষ দেখা একবার দেখতে চাই। যাদের নিয়ে জীবন শুরু করেছিলুম, তারা একে একে মাগিছে বিদায়। না। নো মোর সেন্টিমেন্ট।'

জ্ঞানেশের হাতে ছোট্ট একটা টোকা মেরে নীলা বললে, 'লেট আস গো।'

গাড়ির পেছনের দরজা খুলে জ্ঞানেশ বললে, 'প্লিজ গেট ইন।'

'না, আমি সামনেই বসব। আপনার পাশে।'

জ্ঞানেশ হাসল। সামনের দরজা খুলে বললে, 'আসুন।'

'আসুন' বলে জ্ঞানেশ উদাস দৃষ্টিতে সামনে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইল। নীলা যখন বসবে, তখন তার দিকে সে তাকাতে চায় না। আবার মন দুর্বল হয়ে পড়তে পারে। দেহের কিছু কিছু আকর্ষণের কাছে মহাযোগীরাও পরাভূত হয়েছেন। মনে গুন গুন করছে বহুশ্রুত সেই গানের লাইন, তেরা মন বড়া পাপীরে সৈঁইয়া! গাড়ির দরজা কতটা জোরে বন্ধ করতে হয় নীলা জানে। দরজার লক মৃদু অথচ নিশ্চিত ভাবে লেগে যাবার শব্দ করল। দু'হাত তুলে মাথার চুল ঠিক করতে করতে নীলা বললে, 'স্টার্ট।' অতি দামী সুগন্ধীর সুবাস আলতো ভাবে জ্ঞানেশের নাক ছুঁয়ে গেল। বড় মন কেমন করান, সন্নিকটের ডাক দিয়ে যাওয়া সুরভী। কাছে এসো, আরও কাছে। মনের জোর আছে জ্ঞানেশের। পার্শ্ববর্তিনীর দিকে একবারও ফিরে তাকাল না। কিছু ভালোলাগার বস্তু দূরে থাকাই ভাল। গাড়ির সেল্‌ফ চাবুকের মতো কাজ করছে। ছোঁয়া মাত্রই প্রাণ প্রতিষ্ঠা হল। জ্ঞানেশ বললে, 'আপনি আমাকে পথের নির্দেশ দেবেন।'

'অ সিওর। ড্রাইভ স্ট্রেট।'

'ভদ্রলোককে আপনি চিনতেন?'

'অবশ্যই। এ ফানি জেন্টলম্যান। হি হ্যাড ফ্যানটাসটিক ড্রিমস। স্বপ্নের মানুষ। শুনেছি এক সময় বন্যপশু রপ্তানী করতেন। লজ বিকেম স্ট্রিকটার অ্যাণ্ড হি কয়েল্‌ড আপ হিজ একসপোর্ট বিজনেস। দেন হি বিকেম এ গ্লোব-ট্রটার। ওঁর সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব গল্প শুনতে শুনতে আমার রাত ভোর হয়ে যেত। আই উইল মিস হিম ভেরি মাচ। অ্যাণ্ড হি উইল মিস দিস ওয়ার্লর্ড ব্যাডলি। টার্ন রাইট।'

জ্ঞানেশ যা ভেবেছিল তা নয়। মহিলা বেশ মিশুকে। নিজের সৌন্দর্য, অপরিসীম আকর্ষণ সম্পর্কে আদৌ সচেতন নন। জ্ঞানেশের টেনসান প্রায় কেটে এসেছে। নীলার হাঁটুর ওপরে গাড়ির খোপে জ্ঞানেশের গগল্‌স। গাড়ি চালাতে চালাতে বাঁ হাতটা বাড়িয়ে দিল।

নীলা বললে, 'কি চাই?'

'আমার গগল্‌স।'

'দিচ্ছি। ওয়েট।'

অসাবধানে জ্ঞানেশের হাত মসৃণ শাড়ি ছুঁয়ে গেল। কলাগাছের বাকল ছাড়াবার সময় যেমন

গা-সিরসিরে একটা শব্দ হয়, মনে সেই রকম একটা অনুভূতি উঠেই মিলিয়ে গেল।
নীলা চশমাটা এগিয়ে দিতে দিতে বললে, 'অমন সুন্দর চোখ রঙীন চশমায় ঢেকে দেবেন ?'
'থ্যাঙ্কস ফর দি কমপ্লিমেন্ট।'
'আজকাল লিভিং আইজ কম দেখা যায়। ভেরি রেয়ার।'
'আপনিও খুব সুন্দর। একেবারে গ্র্যামেটিক্যালি পারফেক্ট।'
'ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।'
'সে-জন্যে আপনার কোনও অহঙ্কার নেই।'
'আই বিলিভ ইন গড। দিস ইজ হিজ গিফ্ট। আমি শুধু বয়ে বেড়াচ্ছি। অহঙ্কার একটা ফুলিশ অ্যাক্ট। আমি জানি বাইরেটা বেশি দিন থাকবে না। ভেতরটাই সব।'
'জ্ঞানীর কথা।'
'সেই জ্ঞান যার যত তাড়াতাড়ি হয়, তার তত ভালো।'
'ক'জন আর নিজের জীবনদর্শন গড়ে তুলতে পারে!'
'তা ঠিক । সবাই বলে মানুষ হও, মানুষ হও। অথচ মানুষ হওয়া কাকে বলে জানা নেই।'
'সকলেই একটা জায়গায় পৌঁছতে চায়। কিন্তু জায়গাটা জানা নেই। সবাই ছুটছে। কোথায় ছুটছে ?'
'নো হোয়্যার ।' নীলা ফিনফিনে শব্দ করে হেসে উঠল। 'টার্ন লেফট।'
জ্ঞানেশ বাঁদিকে গাড়ি ঘোরাল। দু'সারি গাছের মধ্যে দিয়ে চলে গেছে সোজা রাস্তা। এতক্ষণে একটু সবুজের ছোঁয়া পাওয়া গেল। হঠাৎ চারটে লাইন মনে পড়ে গেল :

Magnificient! Magnificient!
No one knows the final word.
The Ocean bed's aflame,
Out of the void leap wooden lambs.

নীলা জিজ্ঞেস করলে, 'কি করেন আপনি ?'
রাস্তার দিকে চোখ রেখে জ্ঞানেশ বললে, 'ব্যবসা।'
'বড় ?'
'মাঝারি।'
গাড়ির মিটারের দিকে তাকিয়ে জ্ঞানেশের মনে হল, কয়েক লিটার তেল ভরে নিলে ভাল হয়। বাঁ দিকেই একটা পেট্রল পাম্প। গোঁত করে গাড়িটাকে ঢুকিয়ে দিল।

অসীম ধীরে ধীরে গাড়ি চালাচ্ছিল। তনু ঘড়ি দেখে মনে মনে ছটফট করে উঠল। বেশ দেরি হয়ে গেল। ইতিমধ্যে অসীম বেশ আপন হয়ে গেছে। যেন কত দিনের চেনা বন্ধু। এ এক অদ্ভুত ব্যাপার। কেউ কয়েক ঘন্টার মধ্যে আপন হয়ে যায়। কেউ আবার সারা জীবনেও, দূর, বহু দূর। অমিতাভকে কিছুতেই যেন খুব আপন ভাবা যায় না! দু'জনের মাঝখানে পাতলা একটা স্টিলেব পর্দা ঝুলছে।
তনু সামনের দিকে সরে গিয়ে অসীমের ঘাড়ের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে তার স্বভাবসিদ্ধ মিষ্টি গলায় বললে, 'একটু জোরে চালাবেন!'
অসীম এক মুখ হেসে বললে, 'আপনার খুব দেরি হয়ে গেল দিদি!'
তনু খুবই অন্যমনস্ক। দেহ যেন ভেসে চলেছে স্বপ্ন-জগতের হিজিবিজির মধ্যে দিয়ে। মন উড়ে চলে গেছে অন্য কোথাও, অন্য কোনও খানে। আপন মনে বললে, 'আমাকে যেতে হবে। খুব তাড়াতাড়ি যেতে হবে।'
অসীম বললে. 'কেমন যেন হয়ে গেছি। একটা জীবন যে আর একটা জীবনকে এই ভাবে

প্রভাবিত করতে পারে, এ অভিজ্ঞতা আগে আর কখনও আমার হয় নি। এই শব্দ, এই গতি আমার আর ভাল লাগছে না। গিরিধারীর মূর্তির দিকে আপনি ভাল করে তাকিয়েছিলেন ?'

'হ্যাঁ, আমি তো ওইদিকে তাকিয়েই বসেছিলুম। কি সুন্দর !'

'সত্যিই কি সুন্দর ! যেন জীবন্ত। অথচ সামান্য এক খণ্ড পাথর। আমি যাব। আবার যাব।'

'আমিও আবার আসব।'

'তখন আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে যেতে পারে।'

'হয়ত পারে।'

অসীম বাঁক নিল। গাড়ির গতি একটু বাড়িয়েছে। গন্তব্য স্থল যত এগিয়ে আসছে, চাপা উত্তেজনায় তনুর ভেতরটা কেমন যেন করছে ! সেই শ্রদ্ধেয়, উদাস মানুষটির সামনে গিয়ে তাকে দাঁড়াতে হবে। যাঁর মুখ ঋষির মতো। শিশুর মত এক মাথা এলোমেলো রুপালি চুল। গৌরবর্ণ চওড়া বুকের তলায় এত বছর বেঁচে থাকার দুঃখ-সুখের পোড়া ছাই। দুটো চোখে সুদূরের দৃষ্টি। বিয়ের আগে, ধান, দূর্বা আর সোনা দিয়ে আশীর্বাদ করবার সময় তনুর মাথায় যখন হাত রেখেছিলেন, সারা শরীর যেন শীতল হযে গিয়েছিল। মনে হয়েছিল শান্তির হিম প্রবাহ নেমে আসছে। এমন মানুষ তনু দেখেই নি, যিনি গরমে ঘামেন না, শীতে কাঁপেন না। সমস্ত অভিযোগ, সমস্ত বেদনা আর অভিমান যাঁর হাসি হয়ে ফুটে ওঠে ঠোঁটের কোণে।

অসীম বললে, 'আপনি খুব পয়া। আপনার জন্যেই আমার এই অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হল। মানুষই ঈশ্বর।'

'আমার জন্যে নয়। চশমার জন্যে হল।'

'আপনি না থাকলে অত কাছে যাওয়া যেত না। আমি এক সামান্য ড্রাইভার। সারা দিন ট্যাকসি চালাই। আজেবাজে সিনেমা দেখি। থার্ডক্লাস লাইফ।'

'আপনার মুখ আর চোখ অন্য কথা বলে।'

'আপনি অনেক কিছু জানেন। তাই না ! আপনার মুখ দেখে আমার মনে হয়েছে, আপনি মানুষের ভেতরটা দেখতে পান।'

'দেখতে হয়ত পাই ; কিন্তু পাল্টে দিতে পারি না।'

'হয়ত পারেন ; তেমন চেষ্টা করেন না। আপনার ভেতরে একটা শক্তি আছে।'

'কি করে বুঝলেন ?'

'আমি যে অনেক দেখেছি। আমার টাকা-পয়সা নেই, অনেক অভিজ্ঞতা আছে। বহুত দেখেছি। আরও কত দেখব।'

অসীম মৃদু শব্দ করে হাসল।

পেট্রলের দেনাপাওনা মিটিয়ে গাড়ির বাঁ পাশ থেকে ডানপাশে আসার সময় জ্ঞানেশ নীলার দিকে একবার তাকাল। নীলার বাঁ হাত জানালা দিয়ে সামান্য বেরিয়ে আছে। কনুইয়ের সামান্য অংশ। রোদ পড়েছে। রোদে ফোটা ফুল দেখেছে জ্ঞানেশ। মানুষ যে এমন ফুলের মত ফুটে থাকতে পারে, এ অভিজ্ঞতা আগে কখনও হয় নি। একজনের মৃত্যু আর একজনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

গাড়ি স্টার্ট করতে করতে জ্ঞানেশের মনে হল, জীবনের কাছে মৃত্যু পরাজিত। কতবার কতভাবে দাঁত ফোটাবার চেষ্টা করছে। ফুলদানিকে স্তবকশূন্য করার অক্লান্ত চেষ্টা। পারছে না। এ এমন এক মালী, জীবন-মালী, নিত্য নতুন তাজা ফুল এনে সাজিয়ে যাচ্ছে। ভীষণ ভাল লাগছে জ্ঞানেশের। নিজেকে মনে হচ্ছে সফল, সফল-প্রেমিক। বাতাসে চুল উড়ে কপালে পড়েছে। পাশে সুন্দরী মহিলা। এত পাশে, যে শরীরে একটা উত্তাপ এসে লাগছে। হীরে

থেকে ঠিকরে পড়া আলোর আভার মত। এমন যদি হত ! এই চলা আর শেষ হল না। পৃথিবীর এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর। শুধু চলা। গাড়িটা একটা ঝিনুক হয়ে যাক। এই মুহূর্তটা হয়ে যাক নিটোল একটি মুক্তো। কালসমুদ্রের অতলে তলিয়ে গিয়ে এমন এক স্বপ্ন দেখা, যা আর কোনও দিন ভাঙবে না। ম্যাগনিফিসিয়েন্ট, ম্যাগনিফিসিয়েন্ট।

সার সার গাছের ছায়া লুটিয়ে আছে পথে। ডোরা কাটা আলোর সরণি বেয়ে জ্ঞানেশের মায়া-তরণী ভেসে চলেছে। হঠাৎ জ্ঞানেশের ঘোর কেটে গেল। কি ভাবছে সে বোকার মত ! নীল আকাশ দিগন্তের কাছে মাটি স্পর্শ করেছে মনে হয়। কাছে গেলেই দূরে সরে যায়। আকাশ আকাশেই থাকে। মাটি থাকে মাটিতে। বাজিকর অনবরতই মুদ্রা ছুঁড়ছে। আর জিজ্ঞেস করছে, হেড না টেল ? হেড বললে টেল হয়। টেল বললে হেড। এই তো জীবন ! মেলে না। মেলান যায় না।

উল্টোদিক থেকে একটা লরি হুড়মুড় করে চলে গেল এক চুল তফাৎ দিয়ে।

নীলা বললে, 'ইউ ওয়ার আনমাইণ্ডফুল।'

'বাট আই অ্যাম ইন ফুল কন্ট্রোল অফ দি স্টিয়ারিং। অ্যাণ্ড আই নো হোয়্যার আই অ্যাম গোয়িং।'

'দেন ইউ আর ফরচুনেট। আই ডু নট নো হোয়ার আই অ্যাম গোয়িং।'

'ও তো দর্শন !'

'জীবন মানেই তো দর্শন ! দুটো জগৎ। একটা ক্ষিদের আর একটা চিন্তার। প্রথমটা থেকে বেরলেই দ্বিতীয়টা । আর দ্বিতীয়টা থেকে যে সব ভাগ্যবান মুক্তি পায়, তাদের জন্যে নো-মাইণ্ড'।

'আপনার প্রচুর পড়াশোনা। আমি মূর্খ।'

'সেই উপলব্ধি আপনার হয়েছে। তাহলে আপনি প্রকৃতই জ্ঞানী।'

জ্ঞানেশ হাসল। বাঁ হাত দিয়ে কপাল থেকে চুল সরাতে সরাতে বললে, 'আপনার সঙ্গে এই পামেলা বোসের পরিচয় হ'ল কি করে !'

ঝিনুক ভাঙা হাসি হেসে নীলা বললে, 'এই যে ভাবে আপনার সঙ্গে আজ আমার পরিচয় হল !'

সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানেশ বললে, 'এই পরিচয়কে কি ভাবে স্থায়ী করা যায় !'

'যে কোনও একটা স্বার্থ অথবা কর্মের সঙ্গে জড়িয়ে দিতে হয়।'

'নিঃস্বার্থ কিছু হয় না ?'

নীলা আবার হাসল, 'নিঃস্বার্থ ! স্বার্থই তো আমাদের ড্রাইভিং বেল্ট। আমাদের মোটার। আমাদের গ্র্যাভিটেশানাল পুল।'

দুটো কুকুর মারামারি করতে করতে হঠাৎ গাড়ির সামনে এসে পড়ল। জ্ঞানেশ খচ করে ব্রেক কষল। নীলার সারা শরীর দুলে উঠল। নিজেকে ঠিকঠাক করে গুছিয়ে নিতে নিতে বললে, 'ফাইন, ইউ আর ভেরি মাচ অ্যালার্ট।'

কুকুর দুটোর কোনও খেয়ালই নেই। মারামারি, আঁচড়াআঁচড়ি, কামড়াকামড়ি করতে করতে এ পাশ থেকে ওপাশে চলে গেল। জ্ঞানেশ গাড়ি ছেড়ে দিতে দিতে বললে,'ক্ল্যাশ অফ ইন্টারেস্ট।'

নীলা বললে, 'অফ লোয়ার লেভেল। এখুনি মিটে যাবে। আপার লেভ্‌লের ক্ল্যাশ দীর্ঘ দিন চলে।'

'অ্যাণ্ড উই সাফার।'

'ইফ উই ডু নট রান দেম ওভার।'

জ্ঞানেশ হাসল, 'দ্যাটস ফাইন। চাপা দিয়ে বেরিয়ে যাও। একটু নিষ্ঠুরতা।'

'নিষ্ঠুররাই বেঁচে থাকে। গ্র্যাব, গেটহোল্ড, টিয়ার অ্যান্ড থ্রো। দেন লাফ লাইক এ ডেমন।'

'কিন্তু কংসকে কে মনে রাখে! কৃষ্ণই তো সব।'

'ভুল। ভুল কথা। দু'জনেই অমর। এক পাল্লায় কৃষ্ণ আর এক পাল্লায় কংস। সমান ওজন। গড অ্যাণ্ড সেটান ইকোয়ালি পাওয়ারফুল। দ্যাটস এ টাগ অফ ওয়ার।'

নীলা ইংরেজী সুরে গান গেয়ে উঠল।

জ্ঞানেশ বললে, 'সুন্দর গান। আমি শুনেছি। কে যেন গেয়েছেন। পল ম্যাকার্টিনি। আপনার গলায় আরও সুন্দর শোনাচ্ছে।

'দ্যাটস এ টাগ অফ ওয়ার' নীলা সুর করেই বললে, 'ডোন্ট ফ্ল্যাটার। প্লিজ ডোন্ট ফ্ল্যাটার। দ্যাটস এ টাগ অফ ওয়ার।' মুচকি হাসি ঠোঁটের কোণে।

জ্ঞানেশ সুরে সুর মিলিয়ে বললে, 'আয় অ্যাম নট ফ্ল্যাটারিং ম্যাডাম। ট্রুথ ইজ ট্রুথ।

নীলার ঠোঁটের কোণের হাসিটা আরও স্পষ্ট হল। 'টার্ন রাইট।'

জ্ঞানেশ বোঁ করে গাড়িটা ডান দিকে ঘুরিয়ে দিল।

দেবীর সদর দরজায় সজোরে একটা লাথি মারার জন্যে জলো ডান পাটা তুলেছিল। পাশের জানলায় ফুটফুটে শিশির ভেজা, নিষ্পাপ একটা মুখ দেখে থতমত খেয়ে পা টেনে নিল। ঝকঝকে দুটো চোখ অবাক হয়ে চেয়ে আছে তার দিকে। মাথার দুপাশে লাল দুটো রিবনের ফুল।

তোতার মনে হল, এ লোকটা আমার কাকু। সে বললে, 'কাকে খুঁজছ কাকু?'

তোতাকে আগে কখনও দেখে নি জলো। তবে বুঝতে অসুবিধে হল না, এই সুন্দর মেয়েটি দেবীর।

জলো গম্ভীর গলায় বললে, 'দরজাটা খুলতে বল।'

গলাটা যত গম্ভীর করতে চেয়েছিল ততটা হল না। ফ্যাঁসফেঁসে শোনাল।

তোতা বললে, 'তুমি কি রাগ করে বলছ?'

দেবী ভেতর থেকে জিজ্ঞেস করল, 'কার সঙ্গে বকবক করছিস তোতা!'

নিজে এসে জানলায় উঁকি মারল। জলোকে দেখে ঠিক চিনতে পারল না। মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কাকে খুঁজছেন?'

'আপনাকে।'

জলো এবারও বোধ করল গলাটাকে যতটা হেঁড়ে করবে ভেবেছিল ততটা হল না।

দেবী দরজা খুলতেই জলো ভেতরে এল। ধাক্কা লেগে দরজার একটা পাল্লা দুম্ করে দেয়ালে এসে লাগল।

তোতা ছুটে এসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার লেগেছে কাকু! লেগেছে!'

দেবীর মত, তাজা গোলাপের মত মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রইল জলো। সে কি করতে এসেছিল ভুল হয়ে গেল।

তোতা শাসনের সুরে বললে, 'অত হুটোপাটি করছ কেন? তুমি কি খোকা?'

জলো হেসে ফেলল। হা হা করে হাসছে। রেগে গেলে সে মুরগীর মত মানুষের গলা টেনে ছিঁড়তে পারে। আবার আনন্দ হলে ধেই ধেই করে নাচতে পারে। তখন সে শিশু। জলো হাসছে। হা হা করে। থামাতে পারছে না কিছুতেই।

॥ ষোল ॥

কৃষ্ণপদর নীতি হল, যতদিন বাঁচব, লিভ ইন স্টাইল। উঞ্ছবৃত্তি করে বাঁচতে চাই না। তেমন বুঝলে, সব রেস্ত ফাঁক হয়ে গেলে, চলে যাবার রাস্তা ভাবাই আছে। চমৎকার নির্গমন। দান্তে গেব্রিয়েল রসেটি ওফেলিয়ার মৃত্যু দৃশ্য এঁকেছিলেন। কমলদলে ওফেলিয়া শান্তিতে শয়ান। নিজের প্রেমিকাকে মডেল হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন। দিনের পর দিন সেই মহিলাকে বাথটাবে নির্দেশ মত শুয়ে থাকতে হত। নিউমোনিয়া হয়ে দান্তের প্রেমিকা শেষে মারাই গেলেন। সেই বিখ্যাত ছবিটির একটি প্রিন্ট কৃষ্ণর সংগ্রহে আছে। মৃত্যু যে কত রোমান্টিক হতে পারে ! মাঝে মাঝে নির্জন দুপুরে কৃষ্ণ ছবিটি বার করে দেখে। বর্তমান থেকে সরতে সরতে চলে যায় দূর অতীতে। সেই যুগ, সেই সময়, সেই দেশ। ঠিক ওইভাবে কৃষ্ণ শেষকে বরণ করে নেবে। অনেকটা ইচ্ছামৃত্যুর মত।

একটা অটোমেটিক পিস্তল থাকলে বেশ হত। যেমন থাকে পশ্চিমী মানুষের পকেটে। রগের কাছে চেপে ধরে ট্রিগারে সামান্য আঙুলের চাপ। সে উপায় যখন নেই গ্রীক রাস্তাই ভাল। গরদের ধুতি আর পাঞ্জাবি পরবে। ভাল আতর মাখবে। পরিষ্কার সুন্দর বিছানা। খাটের পাশে মেঝেতে এক বালতি গরম জল। ধারালো ব্লেড দিয়ে কবজির কাছে ধমনী কেটে বালতির জলে হাতটা ডুবিয়ে দেবে। ধীরে ধীরে ধীরে শরীরের সব রক্ত বেরিয়ে যাবে। নিমিলিত চোখের সামনে জগৎ-সংসার একটু একটু করে ঝাপসা হতে হতে শেষে অদৃশ্য।

ভাতের ফ্যান উথলে উঠতেই কৃষ্ণর চিন্তার ধারা চমকে উঠল। চট করে একটু জল ঢালতেই ফ্যান সংযত হল। হাঁড়িটা উনুন থেকে নামিয়ে ফ্যান গালার জন্যে মেঝেতে উপুড় করে দিল। ভাতের গন্ধ, বাষ্প, উনুনের গনগনে আঁচ, রোদ ঝলমলে আকাশ, এই সব দেখলে কৃষ্ণর ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করে। আর কি আসা হবে ! এলেও কোথায় আসা, কি ভাবে, কি রূপে, কি নামে আসা ! তখন কি শিবুর মত ভাই পাওয়া যাবে ? কুমুর মত স্ত্রী ! যে-সব ছবি এবারে আঁকা হল না, পরের বার এসে সেই সব ছবিতে কি তুলি ঠেকান যাবে ? এবারের কথা পরের বার আর মনেই থাকবে না।

ভালো পোর্সিলেনের ডিনার প্লেটে কৃষ্ণ সাদা ফুলের মত ফুরফুরে চার চামচে ভাত তুলে নিল। কুমুর আজ তেতো খাবার দিন। নিমঝোল করেছে। বঙটা বেশ খুলেছে। ভাগ্যিস একসময় রান্নাকে জীবনের অনেক শখের একটা শখ হিসেবে রপ্ত করা ছিল। তা না হলে আজ কি হত ! কোনও কিছু মুখে দেওয়া যেত ?

কৃষ্ণপদর পরনে একটা পাটের ধুতি। সাদা ধবধবে গেঞ্জি। যীশু খ্রীস্টের মত ঘাড় পর্যন্ত লম্বা লম্বা চুল মাথার মাঝখান থেকে দু ভাগে আঁচড়ান। মেঝেতে আসন পেতে, সামনে জল ছিটিয়ে ভাতের প্লেট, ঝোলের পাত্র, জলের গেলাস সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল, যেখানে যেভাবে রাখা উচিত। শিল্পী মানুষ। রঙ আর কম্পোজিসান রক্তে মিশে গেছে। সামান্য একটু এলোমেলো হলেই চোখে নয়, একেবারে মনে গিয়ে ধাক্কা মারে।

জানালার বাইরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে কুমু বসে আছে স্থির হয়ে। ঘাড় বাঁ পাশে কাত। ঠোঁটের কোণে অভ্রের মতো এক কুঁচি হাসি চিকচিক করছে। সামনে ঝুলে থাকা নীল আকাশে কেউ কি এসে দাঁড়িয়েছে ? এমন কেউ যাকে সাধারণ মানুষের চোখে দেখা যায় না। পিঠে পড়ে আছে ভিজে চুল। কৃষ্ণপদ তোয়ালে দিয়ে ঝেড়ে দিয়েছে। ছোট্ট, ঢালু কপালে সিঁদুরের টিপ পরিয়ে দিয়েছে কৃষ্ণ। পরিচয় না থাকলে কুমুকে দেখে মনে হবে, সিদ্ধ এক সাধিকা। অতিজাগতিক কোনও অনুভূতিতে বুঁদ হয়ে বসে আছে।

পেছন দিক থেকে কাঁধে হাত রেখে কৃষ্ণ মৃদু গলায় বললে, 'ওঠো, খাবে চল।'

বাধ্য মেয়ের মতো কুমু উঠে পড়ল। কৃষ্ণ বললে, 'বাঃ, এই তো লক্ষ্মী মেয়ে। ভারি লক্ষ্মী মেয়ে।'

কুমু উত্তরে কৃষ্ণর দিকে তাকিয়ে হাসল। অপূর্ব হাসি। এমন হাসি কৃষ্ণ মানুষের মুখে খুব কমই দেখেছে। এই হাসি দেখে কৃষ্ণর সেই সন্দেহটা আরও পাকা হল, কুমু উন্মাদিনী নয়। উপলব্ধিব এমন এক উচ্চ স্তরে উঠে গেছে, যেখানে উঠলে এই পৃথিবীকে রঙ্গশালা ছাড়া আর কিছুই মনে হয় না। পাগলের কারখানা। অ্যাকোয়ারিয়ামের মাছের মত নানা বর্ণের, নানা জীবিকার, নানা ধান্দার মানুষ অনবরত এদিক ওদিক ছোটাছুটি করছে। 'গোলমালে মাল আছে—গোলটি ছেড়ে মালটি নেবে।' শ্রীরামকৃষ্ণের কথা। কুমু সেই মালটি ধরেছে। সে কে ? সে কি ? কৃষ্ণপদ মাঝে মাঝে চিন্তা করে। ধরতে পারে না। পাশেই আছে। হযতো হাত লেগে যায় ; কিন্তু ধরা যায় না।

কুমু পা মুড়ে আসনে বসল। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল খাদ্যের আয়োজনের দিকে। ছ-সাত চামচের বেশি কোনও দিনই সে খায় না। সেইটুকুই গ্রহণ করতে অসম্ভব দেরি হয়। মাঝে মাঝে মুখে নিয়ে চোখ বুজিয়ে বসে থাকে বিভোর হয়ে।

কৃষ্ণ বড় চামচে দিযে ভাত মাখতে মাখতে বললে, 'আজকে তুমি লক্ষ্মী মেযেব মতো একটু তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও তো দেখি। আমাব ভাইটা উপোস করে বসে আছে। তোমাকে খাইযে আমাকে ও-বাড়িতে ছুটতে হবে।'

কুমু বড় বড় চোখে অবাক হয়ে স্বামীর মুখের দিকে তাকিযে রইল। কোলের ওপর তোয়ালে ভাঁজ করে রাখতে রাখতে সেই দুটি চোখের দিকে কৃষ্ণ তাকিযে ছিল। চোখেব পেছনে আরও দুটো চোখ থাকে। সকলের নয়। কারুর, কারুর। যেমন, কুমুর। বাইরের চোখ উদাস। যেন কিছুই বোঝেনি। ভেতরের চোখে একটা আমোদের ভাব ঝিলিক মারছে। যেন বলতে চাইছে, তাই না-কি !

শিশুকে যে-ভাবে মা খাওয়ায় সেইভাবে কৃষ্ণ কুমুর মুখে এক চামচে ঝোল মাখা সরু চালের ভাত পুরে দিলেন। ইদানীং কৃষ্ণ লক্ষ করছে, কুমুর চেহারায় একটা জ্যোতি এসেছে। কোনও উজ্জ্বল জিনিস দেয়ালের কাছে রাখলে যে-বকম একটা আভা পড়ে, দেয়াল উজ্জ্বল হযে ওঠে, কুমু দেয়ালের কাছে বসে থাকলে ঠিক সেইরকম হয়। খুব অবাক লাগে কৃষ্ণর। এমনও হয় ! কাকে প্রশ্ন করবে ? দেখতেই তো পাচ্ছে চোখের সামনে ! কিছু না মাখলেও কুমুর গা দিয়ে সুন্দর এক সুরভী বেরোয় সর্বক্ষণ। এইসব দেখে কৃষ্ণর ভয় হয়, কুমুকে আর বেশি দিন বোধহয় ধরে রাখা যাবে না। প্রস্তুত হও কৃষ্ণ। সেই আনন্দধাম আরও কত দূরে ? জীবনের পথে দু'জনে বেরিয়েছিল। একা হাঁটতে কেমন লাগবে ? শিবপদর কথা ভেবে কৃষ্ণ সাহস পেতে চায়, আমার ভাই আছে। দাবা আছে। অতীতের কত গল্প আছে। নিজের জীবনের অজস্র বিচিত্র ঘটনা নিয়ে কিছু লেখাও যেতে পারে। বিস্মৃত ইতিহাস।

আর এক চামচে ভাত কৃষ্ণ তুলে দিল কুমুর মুখে। এক ফালা আলুকে তিন টুকরো করল চামচে দিয়ে কেটে কেটে। অনেকেই বলে, কৃষ্ণ, তুমি তোমার পাপের ফল ভুগছ। এই পাপ সে যেন জন্ম জন্ম ভুগতে পারে !

পিচবোর্ডের বাক্সে তালগোল পাকিয়ে তুলোর ডেলার মত বিড়বিড় করছে গোটাতিনেক বেড়াল বাচ্চা। পুসি বাঘের মত পা ছড়িয়ে বসে আছে মাথা উঁচু করে। মা হওয়ার তৃপ্তি আর অহঙ্কারে চোখ খুলতে পারছে না। শিবপদ বললে, 'কি রে পুসি, শুধু বাচ্চাদের দুধ খাওয়ালেই হবে! তুই নিজে কিছু খাবি না।'

শিবপদ একটা চ্যাটাল বাটিতে দুধ এনেছে। বাটিটা সামনে ধরতেই পুসি চকচক করে দুধ খেতে লাগল। ঘড়ঘড় শব্দ করছে। এই বিশাল, বিশাল নিষ্ঠুর পৃথিবীতে মানুষের এইজন্যেই বেঁচে থাকা উচিত। এই সামান্যের মধ্যে কি অসামান্য আনন্দ! সোনার সরু সুতোর মত মুহূর্ত গুটিয়ে চলেছে মহাকালের বিশাল লাটাই। সুদীর্ঘ সুতোর সবটাই সোনার নয়। রূপো আছে। মরচে ধরা লোহা আছে। যাবার সময় কড়কড় করে কেটে ছিঁড়ে দিয়ে যায়।

পুসি জিভ দিয়ে বাটিটাকে চেটেপুটে সাফ করে আধবোজান চোখে মিউ করে একবার ডাকল। ভারি মিষ্টি ডাক। বেড়ালের ভাষা, পাখির ভাষা, শিবপদ মানুষের চেয়ে অনেক বেশি বোঝে। কোনও ঘোরপ্যাঁচ নেই। পুসি বলতে চাইল, 'খুব সুন্দর! বেশ খিদে পেয়েছিল। বড় ব্যস্ত আছি, তাই উঠতে পারছিলুম না। থ্যাঙ্ক ইউ। তবে আর একটু হলে ভাল হত। বলতে লজ্জা করছে।'

শিবপদ বললে, 'বুঝেছি, বুঝেছি। আর একটু চাই। তাই না। দাঁড়াও আনছি।'

শিবপদ পেছনের বারন্দা থেকে ভেতরে এসেছে। চারপাশের বৃষ্টিধোয়া গাছপালা থেকে ঝলমলে রোদের সবুজ আলোয় ঘর কাঁপছে। শিবপদ রান্নাঘর থেকে দুধ আনতে চলেছে। হঠাৎ নারীকণ্ঠের তীব্র চিৎকারে শিবপদর বুক কেঁপে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে বেশ ভারি কিছু পড়ার শব্দ হল সাত্যকি বোসের ঘরে। কাঁচ ভাঙারও শব্দ হল।

ভয় থমকান ভাবটা নিমেষে কেটে গেল। শিবপদ দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেল ঘরের দিকে। মেঝের ওপর সটান্ পড়ে এক নারীদেহ। সেণ্টার টেবিল উল্টে গেছে। কাঁচের ভারি একটা অ্যাশট্রে ছিটকে চলে গেছে খাটের তলায়। ভেঙে দু'খণ্ড হয়ে গেছে। সাত্যকি সেই একইভাবে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। আগের মতই চোখ বুজিয়ে। কোনও ক্রমেই পাশ ফিরতে পারেনি।

শিবপদ প্রথমে ভেবেছিল দেবী। কাছাকাছি এগিয়ে গিয়ে অবাক হল, এ কে? তনু! তনু কোথা থেকে এল? তনুর মত কাছাকাছি আর কেউ থাকে না কি!

শিব হাঁটুগেড়ে তনুর পাশে বসে পড়ল। কপালে আলতো করে হাত রেখে ডাকল, 'বউমা! বউমা!'

তনু ধড়মড় করে উঠে বসে দুহাতে শিবপদকে জড়িয়ে ধরল। বুকে মুখ লুকিয়ে হাঁপাতে লাগল। নিশ্বাস পড়ছে জোবে জোবে।

তনুর পিঠে ধীরে ধীরে হাত বোলাতে বোলাতে শিব বললে, 'খুব ভয় পেয়ে গেছ মা?'

তনু শিবের বুকের কাছ থেকে ফিসফিস করে বললে, 'আমি ভেবেছি আপনি। ভেবেছি আপনার কিছু হয়ে গেছে।'

শিবকে আরও জোরে জড়িয়ে ধবে তনু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

পিঠে স্নেহের হাত বোলাতে বোলাতে শিব বললে, 'না মা, আমি ঠিক আছি।'

'ইনি কে?' তনু বাতাসের শব্দে জিজ্ঞেস করল।

'তুমি চিনবে না মা। আগে কখনও দেখনি। কৃষ্ণব বন্ধু, সাত্যকি বসু। হাসতে হাসতে এল। কথা বলতে বলতে চলে গেল। তোমার লাগে নি তো?'

তনু বললে চাপা গলায়, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। মাথা ঘুরে পড়ে যাবার সময় সেণ্টার টেবিলটা ধরার চেষ্টা করেছিলুম। তারপর কি হয়েছে আমার মনে নেই।'

'তুমি দাঁড়াতে পারবে? তাহলে চল, আমরা ও-ঘরে যাই। এখানে তোমার না থাকাই ভাল।'

তনু মাটিতে হাতেব ভর রেখে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করল। মাথা ঘুরছে। কোমরে খুব লেগেছে। শিব বুঝতে পারল, তনুর লেগেছে। কেটেকুটে যায়নি হয়তো। তবে ভারি শরীর। আচমকা শক্ত মেঝেতে পড়েছে। এই সময় মেয়েদের পড়ে যাওয়া খুব বিপজ্জনক। তনুর দু হাত ধরে শিব ধীরে ধীরে তুলে দাঁড় করাল। তার বুকে মাথা রেখে তনু দাঁড়িয়ে আছে। দু' চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে।

'তুমি কাঁদছ কেন মা ?'

শিবের বুকে মুখ ঘষতে ঘষতে তনু বললে, 'আপনি আছেন। আপনি আছেন।'

'আমি তো আছিই পাগলি মেয়ে। আমি যাব কোথায় ?'

'আমাকে ছেড়ে আপনি যাবেন না।, বলুন আপনি যাবেন না।'

শিব বড় অভিভূত হল। এই পৃথিবীতে একজন এখনও তাকে ভালবাসে। সে একটি পরের মেয়ে। আবেগে তার কণ্ঠরুদ্ধ হয়ে আসছে। কথা ফুটছে না। হাজার হাজার বছর বাঁচতে ইচ্ছে করছে। রোদ ঝলমলে দিন, আলো ঝলমলে রাত। পুত্রবধূর মাথাটি বুকে একহাতে চেপে ধরে শিব এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে মুহূর্তের স্রোতে। প্রচণ্ড শীতে উষ্ণ জলের সুখানুভূতির মত অদ্ভুত এক সুখ ঘিরে আসছে চারপাশ থেকে।

তনুর সারা শরীর হঠাৎ কেঁপে উঠল। প্রথমে শিব ভেবেছিল আবেগে কাঁপছে। আবেগ নয়, যন্ত্রণা।

তনু বললে, 'আমাকে কোথাও আপনি একটু শুইয়ে দিন। ভীষণ যন্ত্রণা হচ্ছে পেটে।'

শিব তনুকে প্রায় কোলে করে বিছানায় এনে ধীরে ধীরে শুইয়ে দিল। উদ্‌ভ্রান্তের মত দেখাচ্ছে তাকে। মানুষের স্বপ্ন ভেঙে যেতে এক মুহূর্ত লাগে না। এমন এক নাট্যকারের হাতে জীবন-নাটকের কলম, দৃশ্য পাল্টে দিতে এক মুহূর্ত সময়ও লাগে না।

তনুর মুখের কাছে মুখ এনে শিব জিজ্ঞেস করল, 'খুব কষ্ট হচ্ছে ! দাঁড়াও আমি চট করে ডাক্তার ডেকে আনি।'

একটা হাত দিয়ে শিবপদর গলা ধরে তনু ফিসফিস করে বললে, 'কোথাও যেতে হবে না। একটা ক্র্যাম্প ধবেছে, এখুনি কমে যাবে।'

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে শিব চমকে ঘাড় ঘোরাল। কৃষ্ণপদ আসছে।

'দাদা, তুই এসেছিস ?'

কৃষ্ণ উদ্বেগের গলায় বললে, 'কেন, কি হয়েছে শিব ? কোনও বিপদ ? কে শুয়ে ? তনু ! কি হল তনুর ?'

শিব শান্ত গলায় বললে, 'বিপদ কখনও একা আসে না দাদা ! তুমি চট করে দেবীকে একবার ডেকে আনবে ?'

'দেবীকে ? হ্যাঁ হ্যাঁ ডেকে আনছি।'

দীর্ঘদেহী কৃষ্ণ লম্বা লম্বা পা ফেলে বেরিয়ে গেল। শিব মনে মনে প্রার্থনা করে চলেছে, ঈশ্বর, তুমি এমন কিছু ক'রো না, যাতে মানুষের সামান্য স্বপ্ন চুরমার হয়ে যায়। এমন কোনও পাপ তো করিনি। তোমার পথেই তো চলার চেষ্টা করেছি।

তনুর পেটে হাত বুলিয়ে দেবার ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছে। সে উপায় নেই। মনের বাধার চেয়ে সম্পর্কের বাধা !

'আমি বরং একটু গরম জল করে আনি।'

'আপনি বরং আমাকে ছোট একটা বালিশ এনে দিন।'

ড্রেসিং টেবিলের টুলে জলো বসে আছে। রোমশ দুটো হাত দু হাঁটুর ওপর। এক হাতে স্টিলের বালা। সামনে ঝুঁকে আছে বলে, গলার পদকটা বুকের কাছে দুলছে। কোনও রকমে

হাসি থামিয়েছে। পেটে কিন্তু এখনও ঢেউ খেলছে। ছোট্ট একটা মেয়ে তার সব পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছে। শুধু মেয়ে নয়, মেয়ের মাকে দেখেও জলোর মন গুটিয়ে গেছে। আর সে রোয়াব নেই। যে-ভাবে যা বলতে এসেছিল তা আর বলা হবে না।

খুব ভদ্রভাবেই জিজ্ঞেস করল, 'বউদি, দাদার খবর জানেন ?'

কি উত্তর দেবে দেবী ? সত্য বলবে, না মিথ্যা ? এক মুহূর্ত ভেবে বললে, 'কাল তো দাদাকে আপনি মেরে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন !'

জলোর ভীষণ ইচ্ছে হচ্ছিল রেগে যেতে। পারল না। মৃদু গলায় বললে, 'উপায় ছিল না। খুব বাড়াবাড়ি করছিল।'

'দাদার গায়ে হাত তুললেন ? উচিত হয়েছে ?'

'অন্যায় করে ফেলেছি বৌদি। আমি তো তেমন সুবিধেব ছেলে নই। বদ ছেলে। তবে দাদাকে আমি ভীষণ ভালবাসি।'

'দাদাকে একবার আমি দেখেছিলুম। ক্ষতবিক্ষত। একটা মানুষকে আপনারা এইভাবে তিলে তিলে মারবেন ?'

মোটাসোটা, থলথলে চেহারার এই ভোগী মানুষটিকে দেবী প্রথমে ভয় পেয়েছিল, এখন আর ভয় নেই। সাপুড়ের সম্মোহনী বাঁশীর সামনে সাপ যেভাবে ফণা তুলে নেশাগ্রস্তের মত হেলতে দুলতে থাকে, দেবীর ব্যক্তিত্বের সামনে জলো ঠিক সেইরকম অবশ হয়ে পড়েছে।

জলো মিউ মিউ করে বললে, 'আমরা তিল তিল করে মারবো কেন ? দাদা নিজেকেই নিজে মারছে।'

দেবী ধমকে উঠল, 'চুপ করুন। দাদাকে আপনারা কি দিয়েছেন ? শুধু দুয়েছেন।' দেবীব গলায় আবেগ এসে গেছে, 'মানুষের একটু ভাল হতে কি হয় ? বলতে পারেন, কি হয় ? আপনারা কেন একটু ভাল হতে পারেন না ? ভাল হতে কি খুব পয়সা লাগে ? ভীষণ কষ্ট ? না এইটাই এ-যুগের আদত ? নিজেদের বেঁচে থাকার বদগন্ধে সকলকে বাপ বলিয়ে ছাড়ছেন। কি, ভেবেছেন কি আপনারা ?'

জলো মন্ত্রমুগ্ধের মত দেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। অসম্ভব ফর্সা, ধারাল একটি মুখ। টানা টানা চোখ উত্তেজনায় ধকধক করছে। সারা মুখে গোলাপী একটা আভা ছড়িয়ে পড়েছে। নিজেকে মনে হচ্ছে মন্দিরের পাশে ইউরিন্যাল। গন্ধী আদমি। মুহূর্তে স্বর্গ আর নরকের সীমানা আলাদা হয়ে গেল।

ঘাড় চুলকোতে চুলকোতে জলো জিজ্ঞেস করলে, 'বউদি, দাদা কোথায় বলতে পারেন ?'

'না ভাই, আমি কি করে জানব !'

তোতা হঠাৎ জানালার দিকে তাকিয়ে বললে, 'ও মা, ওই দেখ বড়দা।'

জানালার দিকে ছুটে গেল প্রজাপতির মত, 'বড়দা। বড়দা।'

কৃষ্ণ হাসল। বুদ্ধদেবের মতো হাতের ভঙ্গি করল। জানলার বাইরে কৃষ্ণকে দেখে জলো উঠে দাঁড়াল। খুব অস্বস্তি হচ্ছে। নর্দমার বেড়াল ধবধবে সাদা বিছানায় উঠে পড়লে যে রকম হয় ! জলোর ভেতরটা কুঁকড়ে গেছে। বেশ বুঝতে পারছে, তার এই বেঁচে থাকাটা বাঁচা নয়, মৃত্যুরই নামান্তর।

॥ সতের ॥

'ইন্টারন্যাশনাল চিলড্রেন ওয়েলফেয়ার সেন্টার'। গেটের মাথার ওপর গোল করে লেখা। বেশ বড় বড় হরফে। বিশাল লোহার গেট ভেতর থেকে বন্ধ। চারপাশে জেলখানার মতো উঁচু পাঁচিল। দেখলেই ভয় করে। মনে হয় শিশুরা এক অনিশ্চিত ভবিষ্যতের কোলে পড়ে আছে। ভাগ্যের কারাগারে আবদ্ধ অসহায় কিছু প্রাণী। প্রতিষ্ঠানটির বিমর্ষ চেহারা দেখে জ্ঞানেশের মন বিষণ্ণ হয়ে গেল। পৃথিবী কি অনিশ্চিত স্থান! কি যে হবে, কেউ জানে না! এই তো মাস ছয়েক আগে ওর বন্ধু অনাদির ডান পাটা কেটে বাদ দিতে হল। অনাদির জীবনটা কি হয়ে গেল! অমন একজন বাঘা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ। ঘোরাই যার কাজ, সে এখন কি করবে! ডানাকাটা পাখির মত ঝপ করে উপার্জন পড়ে গেল। সাতশো, আটশো টাকা বাড়ি ভাড়া। বেঁচে থাকার মেজাজী ধরন। সুন্দরী, আধুনিকা স্ত্রীর তোয়াজ। কি ভাবে কি করবে অনাদি?

নীলা বললে, 'কি হল? ইউ আর ইন এ ট্রানস! হর্ন দিন।'

'ও ইয়েস।' জ্ঞানেশ হর্ন টিপল। পর পর তিনবার। নির্জনতা চমকে উঠল। উঁচু পাঁচিলে একটা কাঠবেড়ালি ঘুরছিল। ভয়ে লেজ তুলে এ মাথা থেকে ও মাথায় চলে গেল।

ঘড় ঘড় শব্দে বিশাল গেট খুলে গেল। না, জ্ঞানেশের ধারণা ভুল। ভেতরটা খুবই সুন্দর। বাঃ বলতে ইচ্ছে করে। যত্নের বাগান। একটা নয় গোটা তিনেক বড় বড় বাড়ি। দুটো নতুন তৈরি। একটা প্রাচীন কালের। অতীতে কোনও জমিদার বেশ খেলিয়ে করেছিলেন। থামঅলা এই ধরনের বিশাল বাড়ি দেখতে জ্ঞানেশের ভীষণ ভাল লাগে। অতীত কত উদার ছিল। বর্তমান কত সঙ্কুচিত। জীবন যেন শুকনো পেঁপে পাতার মত কুঁকড়ে আসছে।

লম্বা রাস্তা কেয়ারি করা বাগান চিরে সোজা ভেতরে চলে গেছে। দু'পাশে সার সার পাম গাছ। বাতাসে ঝিরি ঝিরি পাতা দুলছে। চিঁড়ের মত কুচি কুচি রোদ চারপাশে ঝরে পড়ছে। ডান পাশে ছোট্ট একটা জলাশয়। অজস্র পদ্ম ফুটে আছে। জ্ঞানেশ গাড়ি ঘুরিয়ে থামঅলা বাড়ির সামনে দাঁড় করাল। টাইপরাইটারের খটখট শব্দ ভেসে আসছে। যিনিই টাইপ করুন, অসম্ভব তাঁর স্পিড।

নীলা গাড়ি থেকে নামতেই ফুটফুটে একটা বাচ্চা মেয়ে কোথা থেকে দৌড়ে এল। কচি কচি দু'হাতে নীলার শরীরের নিচের দিকটা জড়িয়ে ধরে, মিষ্টি মিষ্টি গলায় বলতে লাগল, 'দিদি, দিদি'।

নীলা মেয়েটিকে কোলে তুলে নিয়ে দুপাক গোল হয়ে ঘুরে গেল। বাচ্চা মেয়ের খিল খিল হাসি পায়রার মতো উড়ছে চারপাশে। জ্ঞানেশ মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। তারপর নেমে এল গাড়ি থেকে। নীলার মুখে চোখে একটা মায়ের ভাব এসে গেছে। সাংঘাতিক আধুনিকা একেবারে অন্যরকম হয়ে গেছে।

অনেক পায়ের শব্দ ছুটে আসছে দূর থেকে। দেখতে দেখতে নীলা আর জ্ঞানেশের চারপাশে

যেন অজস্র খই ছড়িয়ে পড়ল। ধবধবে সাদা পোশাক পরা শিশুর দল। সকলেই দিদি, দিদি করছে। নীলাকে জড়িয়ে ধরতে চাইছে। কারুরই স্বাস্থ্য খারাপ নয়। পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন। চেহারায় যত্নের ছাপ। নিজেদের বাড়িতে থাকলে এত যত্ন কখনই পেত না। এক গাদা জীবন্ত, ফুটন্ত ফুল যেন নীলা আর জ্ঞানেশকে প্রাণের স্রোতে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চাইছে।

নীলা নিচু হয়ে হয়ে প্রত্যেককে একটা করে চুমু খেল। কারুর মাথায়, কারুর গালে হাত দিয়ে আদর করল। দূরে ঘণ্টা বাজল। নারীকণ্ঠের ডাক ভেসে এল, 'সবাই চলে এস।'

আর এক মুহূর্তও কেউ দাঁড়াল না। সবাই লাইন দিয়ে দূরের হলুদ বাড়িটার দিকে এগোতে লাগল।

জ্ঞানেশ জিজ্ঞেস করল, 'এরা এখন কি করবে ?'

এলোমেলো শাড়ির ভাঁজ ঠিক করতে কবতে নীলা বললে, 'ভোজন।'

'আমাকে রাখবেন ?'

'বয়েস কমিয়ে ফেলুন আর নিজেকে শূন্য করে ফেলুন। আপনি আর পৃথিবী। মাঝে আর যেন কেউ না থাকে।'

নীলা হাসতে হাসতে এগিয়ে চলল। জ্ঞানেশের মনে হল নীলাকে সে কোনও দিন ভুলতে পারবে না। নীলার প্রচণ্ড আকর্ষণে তাকে বারে বারে উড়ে আসতে হবে দেওয়ালি-পোকার মত। এই শুরু হল তার পোড়ার কাল। মন আর কোনও শাসন মানতে চাইছে না। উত্তাল সমুদ্রের ঢেউ বারে বারে আছড়ে পড়ছে পাথুরে বাঁধের ওপর।

অফিসঘরের দরজায় দাঁড়াতেই জ্ঞানেশের প্রথমে যা চোখে পড়ল, তা হলো উল্টো দিকের দেয়ালে যীশুখ্রীস্টের বিশাল এক প্রতিকৃতি। ভাবস্তব্ধ মুখ। প্রেমিক দুটি চোখ। সারা ঘরের আবহাওয়া, পরিবেশ যেন তাঁর নিয়ন্ত্রণে। গিল্টি করা ঝকঝকে ফ্রেম। জ্ঞানেশ চোখ ফেরাতে পারছে না। নিজেকে মনে হচ্ছে একটি আত্মভোলা মেষশাবক।

গভীর নীল রঙের জামা পরে জমাট স্বাস্থ্যের এক ভদ্রলোক বিশাল টেবিলের উল্টো দিকে বসে আছেন। সামনে একটা সুদৃশ্য বিলিতি টাইপরাইটারে কাগজের জিভ ঝুলছে। কোণের দিকে দেয়ালে একটা ক্রাচ অপেক্ষা করে আছে। ভদ্রলোকের এক মাথা চুল রূপোলি ঝিলিক মারছে। ফর্সা রঙ রোদে পুড়ে তামাটে। দেহ ঘিরে অদ্ভুত এক ব্যক্তিত্ব থির থির করে কাঁপছে। রোদের ঝাঁঝের মত। ঠোঁট দুটো একটা নিবে যাওয়া পাইপ কামড়ে আছে।

নীলাকে দেখে ভদ্রলোক বললেন, 'হ্যালো।' ঘর গম গম করে উঠল। জ্ঞানেশকে দেখে চোখে একটা ঝিলিক খেলে গেল।

জ্ঞানেশের দিকে একটা চেয়ার এগিয়ে দিয়ে নীলা বললে, 'বসুন।'

কোনও রকম শব্দ না করে নীলার পাশের চেয়ারে জ্ঞানেশ বসে পড়ল। খড় খড় শব্দ তুলে ঝড়ের গতিতে ভদ্রলোক গোটা তিনেক লাইন টাইপ করে ফেললেন। এপাশে কাগজের জিভ আরও কিছুটা ঝুলে পড়ল।

নীলা পামেলা বোসের চিঠিটা এগিয়ে দিতে দিতে বললে, 'হিয়ার ইজ এ লেটার ফর ইউ।'

ধ্রুববাবুর বুকের ওপর একটা সোনালি ক্রশ দুলছে। জ্ঞানেশের মনে একটা প্রশ্ন ঘুরে গেল, এঁরা কি তাহলে খ্রীস্টান! ডান হাত বাড়িয়ে ধ্রুব চিঠিটা নিলেন। কবজির কাছ থেকে কনুই পর্যন্ত দীর্ঘ একটা ক্ষতের দাগ অশান্ত অতীত জীবনের স্মৃতি বহন করছে।

জ্ঞানেশ আচমকা প্রশ্ন করে ফেলল, 'কি হয়েছিল আপনার হাতে ?'

চিঠিতে ডুবে আছেন। উত্তরে মাথা নাড়লেন শুধু।

নীলা বললে, 'ওঁর সারা দেহই ক্ষতবিক্ষত। যুদ্ধের স্মৃতিচিহ্ন। আর্মি অফিসার ছিলেন।'

ধ্রুববাবু চিঠি থেকে মুখ তুলে টেলিফোনের দিকে হাত বাড়ালেন। কি একটা নম্বর ডায়াল করলেন। কানে রিসিভার। চোখ বুজিয়ে আছেন। ভদ্রলোক মিতভাষী। জ্ঞানেশের সেই রকম

মনে হল। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটা কথাও খরচ করতে চান না। ধ্রুববাবুর সামনে নীলাও কেমন যেন চুপসে গেছে! পর্বতের সামনে ছোট্ট দুটি টিলার মত জ্ঞানেশ আর নীলা বসে আছে।

ওপাশে কার গলা পেয়ে ধ্রুব বললেন, 'হ্যালো, পার্ক আণ্ডারটেকার। গোমেস প্লিজ।'

চোখ মেলে খুব শান্ত গলায় জ্ঞানেশকে বললেন, 'ঠিকানাটা একটা কাগজে লিখে দিন।'

ছোট একটা প্যাড আর ডট পেন এগিয়ে দিলেন।

'হ্যাঁ গোমেস। একটা ঠিকানা বলছি, লিখে নাও। কফিন রেডি আছে? আছে। বেশ। তুমি তোমার দিক থেকে বেরিয়ে সোজা চলে যাও। আমরা এদিক থেকে যাচ্ছি। কফিনটা? হ্যাঁ ভালো। সবচেয়ে ভাল। কে? আমাদের মিস বোসের ভাই। কি বলছ? ওঁর কফিন তৈরিই আছে! কি করে? কে করালে? নিজে! হাউ ফানি। ওবেলিস্ক! তাও রেডি! স্ট্রেঞ্জ! অলরেডি পেড ইন অ্যাডভানস।'

আরও কিছুক্ষণ কথা বলে ধ্রুব রিসিভার নামিয়ে রাখলেন। চিন্তিত মুখে বুকের ওপর ক্রসটাকে দু'আঙুলে নাড়তে নাড়তে আপন মনেই বলে উঠলেন, 'স্ট্রেঞ্জ!'

নীলা বললে, 'কি হল?'

'ভদ্রলোক দু'মাস আগে আণ্ডারটেকারকে টাকা দিয়েছেন কফিন আর স্মৃতিফলক তৈরির জন্যে। ফলকে লিখিয়েছেন হিয়ার লাইজ এ নেমলেস ওয়ান হু ওয়াজ নট বর্ণ।'

'আশ্চর্য! মৃত্যু আসছে জানতে পেরেছিলেন!'

'এই সব রোমান্টিক মানুষদের নিয়ে মহা বিপদ। এঁরা সব সময়েই একটা কিছু স্পেকটাকুলার করতে চান। তাক লাগিয়ে দেবার মত। কোনও মানে হয় না।'

কথাটা জ্ঞানেশের পছন্দ হল না। প্রতিবাদে বললে, 'আমার তা মনে হয় না। এক একজনের পাওয়ার থাকে। ভবিষ্যৎ দেখতে পায়। আমরা পাই না, তাই অবিশ্বাস করি।'

'কে কি পায় আমি জানি না; তবে এই মেলোড্রামার কোনও মানে হয় না। যাক ও নিয়ে আমি কোনও তর্কে যেতে চাই না। পৃথিবীতে মাথা ঘামাবার মত এত বিষয় আছে, পৃথিবীর বাইরে যাবার দরকার নেই। ও এক ধরনের বিলাসিতা। আপনারা তাহলে এগিয়ে পড়ুন। গোমেসের গাড়ি হয়তো আগেই পৌঁছে যাবে।'

ধ্রুব আবার ফটাফট টাইপ শুরু করলেন। জ্ঞানেশের মনে হল, মানুষটি এক অবিশ্বাসী হামবাগ। কাজের ভড়ং দেখাতেই ব্যস্ত। প্রশ্ন করলে হয়, কি এমন টাইপ করছেন যে মানুষের সঙ্গে দু দণ্ড কথা বলার সময় নেই। মিলিটারি যখন ছিলেন, তখন ছিলেন, এখন তো সিভিলিয়ান। জ্ঞানেশ ওঠার সময় ইচ্ছে করেই চেয়ারটাকে জোরে ঠেলল যাতে বেশ শব্দ হয়। ধ্রুব মুখ তুলে ভুরু কুঁচকে তাকালেন। ঠোঁট কাঁপল বটে কিন্তু কথা ফুটল না। জ্ঞানেশের খুব মজা লাগল। পরক্ষণেই বেশ লজ্জিত হয়ে পড়ল। এই ধরনের অসভ্যতা না করলেই হত। নীলাও অবাক হয়ে জ্ঞানেশের দিকে তাকিয়ে আছে।

জ্ঞানেশ বললে, 'সরি। রাগ চাপতে না পেরে শব্দ করে ফেলেছি।'

টাইপ যন্ত্র থেমে গেল। ধ্রুব পূর্ণ দৃষ্টিতে জ্ঞানেশের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'রাগের কি হল! রেগে যাবার মতো কিছু বলেছি কি?'

'আমার মনে হল, আপনি একজন মৃত ব্যক্তিকে অকারণে ছোট করলেন। উপহাস করলেন। ব্যঙ্গ করলেন। মৃত্যুর চেয়ে কাজ বড় এই রকম একটা ভাব দেখাতে চাইছেন। আপনিও কম ড্রামেটিক নন!'

'ওয়েট ওয়েট। ইও আর গোয়িং বিয়ণ্ড ইওর লিমিট। আমি কাজ করব কি চোখের জল ফেলব, হু আর ইউ টু ডিকটেট। যা করার আমি করে দিয়েছি। ইউ ক্যান গো। বাট প্রুভ দ্যাট ইউ আর এ সিভিলাইজড ম্যান।'

জ্ঞানেশের পা থেকে মাথা পর্যন্ত রাগে জ্বলে গেল। জবাব দিতে গিয়েও নিজেকে সামলে নিল। দ্রুত এগিয়ে গেল দরজার দিকে। দেয়ালে যীশুর ছবি থাকলে কি হবে, মনে প্রেম নেই। সহানুভূতি নেই। জ্ঞানেশ দরজার চৌকাঠ ডিঙোতে যাবে, এমন সময় ধ্রুব ডাকলেন, 'শুনুন। আমার আরও কিছু বলার আছে।'

জ্ঞানেশ ঘুরে দাঁড়াল, 'বলুন।'

'বসুন আপনি।'

নীলা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। টেবিলের ওপর তার দুটো ফর্সা ধবধবে হাত একটা পেপারওয়েট ধরার চেষ্টা করছে। ডান হাতের অনামিকায় পাথর বসান সোনার আঙটি। হাতের রূপে আঙটির রূপ যেন আরও খুলে গেছে। জ্ঞানেশের রাগ ছাই পড়া আগুনের মত মৃদু হয়ে এসেছে। যে চেয়ারে একটু আগে বসেছিল, সেই চেয়ারেই ধীরে ধীরে আবার বসে পড়ল। শোনাই যাক, কি বলেন ভদ্রলোক।

ধ্রুব তার দিয়ে পাইপ পরিষ্কার করতে করতে বললেন, 'একটা প্রশ্ন। জীবনে আজ পর্যন্ত আপনি কটা মৃত্যু দেখেছেন?'

'একটা। আমার বাবার।'

'ক বছব আগে?'

'বছর তিনেক আগে।'

'সেই মৃত্যুর ফলে আপনার কোন কাজ বন্ধ হয়েছে? বন্ধ হয়ে আছে?'

জ্ঞানেশ মনে মনে চমকে উঠল। সত্যিই তো! কোনও কাজই তো বন্ধ হয়ে নেই। বাবার কথা তো তেমনভাবে আর মনেই পড়ে না। দেয়ালে যে ছবি ঝুলছে সেদিকেও তো কদাচিৎ চোখ পড়ে।

ধ্রুব পাইপে তামাক ভরতে ভরতে বললেন, 'জীবন হল জোয়ারের জল। তীরের সব গর্ত নিমেষে ভরে দেয়। এইটাই জগতের নিয়ম। কেউ কিছুই মনে রাখে না। মনে রাখবে না। আমি শত শত মৃত্যু দেখেছি। নিজে মরতে মরতে ফিরে এসেছি একটা পা খুইয়ে। মানুষ আসবে মানুষ যাবে। কেউ কালে। কেউ অকালে। কখনও আমরা দর্শক। কখনও আমরা দৃশ্য। আমাদের আগে মৃত্যু। আমাদের পরে মৃত্যু। মৃত্যুকে অত ইমপর্টেনস কেন দোব! কি জন্যে দোব? প্রিয়জন, আপনজন, কাউকে ধরে রাখা যাবে! আমার কাছে আমার চেয়ে প্রিয় আর কে আছে? তাকেও কি ধরে রাখতে পারব? এনি ডে, এনি টাইম, এনি মোমেন্ট, পাতা খসে পড়বে। উদাসীনতা দিয়ে মৃত্যুকে মুছে ফেলুন। সাত্যকি আমার কম বন্ধু ছিল না। সে কদিন আগে গেল। আমি কদিন পরে যাব। ম্যাটার অফ টাইম। ফল পাকলে পড়ে। কিছু ফল পাখিতে ঠোকরালে পড়ে। কি করা যাবে! নান কেন স্টপ ইট। আপনি ভাবুন। ভেবে বলুন, হোয়্যার আই অ্যাম রং!'

ধ্রুব পাইপটা ঠোঁটে গুঁজলেন। জ্ঞানেশ ফ্যাল ফ্যাল করে মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। প্রায় সব মানুষই কেমন দার্শনিক হয়ে উঠছে! এ দেশের মাটির গুণ! আজকাল একটা বাচ্চা ছেলেও দার্শনিক। এ দেশের ধূলিকণাতেও বেদান্ত মিশে আছে অভ্ররেণুর মত।

ধ্রুব বলিষ্ঠ ডান বাহু টেবিলের ওপাশ থেকে এপাশে এগিয়ে দিলেন জ্ঞানেশের দিকে করমর্দনের জন্য। জ্ঞানেশ নিজের ভাবনায় মশগুল হয়েছিল। চমকে ডান হাতটা এগিয়ে দিল। শক্ত মুঠোয় তার নরম আঙুল। আন্তরিকতার বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল।

ধ্রুব বললেন, 'ভুল বুঝবেন না। সব ভাব ভেতরে যতটা সম্ভব ধরে রাখাই ভাল। বাইরে প্রকাশ করলেই হাল্কা হয়ে যায়। তাই ভেতরেই কাঁদি, ভেতরেই হাসি।'

জ্ঞানেশ উঠেই পড়েছিল। নীলা বললে, 'এবার চলুন। বেরিয়ে পড়ি। আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। এই সব ছেলেমেয়েরা কতক্ষণ আমাকে ছেড়ে আছে!'

জ্ঞানেশ আর নীলা পাশাপাশি ঘর থেকে বেরিয়ে এল। গাড়িতে স্টার্ট দিতে দিতে জ্ঞানেশ বললে, 'ভদ্রলোক একেবারে কাঠখোট্টা। কোনও রসকষ নেই। এই রকম মানুষের হাতে শিশুদের ভার! কি যে হবে!'

নীলা বললে, 'এই হল আমাদের দোষ। পাঁচ মিনিটে পাঁচটা কথায় আমরা মানুষের বিচার করে ফেলি। ধ্রুবদা হলেন, ম্যান অফ গোল্ড। জীবনের যা কিছু সঞ্চয় এখানে দান করে দিয়েছেন। দশ বাই বারো মাপের একটা ঘরে থাকেন। নেয়ারের একটা খাটিয়া। একটা ক্যাম্প চেয়ার। দু প্রস্থ জামাকাপড়। দু বেলার আহার চারখানা রুটি,একটা নিরামিষ তরকারি। শীত নেই গ্রীষ্ম নেই ভোর চারটের সময় ঘুম থেকে ওঠেন। একটা পা আর একটা ক্রাচ সম্বল করে সারা পৃথিবী ঘুরে আসতে পারেন। এত বড় বাগান, নিজে তদারকি করেন। ইণ্ডিয়ান আর্মি ফোর্সেস-এর এস পাইলট ছিলেন।

জ্ঞানেশ গাড়ি চালাতে চালাতে ভাবছে, তার ভেতরে কি আছে নীলা জানে না। নীলার ভেতরে কি আছে সে জানে না। মনে মনে নীলাকে সে ভালবেসে ফেলেছে। ইলেকট্রনিক যন্ত্র হলে এতক্ষণ বিপ বিপ শব্দ করে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড করে ফেলত। গুপ্ত ঘাতকের মত, গুপ্ত প্রকাশক। গাড়ির গতি ভাবনার গতির সঙ্গে ক্রমশই বাড়ছে। আসনে শরীর ছেড়ে দিয়ে নীলা বসে আছে। আড় চোখে তার দিকে তাকিয়ে জ্ঞানেশের মনে হল, নীলা যেন পৃথিবীর শেষ প্রান্ত পর্যন্ত যাবার মানসিক প্রস্তুতি নিয়ে বসে আছে।

কৃষ্ণ সাধারণত পরের ব্যাপার নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামায় না। কিন্তু জলোর মত অদ্ভুত চেহারার একটা ছেলেকে দেবীর ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে দেখে অবাক হয়ে গেল। এই ছেলেটাকেই কদিন আগে রাস্তায় মারামারি করতে দেখেছিল। খিস্তির ফোয়ারা। কানে আঙুল দিতে হয়।

তোতা ভীষণ খুশি হয়ে বললে, 'বড়দা তোমার কি আজ আমাদের বাড়ি নেমন্তন্ন!'

'সে হলে তো ভালই হত রে দিদি। তোর ছোটদা আবার এক কাণ্ড বাঁধিয়ে বসেছে।'

দেবী উৎকণ্ঠিত হযে বললে, 'কি হযেছে? এই তো সকালে গিয়ে দেখে এলুম।'

'তনু এসেছে। কি ভাবে এল, কোথা থেকে এল, কেন এল, তা জানি না। কিন্তু ভীষণ অসুস্থ। বিছানায় শুয়ে আছে। যন্ত্রণায় ছটফট করছে। তুই একবার চল মা।'

'ও বাড়িতে কি লেগেছে বলুন তো?'

'গ্রহ লেগেছে রে মা!'

'চলুন আমি এখুনি যাচ্ছি।'

তোতা মুখ ভার করে বললে, 'আমিও যাই না মা।'

তোতার গালটা আদর করে নেড়ে দিযে কৃষ্ণ বললে, 'দিদি, তুই আর এখন যাস নি। গেলে ভয় পাবি। আমি বিকেলে আসব। এসে চা খাব। আর তোকে সুন্দর সুন্দর দশটা ছবি এঁকে দোব। হনুমান, জিরাফ, গণ্ডার, হাতি।'



॥ আঠার ॥

জলো কাফে ডিলাইটে ঢুকে কড়া গলায় কড়া এক কাপ চায়ের অর্ডার দিয়ে খবরের কাগজটা পাশের টেবিল থেকে তুলে নিল। কোনও পথ দুর্ঘটনার খবর আছে কি ? কোনও বেওয়ারিস লাশ পড়ে থাকার খবর ! দুয়ের পাতা, তিনের পাতা। এত মনোযোগ দিয়ে সে জীবনে কখনও কাগজ পড়েনি। দাদার জন্যে ভীষণ মন খারাপ হচ্ছে। দাদাকে সে এত ভালবাসে, নিজেই জানত না। এই দাদাই তাকে ধরাধরি করে সিমেন্টের ডিলারশিপ বেব করে দিয়েছিল অতি কষ্টে। পরেশের দল যখন আচমকা মাথায় ডাণ্ডা মেরে ফুটিফাটা করে দিয়েছিল, দাদা ঠায় তিন রাত্তির মাথার কাছে জেগে বসেছিল। জলোব কোনও হুঁস ছিল না। জলো তন্ন তন্ন করে খুঁজছে। তিনের পাতা, পাঁচের পাতা। দাদা যদি আর ফিরে না আসে জলো জীবনেব ধারা পাল্টে ফেলবে। এ পাড়া নয়, এ দেশ ছেড়েই চলে যাবে।

না, কোথাও কোনও পথ দুর্ঘটনা বা খুনের খবর নেই। হাওড়ার কাছে একটা বাস দুর্ঘটনার খবর আছে। মৃত তিন। আহত সতের। কাগজ সরিয়ে রেখে চায়েব কাপ সামনে টেনে নিল। কিছুই ভাল লাগছে না। এক ঠ্যালা সিমেন্ট পাঠাতে হবে হরেন মোক্তারেব বাড়ি। ধারে নয়। অ্যাডভান্স টাকা দিয়ে গেছে। মক্কেল-মারা পয়সায় হরেন এখন হাবুডুবু খাচ্ছে। অন্যমনস্ক একের পর এক চা-য়ে চুমুক দিয়ে যাচ্ছে। আজ ভীষণ অনুশোচনা আসছে মনে। মানুষ একবার মাত্র জন্মায়। কি হল জন্মে ! সময়ে সচেতন হলে আজ জীবনের চেহারাই পাল্টে যেত। তার সহপাঠীরা সকলেই প্রায় এক এক লাইনে দিক্‌পাল। অসীম ফিউয়েল রিসার্চে। বিনয় রিভার রিসার্চে। পরিমল জিওলজিক্যাল সার্ভেতে। পব পর নাম মনে আসছে। অসীমের সঙ্গে হঠাৎ একদিন দেখা হয়েছিল নিউ মার্কেটে। কি সুন্দর চেহারা হয়েছে। সুন্দরী বউ। চেহারা দেখলেই মনে হয় বড়লোকের আদুরে মেয়ে। ফর্সা গোল গোল হাত। চাঁপা কলির মত আঙুল। যেন মোমের তৈরি। সুখের হাত। হাঁড়ি ঠেলতে হয়নি কোনওদিন।

হাঁড়ির কথায় মনে পড়ল, আজ তো বাজার করা হয়নি। তার মানে আজ উপবাস। দাম মিটিয়ে জলো বেরিয়ে এল। অনেকদিন পরে ঝনঝনে রোদ উঠেছে। বড় চড়া আলো। বিশ্রী লাগছে। সাইকেলে চেপে বসল জলো। যেতে যেতে ভাবছে, এই পাপের জগৎ থেকে কোনওরকমে বেরিয়ে আসতে পারলে কেমন হত ! বড় ময়লা লেগে আছে গায়ে।

দরজা খোলাই ছিল। সামনের রকে বসে বউদি চ্যাকোর চ্যাকোর করে পান চিবোচ্ছে। যেন পৃথিবীর সব কাজ শেষ হয়ে গেছে। সারা দিনে ভদ্রমহিলা ক'খিলি পান খায় ! সময় সময় ভাল লাগে বউদিকে। মাঝে মাঝে অসহ্য মনে হয়। যেমন এখন হচ্ছে। ভদ্র বাড়িব বউয়ের চালচলনের ঠিক থাকা উচিত। মেয়েরা প্রথম জীবনে যাই থাকুক না কেন, পরে সে মা, শেষেও মা। মা হয়েই তাকে বিদায় নিতে হবে। উবু হয়ে বসে থাকা বউদির দিকে তাকিয়ে জলো মনে মনে বললে, সারা জীবন এইভাবে কাটাবে কি করে ! দাদা যদি আর না ফিরে আসে তাহলে তোমাকে তো আমি পথে বসাব। আমি খারাপ, তবে তোমার সঙ্গে আর খারাপ হবার ইচ্ছে

আমার নেই।

সাইকেলের ঘরে সাইকেল রেখে জলো বললে, 'কি, আজ রান্নাবান্না নেই ?'

গোপা পান চিবোতে চিবোতে বললে, 'বাজার করে দিলেই হবে।'

'কি আছে বাড়িতে ?'

'কিছুই নেই। চাল নেই, ডাল নেই। কিছুই নেই।'

'কটা বেজেছে জানো।'

'ঘড়ির খবর জেনে আমার কি হবে ? আমি তো রাঁধুনী। মালমশলা এনে দাও। আমি বানিয়ে দিচ্ছি।'

'আজ আর হাঁড়ি চড়িয়ে দরকার নেই।'

গোপা উদাস গলায় বললে, 'ভালো।'

ভালো বলে থেবড়ে বসে পড়ল। আজ তারও কিছু ভাল লাগছে না। কোনও দিনই ভালো লাগে না। আজ একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে পড়েছে। যে জীবনের কোনও ভবিষ্যৎ নেই, শুধু মাতালের মত টলতে টলতে, সময়ের ঠেলা খেতে খেতে খাদের দিকে এগিয়ে যাওয়া, সে জীবন তো এই রকমই হবে। সময়ের কোলে নিশ্চেষ্ট পুতুলের মতো বসে থাকা। নাচাও মহাকাল, নাচাও। চুল পেকে সাদা হয়ে যাক। ত্বক কুঁচকে ফেটে ফেটে যাক। প্রাণদণ্ডের আসামী। মাঝে মাঝে ভাবে, কত স্বপ্নই না ছিল জীবনে ! এত প্রাণ ছিল, সবাই ভাবত ফিচেল। কেউ কেউ অসভ্যও বলত।

জলো জিজ্ঞেস করলে, 'রান্না না হলে তুমি খাবে কি ?'

'মেয়েদের উপোস অভ্যাস আছে।'

জলো বললে, 'ভালো।'

'তুমি কোনও সন্ধান পেলে ?'

'না।'

'সন্ধান করেছিলে ?'

'কি মনে হয় ?'

'কি আর মনে হয় ? দু'জনের যা অহি-নকুল সম্পর্ক ছিল !'

'আর তুমি ছিলে একেবারে রাম–ভক্ত সীতা !'

'আর তুমি ছিলে রাম–ভক্ত ভরত।'

'তোমার মুখে জুতো।'

'তোমার মুখে ঝ্যাঁটা।'

'দোবো একদিন ঘাড় ধাক্কা দিয়ে বের করে।'

'চেষ্টা করে দেখ না। বাড়ি আমার।'

'হ্যাঁ বাড়ি তোমার বাপের।'

'তোমার বাপ তো রেস খেলে, মাল খেয়ে বাড়ি মর্টগেজ করে গিয়েছিল। ছাড়িয়েছিল কে ?'

জলো হঠাৎ গুম মেরে গেল। এ কি করছে সে ! একটা মেয়েছেলের সঙ্গে তর্জা গাইছে ? তার জীবনের নীতিই তো হাত থাকতে মুখে কেন ? তাছাড়া এখুনি কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরোবে। পারিবারিক ইতিহাস তো তেমন সুবিধের নয়। জলো ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেল। বৃদ্ধ বিজয় সরকার ভেতরের ঘরে বসে, ব্যবসার হিসেব লিখছেন। জলো চমকে উঠেছিল। তারপর মনে পড়ল, বিজয়বাবু বদ্ধ কালা। কিছুই শুনতে পাননি। পয়সার অভাবে কানে লাগানর যন্ত্র কেনা হয়নি।

জলো উঁচু গলায় জিজ্ঞেস করল, 'কখন এলেন আপনি ?'

'কাল রাতে।'

জলো থমকে গেল। কিছুই শুনতে পাননি।

বিজয়বাবু কথার খেই ধরলেন, 'সে কি জ্বর ! একেবারে কেঁপে-কেঁপে।'

'ছেড়ে গেছে ? এখন কেমন আছেন ?'

'পরশুদিন আসবে। আমাকে কথা দিয়েছে !'

ব্যর্থ চেষ্টা। জলোর আর কথা কইতে ইচ্ছে করল না। একেই তার কথা বলতে ইচ্ছে করে না। তায় আবার চিৎকার করে ! পাশের ঘরে গিয়ে চুপ করে কিছুক্ষণ বসে রইল। এ দেয়ালে ও দেয়ালে বিশ্রী কয়েকটা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে। যখন জোগাড় করে এনে ঝুলিয়েছিল, তখন মনের অবস্থা একরকম ছিল। এখন মনের অবস্থা আর একরকম। হঠাৎ মনে হল ভদ্র বাড়িতে এমন ক্যালেণ্ডার ঝোলা উচিত নয়। এ সব মদের দোকানে চলে। তড়াক করে লাফিয়ে উঠে, এ দেয়াল ও দেয়াল থেকে ক্যালেণ্ডার কখানা খুলে তালগোল পাকিয়ে ফেলল। ছবিটবি ছাড়া শুধু তারিখঅলা একটা কাজের ক্যালেণ্ডার ঝুলতে লাগল। ক্যালেণ্ডারটাব দিকে তাকাতেই তাব খেয়াল হল, আজ একাদশী।

পিছু হটে হটে বিছানায় এসে বসল। আজ একাদশী। সধবা মহিলা উপোস করে থাকবে ! সেটা ঠিক হবে। অকল্যাণ হবে। সবচেয়ে বেশি অকল্যাণ হবে দাদার। মা অনেক কিছু মানতেন। মা যাবার পর সংসার একেবারে ছন্নছাড়া হয়ে গেছে। এ ঘরে মায়ের একটা ছবি ছিল। এ ঘরে প্রায়ই অনেক অন্যায় কাজ হয়। সেইরকম একটা কাজের সময় মায়ের ছবির দিকে জলোর চোখ পড়ে গিয়েছিল। প্রথমে গ্রাহ্য করেনি। পরে মনে হয়েছিল মায়ের চোখে জল চিকচিক করছে। পরের দিনই ছবিটা খুলে বাইরের দালানে টাঙিয়ে দিয়ে এসেছিল। সঙ্কল্প করে ফেলল, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব, ভালো দিন দেখে মায়ের ছবিকে এ ঘরে প্রতিষ্ঠা কবতে হবে। এ জীবনে আর কে আছে তার ! সিমেন্টের বস্তা। নেশা। কিছু অখদ্যে সঙ্গী-সাথী। ফিচলে এক বউদি। ভূতের মত এক দাদা। তাও আর আছে কি-না কে জানে ?

জলো তেড়েফুঁড়ে উঠে পড়ল। এই ভেঙে পড়া পরিবারটাকে সামলাতে হবে। ভালো খারাপ হলে সাংঘাতিক খারাপ হয়। আবার খারাপ ভালো হলে সাংঘাতিক ভালো হয। জলো দেখিয়ে দেবে। প্রথমে এই আস্তাবলটাকে সাফা করতে হবে। তারপর এই পাড়াটাকে। আবর্জনা কোথায় কোথায় জমে আছে সে জানে। একমাত্র সেই জানে। মেরে সব চৌপাট করে দেবে।

বাইরে বেরিয়ে এসে রকের দিকে তাকাল, যেখানে একটু আগে বউদি বসেছিল। নেই। উঠোনে এক দলা পানের ছিবড়ে পড়ে আছে। জলো হাঁক পাড়ল, 'বউদি। বউদি। কোথায় গেলে ?'

সাড়া নেই। জলো একটু ইতস্তত করে বউদির ঘরে গিয়ে ঢুকল। উত্তরের জানলার সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে বাইরের দিকে তাকিয়ে। রুক্ষ চুলের ঢল পিঠ ছাপিয়ে কোমরের নিচে নেমে গেছে। যত্ন নেই তবু কি সাংঘাতিক চুল। উত্তরের আলো পড়ে মুখের একটা পাশ ভয়ঙ্কর সাদা দেখাচ্ছে। রক্তশূন্যতার লক্ষণ। এইসব রক্ষণশীল মধ্যবিত্ত বাঙালী পরিবারে মেয়েদের জীবন ইট চাপা ঘাসের মত ফ্যাকাসে।

'বউদি !'

জলো বারতিনেক ডেকেও সাড়া পেল না। ছবির মত স্থির। জলো পাশে এসে দাঁড়াল।

'তুমি কাঁদছ ! কাঁদছ কেন ?'

গোপা মুখ ঘুরিয়ে নেবার চেষ্টা করল। জলো গোপার দুগালে দুটো হাত রেখে মুখটাকে জোর করে নিজের দিকে ঘুরিয়ে রাখল।

'তুমি একা একা এখানে দাঁড়িয়ে কাঁদছ কেন ? বলো কেন কাঁদছ ?'

গোপা এতক্ষণ নীরবে কাঁদছিল। জলোর মিষ্টি কথায় ফুঁপিয়ে উঠল। ছিটকে সরে যেতে চাইল দূরে। জলো কাঁধে হাত রেখে গোপাকে বুকের পাশে ধরে রাখল। সরে যেতে চাইলেও সরার উপায় নেই। বড়ো বড়ো চোখের পাতা ভিজে গেছে। জলো বললে, 'গত দশ বছরে তোমার চোখে আর যা দেখি, জল দেখিনি কখনও। কেন তুমি কাঁদছ!'

গোপা ধরাধরা গলায় বললে, 'আমাকে ছেড়ে দাও। তোমার দাদার ঝ্যাঁটা, জুতো, লাথি আমার সহ্য হয়ে গেছে। এইবার শুরু হল তোমার।'

কান্নার আবেগে গোপা আর কিছু বলতে পারল না। মুখ নিচু করে জলোর পাশটিতে দাঁড়িয়ে রইল। ঘন ঘন নিশ্বাসে বুক ওঠাপড়া করছে। দেহ কাঁপছে থিরথির করে। মেয়েদের মন নিয়ে জলো কখনও কারবার করেনি। সে সিমেন্টের কারবারি। জীবনে কখনও কাউকে চিঠি লেখেনি। প্রেম-পত্র তো দূরের কথা। অন্য দিন হলে জলো এক ধাক্কায় উল্টে ফেলে দিত। প্যানপ্যানানি তার সহ্য হয় না। দেবীর দেবীর মত মুখ তার চোখের সামনে ভাসছে। পাতলা দুটো ঠোঁট নেড়ে নেড়ে দেবী বলছে, আপনারা একটু ভালো হতে পারেন না! জলোর মনে ফাটল ধরে গেছে। ফাটা সিমেন্টের ফাঁকে ফাঁকে সবুজ ঘাস উঁকি মারছে।

গোপার কাঁধের ওপর হাতের চাপ বাড়িয়ে জলো বললে, 'তুমি আমাকে ক্ষমা করো। দ্যাখো মানুষ যদি একটু ভেবেচিন্তে কথা বলতে শিখত, সংসারে এত অশান্তি থাকত না। তুমিও ভাব না। আমিও ভাবি না। কাটাকাটি শোধবোধ। তুমি আমার মায়ের মত, সেই কথাটাই বারে বারে ভুলে যাই। এই বাড়ি তোমার, এই সংসার তোমার। আমরা তোমার আশ্রয়ে আছি। বউদি, যা হয়ে গেছে গেছে। এসো আবার আমরা নতুন করে শুরু করি।'

গোপা অবাক হয়ে ভিজে ভিজে চোখে জলোর দিকে তাকাল পূর্ণ দৃষ্টিতে। জলো মৃদু হেসে বললে, 'জানো কি আজ একাদশী! আজ তোমার উপোস চলবে না। টিফিন কেরিয়ারটা দাও।'

গোপা আঁচলে চোখ আর মুখ মুছে নিল। কপালে সিঁদুরের টিপ ঘষে গেল। তাতে মুখটা আরও সুন্দর হয়ে উঠল। গোপা বললে, 'তুমি আমাকে মা বললে! আমার মা হবার যোগ্যতা আছে?'

'সব মেয়েই তো মা। হয় রামের মা, না হয় শ্যামের মা। তোমাদের যোগ্যতা ঠিকই আছে। আমাদেরই যোগ্যতা নেই। আমরা মা বলে ডাকতে ভুলে গেছি। জানি আমার মুখে এসব কথা মানায় না। তবে একথাও জেনে রাখ ঋতু যেমন পাল্টায়, মানুষও সেইরকম পাল্টাতে পারে। রত্নাকর বাল্মীকি হয়েছিল। হয়নি?'

কিছুক্ষণ জলোর মুখের দিকে তাকিয়ে থেকে গোপা বললে, 'সত্যিই তুমি পাল্টাবে?'

'বউদি, সূর্য ডুবে গেলে কি হবে জানি না। অন্ধকারকে আমি ভীষণ ভয় পাই। তখন আমার ভেতরটা আরও অন্ধকার হয়ে যায়। তুমি একটা আলো জ্বেলে দিতে পারবে না।'

'আলো! আমার যে তেল নেই। পলতে নেই।'

'তেল ভরো। পলতে লাগাও। দাও দাও টিফিন কেরিয়ারটা দাও। অনেক বেলা হয়ে গেল।'

'টিফিন কেরিয়ার কি হবে?'

'হোটেল থেকে ভাত আর মাংস আনব।'

'না, আজ ছেড়ে দাও। আজ আর আমি কিছু মুখে দিতে পারব না। মানুষটাকে যতই গালাগাল দি, অত্যাচার করি, তার পরিচয়েই আমার পরিচয়। সে ছাড়া আমার অস্তিত্ব নেই। কে বুঝবে, ভালবাসা কাকে বলে! ঘৃণাও তো এক ধরনের ভালবাসা। একটা দিন একটা মানুষের অপেক্ষায় উপোস করে কাটাতে পারব না?'

'তুমি কি ভাবলে আমার জন্যে যাচ্ছি! আমি শুধু তোমার মতই আনব। একাদশীর দিন

সধবাকে উপোস করতে নেই। আঁষ খেতে হয়। আমার মা বলতেন। শুনেছি।'

'তুমি বরং আর একবার ওর খোঁজে যাও। আমি তোমাকে বোঝাতে পারব না, আমার ভেতরটা কেমন যেন হু-হু করছে। পাম্প দেওয়া স্টোভের মতো। ভালো করে খুঁজলে তুমি ঠিকই পাবে। ওকে আগে খুঁজে বের করো, তারপর খাওয়া দাওয়ার কথা ভাবা যাবে।'

'বেশ তাই হোক।'

জলো আবার রাস্তায় নামল। উত্তর দিকে দু' এক কদম হাঁটার পর তার মনে হল, পৃথিবীটা একজন মানুষের পক্ষে বড় বিশাল। এই বাড়ি ঘর, লোকজন। পাক মেরে মেরে রাস্তা এগিয়ে গেছে তো গেছেই। কোথায় সে দাদাকে খুঁজবে! একজন মানুষ যদি সত্যসত্যই হারিয়ে যেতে চায়, কার সাধ্য তাকে খুঁজে বের করে! জলো একবার থমকে দাঁড়াল, তারপর শূন্য মনে এগিয়ে চলল সামনে। অজগরের শ্বাস যেন টেনে নিয়ে চলেছে।

বকুলতলার মোড়ে পেয়ারীর দোকানের সামনে পল্টনের সঙ্গে দেখা। দড়িতে সিগারেট ধরাচ্ছিল। জলোকে দেখে এগিয়ে এল, 'আরে গুরু, তোমার কাছেই যাচ্ছিলুম। কাল কিছু মাল পটকেছি গুরু। সাফাই মাল। শ'খানেক বস্তা। আজই তুলে নাও।'

জলো উদাস গলায় বললে, 'আমার আর মালের দরকার নেই। ব্যবসা তুলে দিচ্ছি।'

'ভক্কিবাজি হচ্ছে গুরু। ব্যবসা তুলে দেবে? মামার বাড়ি।'

'পল্টন, মন মেজাজ ভালো নেই। ভ্যানতাড়া করিসনি।'

'মালটা তাহলে গদার গোলায় তুলে দি।'

'হ্যাঁ দে।'

পল্টন অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল জলোর মুখের দিকে। ভূতের মুখে রাম নাম শুনছে না-কি?

জলো আপন মনে এগিয়ে চলল। কোথায় যাচ্ছে নিজেই জানে না। সামনেই মিত্তিরদের দোলপিঁড়ি। বহুকালের প্রাচীন রাধাজিউর মন্দির। অতিথিশালা। এদিকটায় জলো পারতপক্ষে আসতে চায় না। এলেই মন খারাপ হয়ে যায়। অন্ধকার, অন্ধকার। ঢাউস ঢাউস গাছ। ওপর দিকে ডালপালায় জড়াজড়ি। আকাশ ঢেকে দিয়েছে। জায়গাটা যেন একশো বছর পেছিয়ে আছে। বটের খুপরির মধ্যে শিব-মন্দির। কুঁজো কুঁজো, সামনে নুয়ে পড়া বৃদ্ধারা সামনে এগিয়ে চলেছে। খ্যানখেনে গলায় কথা বলছে। পঞ্চাশ কি ষাট বছর আগে এদের চটকদার যৌবন ছিল। ডুরে শাড়ি পরত। পাতা কেটে চুল আঁচড়াত। পুরুষরা একবার কেন,একশোবার ফিরে তাকাত। এদের মধ্যে গেরস্থ আছে, হাফ-গেরস্থ আছে, বেশ্যা আছে। বৃদ্ধা বেশ্যাদের দেখলেই চেনা যায়। জলো চিনতে পারে।

ঢ্যাং করে একটা ঘণ্টা বাজল। জলোর পিলে চমকে গেল। চারদিকে সোরগোল, ঠ্যালাঠেলি। কাঙালী ভোজন হবে। রোজই হয়। বাবুরা বলেন দরিদ্র-নারায়ণ সেবা। একটা ট্রলিতে চেপে খিচুড়ি ভর্তি বিশাল হাণ্ডা আসছে। মেয়ে-পুরুষ তারস্বরে কাকের মতো চেল্লাচ্ছে। বিশাল গেট। সবুজ লন। শুকনো ফোয়ারা। শুকনো এক জোড়া পরী ভৃঙ্গার বহন করছে। শ্বেতপাথরের উলঙ্গ নারী আর পুরুষ মূর্তি এখানে ওখানে বেঁকে চুরে ত্রিভঙ্গ হয়ে আছে। আরও ভেতরে বিশাল বাড়ি। ময়ূর ডাকছে কর্কশ সুরে।

॥ উনিশ ॥

প্রাচীন কৃষ্ণচূড়া গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে জলো নারী–পুরুষের বুভুক্ষু উল্লাস দেখছে। পাশাপাশি উবু হয়ে বসে এ ওকে কনুই দিয়ে ঠেলছে, ও একে। সকলেই মনে করছে খিচুড়ি আমার। আমারই কথাতে সব হচ্ছে। দৈত্যের মতো তিনটে লোক পরিবেশন করছে। পঙক্তিতে কিছু কুঁচোকাঁচাও আছে। তারা মাঝেমধ্যে চড়চাপড় খাচ্ছে।

প্রথম পাতে খিচুড়ি পড়তেই দল শান্ত হল। এক বুড়ো কাশতে শুরু করেছে। হাঁপানির কাশি। সহজে থামবে না। এ দৃশ্য দেখা যায় না। মানুষও যে পশু তা ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছে। স্থানত্যাগ করার জন্যে পা বাড়িয়েও জলো থমকে গেল। প্রথম সারিতে প্রায় জনাপঞ্চাশ জলোর দিকে পেছন করে ঘাড় নিচু হয়ে বসে আছে। ওপাশে একেবারে শেষের লোকটি কে ? একটু অন্যরকম। পরনে কালো প্যান্ট। সাদা জামা। কাঁধে একটা পাট করা বর্ষাতি। দাদা না ? জামা-প্যান্টে কাদার ছাপ। এক মাথা এলোমেলো চুল। পাগলের মতো দেখতে। জলো পায়ে পায়ে এগোতেই পঙক্তিতে বসে থাকা পাঠ্ঠা চেহারার একটা লোক ঘাড় ঘুরিয়ে বললে, 'অ্যায়, টিকিট আছে টিকিট ?'

লোকটার পায়ের ফাঁকে মোটা একটা লাঠি শোয়ান। পেছন দিকে লাঠির একটা অংশ লেজের মতো রাস্তায় পড়ে আছে। চোখের দু কোণে পিচুটি। সত্যিই এরা পশু হয়ে গেছে। জলো কোনও উত্তর না দিয়ে এগিয়ে গেল। পাশ থেকে লোকটিকে ভাল করে দেখার পর জলোর আর কোনও সন্দেহই রইল না, দাদা। দাদা মাথা হেঁট করে লাইনে বসে আছে, দু'হাতা খিচুড়ির জন্যে। ওপাশ থেকে এপাশে খিচুড়ি এগিয়ে আসছে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে। পথের ধুলোয় ফাটা শালপাতা। ধুলো, কাদা, মলমূত্র মাখামাখি হয়ে পেটে চলে যাবে। কারুর কোনও গ্রাহ্য নেই। জলোর গা ঘিনঘিন করছে।

একেবারে পেছনে দাঁড়িয়ে জলো ডাকল, 'দাদা। দাদা'।

শশধর ঘোলাটে চোখে জলোর দিকে তাকাল। প্রথমে সে বুঝতে পারেনি। যে মুহূর্তে বুঝল ভাই পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে, মুখে একটা ভয়ের ভাব খেলে গেল। দু'হাতে মাথা আড়াল করে মাথা সামনের দিকে আরও খানিক ঝুঁকিয়ে আর্তনাদ করে উঠল, 'আমাকে আর মারিসনি। আমাকে আর মারিসনি। তুই সব নিয়ে নে। বাড়ি নে, জমি নে, তোর বউদিকে নে। সব নে, সব নে। আমাকে আর মারিসনি।' শেষের দিকে শশধরের গলা ধরে এল। প্রায় কেঁদেই ফেলল। আর ঠিক সেই সময় শশধরের মাথা ছুঁয়ে দু হাতা খিচুড়ি নেমে এল পাতে। পাতে পড়ল অর্ধেক, রাস্তায় পড়ল অর্ধেক।

দাদার কথা শুনে জলো আর চোখের জল চাপতে পারল না। চোখের পাশটা থেঁতলে কালচে লাল। জলোর আঙুলের গোমেদের আঙটিটা ওখানে ঢুকে গিয়েছিল ঘুসি মারার সময়। পাশটা ফুলে উঠে চোখ প্রায় ঢেকে দিয়েছে।

শশধরের বগলের তলা দিয়ে দুটো হাত গলিয়ে জলো দাদাকে পেছন থেকে টেনে তুলল।

শশধর পেছন দিকে হেলে থেকে, কাঁদো কাঁদো গলায় বলতে লাগল, 'আমাকে একগাল খেতে দে। তারপর মারিস। তারপর যত খুশি মারিস। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে রে।'

কোনও রকমে দাদাকে লাইনের বাইরে এনে, জলো আবেগ-অবরুদ্ধ চাপা গলায় বললে, 'কি হচ্ছে দাদা? তোমার কি কেউ নেই!'

যারা লাইনে বসে গোগ্রাসে খিচুড়ি খাচ্ছে, তারা এতই ব্যস্ত যে শশধর আর জলোর দিকে নজর দেবার সময় নেই। শশধর উঠে যাওয়া মাত্রই, খালি জায়গায় আর একজন বসে পড়েছে। দাদাকে বুকের পাশে চেপে ধরে জলো কাঁদছে আর বলছে, 'তোমার কি কেউ নেই?'

শশধর মাথা দোলাতে দোলাতে ভাঙা ভাঙা গলায় বলতে লাগল, 'কে আছে আমার? আমি ছাড়া আমার কে আছে? তুই সব নিয়ে নে জলো। আমি স্ট্যাম্প পেপারে লিখে দিচ্ছি। বাড়ি নে, জমি নে, তোর বউদিকেও নিয়ে নে।'

রাস্তার পাশে, বাঁধা-বটতলার বেদীর ধারে, ছায়া ছায়া অন্ধকারে শশধর আর জলো। দাদার বুকে মুখ গুঁজে জলো ফুলে ফুলে উঠছে। আবেগ চেষ্টা করেও চাপতে পারছে না। রাস্তা, লোক চলাচল, দু'একজন তাকাচ্ছে। জলো জানে, রাজপথে এসব মানায় না, কিন্তু আজ বড় অসহায়। মাতালের অবস্থা। কি বলছে কি করছে, কোনও কিছুর ওপরেই নিয়ন্ত্রণ নেই। জলো চাপা আবেগে ক্রমান্বয়ে বলে চলেছে, 'আমাকে ক্ষমা করো। দাদা আমাকে ক্ষমা করো। সব আছে তোমার। সবাই তোমার। তুমি বাড়ি চলো।'

শশধরের মাথায় বিশেষ কিছু ঢুকছে না। তার চোখের সামনে শুধুই কুয়াশা। সংসারের কাছ থেকে তার আর কিছুই পাবার আশা নেই। ভবিষ্যৎ মুছে দিয়েছে ভাগ্য। অতীত ভুলে গেছে, ভবিষ্যৎ অদৃশ্য। বর্তমান যেখানে নিয়ে যায়! শশধর আর বাঁচতে চায় না। নতুন করে আর কিছু সে শুরু করতে চায় না। বিশ্বাস করে সে বহুবার ঠকেছে। আর কাউকে সে বিশ্বাস করতে চায় না। সে মরতে চায়। একটু ভালবাসা পেতে চেয়েছিল। একটু দিতেও চেয়েছিল। কোথাও একটু গোলমাল ছিল। জীবনটাই বিষিয়ে গেল।

ঠুং ঠুং করে খালি একটা রিকশা চলেছে। জলো দাঁতে দাঁত চেপে, আবেগ সংযত করে ডাকল 'রিকশা'।

খানদান রিকশা-চাপিয়ের ডাক প্রবীণ রিকশাঅলা চেনে। দু'পা এগিয়ে গিয়েছিল। থেমে পড়ে পিছিয়ে এল। রিকশা পেতে দিল সামনে, 'উঠিয়ে।'

'দাদা ওঠো। উঠে পড়। অনেক বেলা হল। তোমার খিদে পেয়েছে।'

শশধর জলভরা চোখে জলোর দিকে তাকাল। সে জানে, এসবই অভিনয়। কাল জলো মেরেই ফেলত। আজ আর ছাড়বে না। ভাই তার অনেক কায়দা জানে। অনেক অভিনয় জানে। দলবলের অভাব নেই। এই রিকশায় চাপিয়ে নিয়ে যাবে এমন এক জায়গায় যেখানে তার মত আরও অনেক শশধর নোনা মাটিতে জরে জরে নামহীন কঙ্কাল হচ্ছে।

জলো বললে, 'কি হচ্ছে কি! ওঠো, উঠে পড়।'

শশধর জলভরা চোখে ম্লান হেসে বলল, 'খুব কষ্ট দিবি না তো। তোর সবচেয়ে সহজ উপায়ে মারিস ভাই।'

কোনও উত্তর দিল না জলো। দেবার কিছু নেই। মানুষের অতীত এমনই এক অসুখ যা মানুষকে বসন্তের মত দাগরাজি করে রেখে যায়। কথায় কিছু হবে না। কাজ দিয়ে প্রমাণ করতে হবে। ক্ষত-বিক্ষত মানুষটির মনে বিশ্বাস ফিরিয়ে আনতে হবে। রিকশায় উঠে শশধর হাত জোড় করে দুপাশে নমস্কার করতে লাগল। মনে মনে বলতে লাগল, আর যেন ফিরে আসতে না হয় এই খুনে পৃথিবীতে।

বেলা এগিয়েছে বেশ! তেরছা ছায়া পড়েছে পথে। শশধর নতুন চোখে পৃথিবীকে দেখছে। যাবার আগে মানুষ এই চোখেই দেখে বোধহয়। উষ্ণ বাতাস বইছে। উঁচু উঁচু বাড়ির ঝুল

বারান্দার রেলিঙে কনুইয়ের ভর রেখে, চুল এলিয়ে দাঁড়িয়ে আছে সুখী সুখী চেহারার মেয়েরা। ঝক ঝকে গাড়ি চেপে হুস করে বেরিয়ে যাচ্ছে অবাঙালী পরিবার। শশধর জানে এরা কোথায় যাচ্ছে। মার্কেটে। সিনেমায়। এরা আরও অনেক দিন এই রকম দাপটেই বেঁচে থাকবে। শশধর থাকবে না। রিকশা চলেছে ধীর মন্থর লয়ে ঠুং ঠুং করে। শশধরের হাসি পাচ্ছে, সে তো মরেই গেছে। নতুন করে কি আর তাকে মারবে। এ তো মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা! শশধর ক্লান্তি জড়ান গলায় জিজ্ঞেস করল, 'এখন আমাকে কোথায় নিয়ে যাবি?'

'বাড়িতে।'

'সেখানে গোপার সামনে সুবিধে হবে! অন্য কোথাও করলে হত না!'

'তুমি আমাকে বিশ্বাস করতে পারছ না দাদা!' জলোর গলায় আবার আবেগ এসে গেল। চোখে জল এসে গেছে। রিকশা চলছে ঠুংঠুং করে। দু'জনেই সামনে পেছনে পাশে দুলছে। গায়ে গা লেগে যাচ্ছে। শশধরের জামাপ্যান্ট কাদা মাখামাখি। মাঝে মাঝে চোখ ঢুলে আসছে। মাথা ঝুলে পড়ছে সামনে। এরই মাঝে এক এক চটকা স্বপ্ন উঁকি দিয়ে যাচ্ছে। একবার গোপাও উঁকি দিয়ে গেল। ডুরে শাড়ি। শশধবকে ঠোঁট উল্টে দেখাচ্ছে। যেমন দেখাত বিয়ের পরে। দাম্পত্য জীবনের প্রথম দিকে, 'দ্যাখো তো ঠোঁটটা লাল হয়েছে! আজকাল খয়ের বড় বিশ্রী। একেবারে বাজে।'

রিকশার ঝাঁকানিতে শশধরের চটকা ভেঙে যাচ্ছে। অবাক চোখে তাকাচ্ছে। সুখের অতীত থেকে দুঃখের বর্তমানে ফিরে এসে মন সইয়ে নিতে সময় লাগছে। তার মাঝেই আবার ঘুম এসে যাচ্ছে। আবার স্বপ্ন। পুরীর সমুদ্রের ধারে সে আর গোপা। জলের কোল ঘেঁষে হাঁটছে গোপা। শশধর হাতচারেক পেছনে। গোপা শাড়িটাকে টেনে পায়ের অনেকটা ওপরে তুলেছে। ফর্সা পায়ের গোছ। অদূরে নীল ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। সাবানের মতো সাদা ফেনা ফিসফিস করে গোপার পায়ের পাতা ছুঁয়ে যাচ্ছে। পদচিহ্ন পড়ছে, আবার মুছে মুছে যাচ্ছে। বহু বর্ণের ঝিনুক ঠিকরে ঠিকরে পড়ছে।

শশধর ঢুলছে, জাগছে, ঘুমোচ্ছে। তৃষ্ণায় গলা শুকিয়ে যাচ্ছে। তন্দ্রার মধ্যেই চুক চুক শব্দ করছে মুখে। রিকশা চলেছে ঠুংঠুং করে।

দেবী শিবপদ আর কৃষ্ণপদকে বললে, 'আপনারা এবার বাইরে যান, আমি দেখছি। দরজাটা ভেজিয়ে দিচ্ছি।' দেবী দরজা বন্ধ করে, তনুর পাশে গিয়ে দাঁড়াল। দেবী জানে, কি হয়েছে তনুর। আচমকা পড়ে যাওয়াব ফলে, পেটে যে নতুন প্রাণটি ধীরে ধীরে মানুষের অবয়ব নিচ্ছে, সে চমকে উঠে স্থান পরিবর্তন করায় টান ধরেছে। কিছুই না, তলপেটে নরম হাতের তালু ফেলে আস্তে আস্তে স্বস্থানে এনে দিতে হবে। ভয়ের কিছু নেই।

কৃষ্ণ আর শিব অসহায় দুই শিশুর মতো বাইরে পায়চারি করছে। এ-দেয়াল থেকে ও-দেয়াল। ও-দেয়াল থেকে এ-দেয়াল। যেন কড়া কোনও গেম-টিচার দুই শিশুকে হাজার বার পায়চারি করার আদেশ দিয়েছেন। তবে বাড়ি যাবার ছুটি মিলবে। দু'জনে পাশাপাশি একই মুখে হাঁটছে না। একজন এ-মুখো, আর একজন ও-মুখো। মাঝে মাঝে মুখ চাওয়াচাওয়ি হচ্ছে। চিন্তায় কথা মরে গেছে। কৃষ্ণ হঠাৎ ফিসফিস করে বললে, 'কি বিপদ বল তো ভাই?'

শিব ফিসফিস করে বললে, 'আর বলিস না। আমি আর কিছু চিন্তা করতে পারছি না।'

'মাকে ডাক। মাকে ডাক। আমি কিন্তু সেই থেকে ডেকেই চলেছি।'

'আমিও। নিরবচ্ছিন্ন ডেকে যাচ্ছি।'

দুজনে দু'জনকে অতিক্রম করে, দু'পাশের দেয়াল ছুঁয়ে আবার ফিরে এল। যেন তাঁতের মাকু চলেছে।

বাইরের বারান্দা থেকে ডাক ভেসে এল, 'হ্যাললো, জেণ্টলম্যান ? ইজ দেয়ার এনিবডি ইনসাইড।'

কৃষ্ণ আর শিব দুজনেই থমকে দাঁড়াল। কৃষ্ণ শিবের খুব কাছে সরে এসে ফিসফিস গলায় বললে, 'কে রে ?'

শিব চাপা গলায় বললে, 'পুলিশ নয় তো !'

'হ্যালো জেণ্টলম্যান।'

দেবী দরজা খুলে বেরিয়ে এল, 'বাবা, দরজাটা খুলে দিন। গাড়ি এসেছে।'

'ও গাড়ি !' শিব ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বললে, 'বুঝলি গাড়ি এসেছে। গাড়ি। এইবার সাত্যকি চলে যাবে। শিব দরজা খুলতে এগোচ্ছে। বাইরে আর একটা গাড়ি থামার শব্দ হল। জ্ঞানেশ আর নীলাও এসে গেছে।

জোড়া জোড়া পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে।

শিব দরজা খুলতেই সামনে গোমেস। ছ'ফুট লম্বা, বিশাল চেহারা। যেন যমদূত। শিবও বেঁটে নয়, তবে এ যেন একেবারে মানুষ-দৈত্য। গোমেস শিবের দিকে ডান হাত বাড়িয়ে দিল করমর্দনের জন্যে।

'হ্যালো স্যার। আয় অ্যাম্ ফ্রম পার্ক আণ্ডারটেকার। হোয়ার ইজ দি বডি !'

শিবকে উত্তর দিতে হল না। জ্ঞানেশ পেছন থেকে বললে, 'কাম উইথ মি।'

জ্ঞানেশের পেছনে নীলা। শিব পলকের জন্যে তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল। দরজার পাশে সরে গিয়ে সকলকে ঢুকতে দিল। নীলা ভেতরে এসে দেয়াল ঘেঁষে দেবীর পাশটিতে দাঁড়াল। চাপা গলায় নিজের পরিচয় দিল 'আমার নাম নীলা।'

মিশুক দেবী নীলার একটা হাত দু মুঠোয় জড়িয়ে নিয়ে বললে, 'আমাব নাম দেবী।'

কিছু দূরে দাঁড়িয়েছিল কৃষ্ণ। নীলা দেবীর কানে কানে জিজ্ঞেস করল, 'উনিই সেই বিখ্যাত শিল্পী ?'

দেবী ঘাড় নাড়ল। কৃষ্ণ রক্তের সম্পর্কে দেবীর কেউ নয়, কিন্তু মাথা নেড়ে সায় দেবার সময় তার গর্ব হল। অদ্ভুত এক ধরনের আনন্দ।

গোমেস বারান্দা থেকে চিৎকার করে তার সহকারীদের বললে, 'ব্রিং দি কফিন।'

বাগানের পথ ধরে প্রায় ছ'ফুট লম্বা কফিন আসছে। খোলা দরজা দিযে কৃষ্ণ দেখতে পাচ্ছে। সুন্দর কারুকার্য করা। তার মনটা নেচে উঠল। কোনও দিন সে কফিন দেখেনি।

'কফিন, কফিন। কি সুন্দর কফিন !' কৃষ্ণ ছেলেমানুষের মতো ছুটে গেল।

নীলা দেবীর কানে কানে বললে, 'একেই বলে শিল্পীর মন। যার ভেতর মৃত্যু থাকবে, সেই মৃত্যুর আধার দেখার জন্যে ছেলেমানুষের মতো কি আনন্দ !'

কৃষ্ণ ভাইকে ডাকছে, 'শিব,আয় আয় কফিন দেখবি আয়। কি সুন্দব দেখে যা, দেখে যা।'

নীলা দেবীকে জিজ্ঞেস করল, 'শিব কে ?'

'ওনার ভাই। বড় কৃষ্ণ, ছোট শিব।'

'আই সি। ইনিই সেই বিখ্যাত শিক্ষক !'

দেবী সাহস করে জিজ্ঞেস করল, 'আপনার পরিচয় ?'

'আমার তেমন কোনও পরিচয় নেই। পামেলা বোসের সঙ্গে একটা অরফ্যানেজ চালাই।'

দেবী আর কিছু জিজ্ঞেস করার সাহস পেল না। কে পামেলা বোস ! অরফ্যানেজ চালিয়ে কি হয়। মাথায় ঢুকবে না। দেবীদের পায়ের কাছেই কফিন নামল। কাঠের গন্ধ। পালিশের গন্ধ। কফিনের ডালার ওপর খোদাই করা লতাপাতা জড়ান একটা ক্রুশ। শিব আর কৃষ্ণ দুই বালকের মতো ঝুঁকে পড়ে দেখছে।

পরিবেশ ভুলে কৃষ্ণ বললে, 'কফিন কি সুন্দর হয় দ্যাখ। আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে।'

শিব বললে, 'আমারও।'

'একঘেয়ে পুড়তে আর ভালো লাগে না রে ? কি রকম একটা অসভ্য ব্যাপার। জানিস তো চিতায় তুলে শেষ কাপড়ের টুকরোটাও টান মেরে কোমর থেকে খুলে নেয়। গদগদে খানিকটা পিণ্ডি গিলিয়ে দেয়। চুল পুড়ছে, গাঁট ফাটছে, মাথার ঘিলু ঠেলে বেরিয়ে আসছে। বীভৎস কাণ্ড। ভাবলে আর মরতে ইচ্ছে করে না।'

'যা বলেছিস, আমারও মরতে ইচ্ছে করে না।'

'তবু, আমাদের মরতেই হবে, চিতায় চড়াবেই চড়াবে। জেন্টলম্যান, আমাদের ভেতরটা একবার দেখাবেন। ইনসাইড অফ দি কফিন। দিস নাইস ইটারন্যাল রেস্টিং প্লেস।'

গোমেস হেসে বললেন, 'সুন ইউ উইল সি দি ইনসাইড অফ ইট।'

সাত্যকি বোসের সাদা চাদর মোড়া দেহ বেরিয়ে আসছে ঘর থেকে শূন্যে ভেসে ভেসে। গোমেস কফিনের ঢাকা খুলে দিলেন। ভেলভেটের লাইনিং। কর্পুরের গন্ধ ভেসে গেল বাতাসে। শিব আর কৃষ্ণ দুজনেই স্তম্ভিত। ধীরে ধীরে সাত্যকিকে শোয়ান হল কফিনে। শরীর শক্ত হয়ে গেছে। যাকে বলে মরে কাঠ। শান্ত মুখশ্রী। যুদ্ধ শেষ। রণক্ষেত্র ছেড়ে সৈনিক বিদায় নিয়ে চলেছে শান্তির স্বর্গে।

কৃষ্ণ ফিসফিস করে বললে, 'কিছুতেই আর কথা বলবে না, কি বল ?'

'না, চির-নীরব হয়ে গেছে।'

'এক সময় ওই মুখ কত কথা বলেছে। রসিকতা করেছে। মনে আছে, প্রাণ খুলে কেমন হাসত। যাই বলিস, বেশ একটু লোভীও ছিল। ভাল খাব, ভাল পরব। শেষ খাওয়ানো আর হল না।'

কৃষ্ণর গলা ধরে এল, 'খুব রোম্যান্টিক আর প্রেমিক ছিল। পৃথিবীটা সব সময় ওর চোখে নীল ছিল। চাঁদের আলোর রাত ওর ভীষণ প্রিয় ছিল। গাছপালা আর চাঁদের আলোর ঝিলিমিলির দিকে তাকিয়ে বলত, কৃষ্ণ, কোথাও না কোথাও, কোনও বনের ধারে, সরোবরের কিনারে, এখনও রাধাকৃষ্ণ লীলা করেন। আমরা জানতে পারি না। এখনও বাঁশী বাজে, নূপুরের শব্দ হয় ঝুন ঝুন করে। বলতে বলতে কেমন যেন হয়ে যেত। অথচ সাত্যকি খ্রীস্টান ছিল।'

গোমেস বললেন, 'জেন্টলমেন, নাও আই উইল ফিক্‌স দি লিড।'

কৃষ্ণ কাঁদো কাঁদো গলায় বললে, 'জাস্ট এ মিনিট। আর তো দেখতে পাবো না। হি উইল বি লস্ট ফর এভার।'

কৃষ্ণর দু চোখ বেয়ে জলের ধারা নেমেছে, একের পর এক জলবিন্দু চিক চিক করে গড়িয়ে পড়ছে দুপাশের গাল বেয়ে।

'শিব, আমি কিছু দিতে চাই। এমন কিছু যা ওর সঙ্গে যাবে স্মৃতিচিহ্নের মত। দেখলেই মনে পড়বে বহু দূরে, পৃথিবীতে কৃষ্ণ বসে আছে, গভীর রাতে একা জেগে। বন্ধু কৃষ্ণ। অ্যাণ্ড স্লোলি, ভেরি স্লোলি টার্ন্‌স দি ওয়ার্লড ফ্রম ডার্কনেশ টু লাইট, ফ্রম লাইট টু ডার্কনেশ।' কথা বলতে বলতে কৃষ্ণ ডান হাতের মধ্যমার আঙটি খুলে ফেলেছে। কেউ কিছু বোঝার আগেই টুপ করে কফিনের ভেতর ফেলে দিল।

'নাউ ক্লোজ ইট, ক্লোজ ইট।' বলতে বলতে কৃষ্ণ নেশাগ্রস্তের মত পেছনের বাগানের দিকে এগিয়ে গেল। শিব হতভম্বের মতো একা দাঁড়িয়ে। দেবী পাশে এসে দাঁড়াল। সে এই মুহূর্তে আরও আরও শূন্যতার ছবি দেখতে পাচ্ছে। ঝরাপাতার সংসার। এক, দুই, তিন, পাতা ঝরছে। কৃষ্ণ, শিব। সব শূন্য। সমস্ত পরিচয় ধোয়া স্লেটের মত মুছে যাওয়া।

কফিন উঠে গেছে দুজনের কাঁধে। মাঝখানে গোমেস স্তম্ভের মত হাত দিয়ে ভার রেখেছেন। বহনকারীদের মুখ গম্ভীর। চলন ধীরস্থির। ঘর পেরিয়ে বারান্দা। ধাপ বেয়ে বাগানের পথে। দূর থেকে দূরে। সাত্যকি চলে যাচ্ছে। আর ফিরবে না। কোনও দিন তার

কণ্ঠস্বর আর শোনা যাবে না।

শিবের চোখ ঝাপসা হয়ে আসছে। সবার পেছনে নীলা। বাতাসে তার শাড়ির আঁচল উড়ছে। বারান্দার একপাশে জ্ঞানেশ দাঁড়িয়ে আছে। রাস্তায় পা রেখে নীলা ফিরে তাকাল। ইশারায় জ্ঞানেশকে ডাকল।

'আপনি কি যাবেন ?'

'প্রয়োজন আছে ?'

'অপ্রয়োজনে আর একদিন আসুন না।'

'কোথায় ?'

'দুটো জায়গা তো চেনা হল আজ। তৃতীয় আর একটা জায়গা আছে।'

'হ্যাঁ, তৃতীয় আর একটা জায়গা। সেন্ট্রালি সিচুয়েটেড। নামটা আপনার শোনা বিজ্ঞাপনের কল্যাণে গ্যালাকসি বোটিক। সেখানেও আসতে পারেন। অবশ্যই সন্ধের পর। আচ্ছা গুডবাই।' নীলা মৃদু হেসে এগিয়ে গেল গাড়ির দিকে। স্টেশান ওয়াগান। প্রচুর জায়গা।

জ্ঞানেশের ঘোর লেগে গেছে। প্রেম ? প্রেম আছে এখনো ? ছাত্র জীবনের সঙ্গে শেষ হয়ে যায়নি। নীলা। মেঘের মত চুল। ব্যালে ড্যান্সারের মত শরীর। শাড়ির আঁচল। গাড়িতে উঠতে উঠতে নীলা আর একবার তাকাল। সেই হাসি। হাত নাড়ছে। জ্ঞানেশ হাত নাড়ল। গাড়ি ধীরে ধীরে ব্যাক করছে। উইণ্ডস্ক্রিনে গোমেসের বিশাল ভরাট মুখ। পাশে নীলার ধারাল মুখ। সরে যাচ্ছে। ক্রমশই সরে যাচ্ছে দূরে। এক বোতল মদ খেলে যেমন নেশা হয়, জ্ঞানেশের মনে হল তারও সেই রকম নেশা হয়ে গেছে। জীবন আর মৃত্যু চলেছে একই বাহনে। টাকার এ-পিঠ আর ও-পিঠ। গাড়ি মুখ ঘুরিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল। শেষ। এতক্ষণের নাটক শেষ হয়ে গেল।

নেশা কাটবার জন্যে জ্ঞানেশ গেটের সামনেই জগিং শুরু করল। জ্ঞানেশে জ্ঞানেশ ফিরে এস। রঙিন আকাশে ডানা মেল না। জোর পাবে না। পড়ে যাবে। প্রাত্যহিক জগতে ফিরে এস। কতক্ষণ জগিং চলত কে জানে! শিবপদ ডাকল, 'জ্ঞানেশ।'

নেশার ঘোরেই জগিং হচ্ছিল। মাস্টারমশাইয়ের গম্ভীর ডাকে আকাশ থেকে নেমে এল জ্ঞানেশ। মনে মনে ভীষণ লজ্জা পেয়ে গেল। এ কি করছিল সে! এমন এক জগতে চলে গিয়েছিল, যে জগতে গুরুজন-টুরুজন কেউ নেই!

জ্ঞানেশ মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে বারান্দায় উঠে আসা মাত্রই, কৃষ্ণ ঘরের ভেতর থেকে বলে উঠল, 'যাঃ'।

শিব বললে, 'কি হল দাদা ?'

'সাংঘাতিক ভুল হযে গেছে রে শিব। সাত্যকির জুতো দু'পাটি পড়ে আছে। বেচারা খালি পায়ে চলে গেল।'

'কি হবে ?'

জ্ঞানেশ বললে, 'পৌঁছে দিয়ে আসব মাস্টার মশাই !'

'আবার অত দূরে যাবে! তোমার যে আর একটা কাজ আছে বাবা। সহজে কি নিষ্কৃতি পাবে!'

'কি কাজ মাস্টার মশাই ?'

'আবার তোমাকে আর এক জায়গায় ছুটতে হবে বাবা।'

॥ কুড়ি ॥

কৃষ্ণ বললে, 'শিব, বেলা অনেক হল। তোর জন্যে আর আমি চুটিয়ে রেঁধেছি। চল, দুই ভায়ে মিলে যা হয় দুটো মুখে দিয়ে আসি।'

শিব করুণ কণ্ঠে বললে, 'দাদা, আজ আর এই অবেলায় কিছুই খেতে ইচ্ছে করছে না। তা ছাড়া, দ্যাখো, এরা সবাই উপোস করে আছে। জ্ঞানেশ, দেবী, তনু।'

'তা ঠিক, তা ঠিক। তা আমরা বরং সবাই মিলে ভাগাভাগি করে খাই।'

জ্ঞানেশ বললে, 'মাস্টারমশাই, আমি ব্যবসাদার মানুষ। কত দিন আমার খাওয়া হয় না। কারখানায় সারাটা দিন কাপের পর কাপ চা খেয়ে কেটে যায়। তাছাড়া, বাড়িতে আমার রান্না হয়ে আছে।'

'শিব বললে, 'তুমি সঙ্কোচ করছ। আমাকে আপন ভাবতে পারছ না?'

'ছি ছি, তা কেন, তা কেন? অন্য যে কোনও দিন আপনার বাড়িতে পাত পেড়ে খেয়ে আসব। আজ আমার ক্ষিদের অবস্থা শোচনীয়। মাস্টারমশাই, একটু আগে কি যেন একটা কাজের কথা বলছিলেন?'

'ও হ্যাঁ। তনু। তনু কেমন আছে দেবী?'

'জোর করে শুইয়ে রেখে এসেছি। ও মা, ওই যে উঠে পড়েছে।'

শিব সেদিকে তাকিয়ে বললে, 'তুমি কেমন আছ মা এখন?'

'আমার তো কিছুই হয় নি বাবা।'

তনুকে কেমন যেন একটু পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। যেন একটা ঝড় বয়ে গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। উদাস স্নিগ্ধ চোখের দৃষ্টি। ঠোঁটের কোণে ম্লান হাসি।

কৃষ্ণ বললে, 'ঈশ্বর এই মেয়েটাকে খোদ নিজের হাতেই সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর কারখানার দু' নম্বর কোনও কারিগরের হাতে ছেড়ে দেন নি। অত বড়লোকের বউ, কিন্তু কোনও অহঙ্কার নেই। লক্ষ করেছিস শিব! আমরা হলে গুমরে মাটিতে পা পড়ত না।'

শিব অল্পক্ষণ চুপ করে থেকে বললে, 'ওইখানেই আমার চরম পরাজয় দাদা। আমি এমন এক গাছ, যে গাছের ফলটি বড় টক! পাতে দেওয়া যায় না। সারাজীবন নিজে নিরহঙ্কারী, নির্লোভ হবার সাধনা চালিয়ে গেলুম। বাইরে থেকে দেখলে আমাকে সেই রকমই মনে হবে; কিন্তু ভেতরে অবচেতনে সব ঘাপটি মেরে বসে আছে। নিজেও জানি না। সব ফুটে উঠল সন্তানে।'

দেবী বললে, 'বাবা, এই সব আলোচনা করার সময় কিন্তু এটা নয়।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক বলেছ মা। আর তা ছাড়া, একজনের অসাক্ষাতে তার সমালোচনা করা এক ধরনের অসভ্যতা। জ্ঞানেশ! জ্ঞানেশ কোথায় গেলে?'

'এই যে মাস্টারমশাই আমি আপনার পেছনে।'

'শোনো বাবা, তুমি এইবার আর একটু কষ্ট করে তনুকে পৌঁছে দিয়ে এস। বেলা পড়ে

আসছে। অমিত হয়তো কিছু মনে করবে। আমার মায়ের ওপর রাগারাগি করবে। ছেলেটা বড় কড়া কড়া কথা বলে।'

তনু বললে, 'আমি যাব না। আমি চলে এসেছি। আমি আপনার কাছেই থাকব। আমার ওখানে থাকতে ভাল লাগছে না।'

শিব অসহায়েব মতো একবার করে সকলের মুখের দিকে তাকাল, তারপর কোনও দিকেই না তাকিয়ে বলল, 'তাহলে কি হবে?'

কৃষ্ণ বললে, 'ভীষণ মজা হবে। সেই যে রে, সেই প্রবাদটা, কান টানলে মাথা আসে। মাথাটা চলে আসবে। অমু ফিরে আসবে সুড়সুড় করে। ড্যাম ডিফিট। ড্যাম ডিফিট।'

তনু বললে, 'তাকে আপনারা চেনেন না। সে আর ফিরবে না। বাবা ঠিকই বলেছেন, ভীষণ অহঙ্কারী। অসম্ভব তার অহঙ্কার। ভীষণ তার উচ্চাশা। স্ট্যাটাস কনসাস। সে অতীত ভুলতে চায়। পরিচয় মুছে ফেলতে চায়। আর, আর..।'

শিব বললে, 'থাক মা। তুমি হিন্দু রমণী। পতি-নিন্দা কোরো না। তাতে তোমারই ক্ষতি হবে। তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো। আমি তোমার ভালই করতে চেয়েছিলুম। তবে, তবে..।'

কৃষ্ণ বললে, 'পার্বতী কিন্তু শিবের চোদ্দ পুরুষ উদ্ধার করে দিতেন।'

'পার্বতী যে একদিকে আবার শিবের মা ছিলেন গো। মা অন্নপূর্ণা হয়ে শিবকে ভিক্ষা দিচ্ছেন।'

জ্ঞানেশ বললে, 'তাহলে কি হবে মাস্টাবমশাই! আমি চলে যাব!'

'না, তুমি তনুকে নিয়ে যাবে। ও তো আমার অবুঝ মেয়ে নয়। স্বামীই ওর প্রথম। ওর প্রধান উপাস্য দেবতা। তস্মিন তুষ্টে জগৎ তুষ্ট। মা তনু!'

তনু নীরব।

'আমাকে ভুল বুঝো না মা। কর্তব্য আগে। ডিউটি ফার্স্ট, সেন্টিমেন্ট লাস্ট।'

তনু কান্না চাপতে চাপতে বললে, 'আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন বাবা! বেশ। আমি চলেই যাই।

'তাড়িয়ে?' শিবের গলা ভারি হয়ে উঠছে, 'তুমি যে আমার লক্ষ্মী, তুমি যে আমার মা। তোমাকে আমি তাড়াতে পারি! তোমার না থাকা মানে আমার মানসিক মৃত্যু। তবু অমিত যে আমার সন্তান। আমার জীবনের সবচেয়ে দুর্বল স্থান। আমি প্রার্থনা করি তোমরা সুখী হও। ওর বয়েস এখন কম। পৃথিবীটাকে এখনও ওর দেখতে অনেক বাকি। আর একটু পুড়ুক, আর একটু ঝলসাক। ভেতর থেকে একটা খাঁটি মানুষ বেরিয়ে আসবে। আসতেই হবে। ব্লাড লাইন, রক্তের ধারা, সেই ধারা সহজে কি মানুষ ভুলতে পারে!'

শিব এগিয়ে গিয়ে তনুর মাথায় হাত রাখল। তনুর শরীর আবেগে থিরথির করে কাঁপছে। কারুর নজরে পড়ার উপায় নেই। মুখ নিচু করে আছে। ফোঁটা ফোঁটা চোখের জল পড়ছে পায়ের কাছে মেঝেতে।

শিব আবেগের গলায় বললে, 'তনু। মা আমাব। আমি সব সময় তোমার পাশে আছি। তোমার কাছে আছি। তুমি যে আমার মনের সিংহাসনে বসে আছ মা।'

তনু পেছনের আসনে এলিয়ে বসে আছে। দুপাশ দিয়ে শহর ছুটে চলেছে হুহু করে। স্পষ্ট হয়ে দু'চোখে কিছুই ধরা পড়ছে না। ঘষা কাঁচের মধ্যে দিয়ে যেন তনু সব কিছু দেখছে। ব্লটিং পেপারে আঁকা ছবির মত। জ্ঞানেশ সামান্য আড় হয়ে বসে আপন মনে গাড়ি চালাচ্ছে। তনুর সঙ্গে আজই তার প্রথম আলাপ। আলাপ বললে ভুল হবে। প্রথম দেখা। তনু যেভাবে নিশ্চেষ্ট, নির্বাক হয়ে বসে আছে, তাতে কথা বলার ইচ্ছে থাকলেও সাহস নেই। জ্ঞানেশের ভাবনায় এখন অনেক কিছু তালগোল পাকাচ্ছে। নীলা দগদগ করছে। বব-করা একমাথা

রূপালি চুল। পামেলা বোস। হাসার সঙ্গে সঙ্গে মুখের ত্বক কুঁচকে যাচ্ছে। চোখের চামড়ায় ফাট ধরছে। ভাঁজে ভাঁজে ফুলে উঠছে। চেলা কাঠের মতো সাত্যকির শক্ত দেহ কফিনে ঢুকছে। দৈত্যের মত বিশাল গোমেস দরজা আগলে দাঁড়িয়ে আছে। ধ্রুববাবুর ডান হাতে গভীর খালের মত দীর্ঘ ক্ষতচিহ্ন। দেয়ালে ঠেস দিয়ে রাখা একটা ক্রাচ। একটা দিনের পক্ষে যথেষ্ট।

উল্টো দিক থেকে হুহু শব্দে একটা মিনি ছুটে আসছে দামাল দৈত্যের মতো। জ্ঞানেশ টুক করে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল। কলকাতার রাস্তায় গাড়ি চালান যেন মৃত্যুর সঙ্গে গাদি খেলা। একচুল এদিক-ওদিক মানেই মোড় হয়ে চিরকালের জন্যে কোর্টের বাইরে বেরিয়ে যাওয়া। তবু ভালো লাগে। মৃত্যুর হাত ফস্কে ফস্কে বেরিয়ে যাওয়ার স্নায়বিক উত্তেজনা যেন বেঁচে থাকার চাবুক।

জ্ঞানেশের একবার মনে হল তনুকে জিজ্ঞেস করে, মাস্টারমশাইকে একা ফেলে রেখে তারা চলে গেল কেন? সংযত করে নিল নিজেকে। অভদ্রতা হবে। কত অবিচারই তো ঘটে চলেছে সারা পৃথিবী জুড়ে। কটারই বা প্রতিকার হয়। ভাবতে ভাবতে জ্ঞানেশ আবার অরফ্যানেজ চলে গেছে। শিশুদের কলকণ্ঠ শুনতে পাচ্ছে। দু হাত তুলে ছুটে আসছে চারপাশ থেকে।

তনু উঃ করে উঠল।

জ্ঞানেশ জিজ্ঞেস করল, 'কি হল আপনার?'

'অসম্ভব মাথা ধরেছে।'

'কোল্ড ড্রিংকস খাবেন? গাড়ি দাঁড় করাব?'

'আপনি খাবেন?'

'আমার গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। সেই সকাল থেকে যা হচ্ছে!'

'কি আশ্চর্য ব্যাপার দেখুন! মানুষ যে কখন কোথায় মারা যাবে কেউ বলতে পারবে না। ভদ্রলোক বেড়াতে এলেন। এই সব ভাবলে সত্যিই ভয় হয়। সেই হাত। অদৃশ্য সেই হাত! উঃ, মাথাটা ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

'একটা অ্যান্টি-হেডএক খাবেন কোল্ড ড্রিংকস দিয়ে? কিনে নেবো?'

'না, শুধু কোলডই খাওয়া যাক।'

জ্ঞানেশ একটা ভালো দোকানের পাশে গাড়ি দাঁড় করাল। দোকানের নামটি ভারি কাব্যিক—তৃষ্ণা।

অমিতাভ চাকা-লাগানো রিভলভিং চেয়ার ঠেলে টেবিল থেকে উঠে পড়ল। দিনের কাজ শেষ। সারাদিন আজ বহুত ঝামেলা গেছে। একের পর এক। তিন তিনবার ম্যানেজিং ডিরেক্টারের সঙ্গে আলোচনায় বসতে হয়েছে। মনে হচ্ছে মাসখানেকের মধ্যেই মিড্ল ইস্টে ছুটতে হবে। ব্রিফ-কেস সবে বন্ধ করেছে, ডিরেক্টারের পি-এ মেরি হাই হিলের খটখটে শব্দ তুলে ঘরে এসে ঢুকল। বব চুল। একটু পুরু লাল টকটকে ঠোঁট। মিনি স্কার্ট। ওয়েলার ঘোটকীর মতো চলন। সারা অফিসে ভক্তের অভাব নেই।

অমিতাভ বললে, 'এনি প্রবলেম?'

'নাথিং। জাস্ট ফর এ ফেভার।'

মেরি অমিতাভের প্রায় বুকের কাছে চলে এসেছে। এত কাছে যে তার শরীরের উত্তাপ আর ঘ্রাণ এসে লাগছে। চোখ চলে যাচ্ছে শরীরের গভীর প্রদেশে।

'ক্যান ইউ লেণ্ড মি এ হান্ড্রেড রুপিস্!'

'হোয়াই নট!'

হিপ পকেট থেকে একশো টাকার একটা নোট বের করে অমিতাভ মেরির সামনে ধরল। সরু সরু দু' আঙুলে নোটটা নিতে নিতে মেরি বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ ডারলিং।'

প্রথম প্রথম মেরির আচমকা কথায় অমিতাভ চমকে উঠত। এখন আর চমকায় না। হিলের শব্দ তুলে মেরি চলে যাচ্ছে। অমিতাভ যত ভাবছে তাকাবে না, ততই চোখ চলে যাচ্ছে। মেয়েদের পেছনেও মনে হয় চোখ থাকে। দরজার কাছাকাছি গিয়ে মেরি ঘাড় ঘুরিয়ে তাকাল। নেশা জড়ানো গলায় বললে, 'গুড নাইট।'

অপ্রস্তুত অমিতাভ বললে, 'ও ইয়েস, গুড নাইট।'

লিফ্টের অপেক্ষায় না থেকে অমিতাভ সিঁড়ি ভাঙতে লাগল। অনেকটা নিচে নামতে হবে। তা হোক। নামা অনেক সহজ। যত নিচেই হোক না কেন সহজেই নামা যায়।

সারাদিনে এই প্রথম তার তনুর কথা মনে পড়ল। এতক্ষণ কাজের চাপে, সহকর্মীদের আসা-যাওয়ায় ঘরসংসার ভুলেই গিয়েছিল। সিঁড়ির পর সিঁড়ি অতলগামী। সাদা নির্জন দেয়াল। বাঁকে বাঁকে সাদা ডোম চুঁইয়ে আলোর কষ গড়াচ্ছে। একা অমিতাভ। অমিতাভ ভার্সাস অমিতাভ। এমন কায়দার বাড়ি, বাইরে আলো কি আঁধার বোঝবার উপায় নেই। কৃত্রিম আবহাওয়া, কৃত্রিম আলো। কৃত্রিম সাজপোশাক, হাবভাব, চালচলন। একেবারে নিচের তলায় এসে অমিতাভ আকাশ দেখতে পেল। তাঁবুর চাঁদোয়ার মতো বহু ওপরে ঝুলছে আকাশ। প্রায় অন্ধকার হয়ে এসেছে। দুঃখীর চোখের মতো দুটি তারা মিটমিট করছে।

কার্বে সবুজ রঙের গাড়ি অমিতাভের জন্যে অপেক্ষা করছে। ড্রাইভার দরজা খুলে ধরল। আরও অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। দূরে কে খুব জোরে জোরে ইংরেজী সুর শিস্ দিচ্ছে। সন্ধের আমেজ নামছে।

গাড়ি বেরিয়ে রাস্তায় পড়ার মুখে বাধা পেল। বিশাল বাড়ির ছায়ায় মেরি দাঁড়িয়ে আছে। তলপেটের কাছে ভ্যানিটি ব্যাগ ডান হাতের কবজি থেকে ঝুলছে। সোনালী ঘড়ি ঝিকঝিক করছে। কানের সরু পেণ্ডান্ট তির তির করে দুলছে। যত অন্ধকার ঘন হচ্ছে মেরির শুভ্র নেট মোড়া পা দুটো ততই আলোকস্তম্ভের মত স্পষ্ট ইঙ্গিতবাহী হয়ে উঠছে। অমিতাভ থাবড়া মেরে যে কথাটা এই প্রসঙ্গে মনে ভেসে উঠেছিল সরাবার চেষ্টা করল—নরকের দুই শুভ্র প্রহরী।

জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'ওয়েটিং ফর এনি ওয়ান?'

মেরি কাছে সরে এল। অমিতাভের একেবারে নাকের সামনে মেরির সিল্কের বুক ওঠা-নামা করছে। বড় নেশা জাগানো উষ্ণ বিলিতি সুবাস। শরীর যত ঘামতে থাকে সুঘ্রাণ তত প্রবল হয়।

মেরি বললে, 'সাপোজ ফর ইউ।'

অমিতাভের বুকের মাঝখানটা ধক্ করে উঠল। প্রবীণ ডিরেক্টারের পি-এ বলে কি?

অমিতাভ অবাক হয়ে বললে, 'ফর মি?'

'ইউ ক্যান গিভ মি এ লিফ্ট।'

'দেন কাম ইন।'

অমিতাভ দরজা খুলে দিতেই মেরি তড়াক করে ভেতরে ঢুকেই সিটের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। আসন নেচে উঠল। মেরি আয়েস করে হেলে বসতে বসতে বললে, 'থ্যাঙ্ক ইউ ডারলিং।'

অন্ধকারে অমিতাভর কপাল কুঁচকে উঠে আবার সমান হয়ে গেল। সামান্য এক স্টেনোর এত দুঃসাহস তার ভালো লাগে না। কি আছে মেয়েটার! শীতের শিশিরভেজা তাজা কপির মত শরীর আছে। ইংরেজি বুকনি আছে। সিগারেট খাওয়া আছে। কায়দা করে শরীর প্রদর্শন আছে। আর কি আছে!

অমিতাভ জিজ্ঞেস করল, 'হোয়্যার টু?'

'রয়েড স্ট্রিট।'

অমিতাভ সরে বসল। মেরির কাঁধে কাঁধ ঠেকে যাচ্ছিল। গায়ে-পড়া মেয়ে তার অসহ্য

লাগে। দূর থেকে তার যত বিবাহ-অতিরিক্ত পরিকল্পনা। ভোগের নানা রকম উদ্ভট কল্পনা। কাছে এলে সংস্কার জেগে ওঠে। বন্ধু রজত ঠিকই বলেছিল, অমিতাভ,লম্পট হওয়া অত সহজ নয়। সম্পূর্ণ আত্মবিস্মৃত হতে না পারলে বৃথা চেষ্টা। মেরি দু হাত কানের পাশে উঁচু করে চুল ঠিক করছে। পায়ের ওপর পা তুলে বসেছে। সবই প্রলোভন মাখান। এক সুতো এদিক-ওদিক হলেই অমিতাভ ইঁদুরকলে পড়ে যাবে। মরবে না, কিন্তু বন্দী হয়ে পড়বে। নাঃ ইংরেজি ট্র্যাশ উপন্যাস যত কম পড়া যায় ততই ভাল। দেহ আর ভোগ ছাড়া ওরা কিছু জানে না।

গাড়ির গতি হঠাৎ ধীর হয়ে গেল। সামনে ট্র্যাফিক সিগন্যাল। অমিতাভ ঘাড় ঘুরিয়ে বাঁ দিকের জানালা দিয়ে বাইরে দৃষ্টি মেলে দিল। আলো ঝলমলে দোকান। আইসক্রিমের বাক্স। রঙ-বেরঙের সিগারেটের প্যাকেট। বোতলে রঙীন পানীয়। সুন্দরী একটি মেয়ে ঠোঁটে স্ট্র লাগিয়ে কমলা লেবু রঙের জল চুষছে। স্বাস্থ্যবান একটি যুবক পাশ থেকে বোতলে আর একটা স্ট্র ভরে দিচ্ছে। হাসছে আর কি যেন বলছে। চমৎকার জুটি!

হঠাৎ অমিতাভ চমকে উঠল। মেয়েটি কে? তনুর মতো দেখতে। তনু না। তনুই তো! সেই এলো খোঁপা। মিষ্টি মুখ। তনু এই সময়ে এখানে আসবে কি করে! ভাবতে ভাবতেই পুলিসের হাত নেমে গেল। গাড়ি সামান্য ঝাঁকুনি মেরে সামনে এগিয়ে গেল।

অমিতাভ আর একবার দেখতে চায় ভালো করে। নিশ্চিত হতে চায়। মেরির কোলের ওপর কনুই রেখে বাঁ দিকে যতটা সম্ভব হেলে পড়ল। অমিতাভ কি করছে কোনও খেয়াল নেই। দেহ গাড়িতে,মন পথের পাশে ওই দোকানে। ছেলেটা কে? সঙ্গে একটা চমৎকার নতুন গাড়ি রয়েছে মনে হচ্ছে।

স্পর্শকাতর জায়গায় অমিতাভের কনুইয়ের তীক্ষ্ণ চাপ পড়ায় মেরি নেচে উঠল। তার মাথা নেমে এসেছে অমিতাভের ঘাড়ের কাছে। কানের কাছে ঠোঁট। ফিস্‌ফিস করে বললে, 'ও, ইউ আর নটি। দিস ইজ নট দি প্রপার প্লেস ডারলিং। কাম টু মাই অ্যাপার্টমেন্ট।'

চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত অমিতাভ সোজা হতে চাইল। ভীষণ ভুল করে ফেলেছে। সহজে সোজা হতে পারল না। কাঁধ পর্যন্ত অনাবৃত আস্ত একটা নিটোল বাহু তাকে বুকের কাছে চেপে ধরে আছে। বিষ ঢালছে সর্পিণী। চিন্তা ক্রমশই ঘোলাটে হয়ে আসছে। অসম্ভব লড়াই চলেছে ভেতরে। জোনাকি গোবরে পড়ে গেছে। জ্বলছে কিন্তু উড়ে যেতে পারছে না। একটা বাহুর জায়গায় আরও একটা বাহু এসে গেছে। জোড়া সাপে জড়িয়ে ধরেছে। মেরির চিবুক চেপে বসছে অমিতাভের ঘাড়ে। গালের একটা পাশ গরম নিঃশ্বাসে পুড়ে যাচ্ছে।

অমিতাভর একবার মনে হচ্ছে ঝটকা মেরে নিজেকে বন্ধনমুক্ত করে নেয়। পর মুহূর্তেই মনে হচ্ছে, কার প্রতি বিশ্বস্ততা। তনু তো পথে নেমে পড়েছে। চমৎকার একটি পুরুষ জোগাড় করে নিয়েছে। যে হেসে হেসে স্ট্র গুঁজে দিচ্ছে তার বোতলে। যার স্ত্রী অবিশ্বস্ত তার সামনে তো যে কোনও অ্যাডভেন্‌চারের পথ খোলা। ও পক্ষ যখন এত বেপরোয়া, এ পক্ষই বা তখন চুপ করে থাকে কেন? যাচা লক্ষ্মী পায়ে ঠেলা উচিত? হাতের একটা পাখি বনের দুটো পাখির চেয়ে ঢের ভালো।

দুপাশ থেকে দোকান সমেত রাস্তা ক্রমশই চেপে আসছে। গাড়ির পেছনের আসনে আর তেমন নিভৃত অন্ধকার নেই। মেরি অমিতাভকে প্রায় হাঁটুর ওপর শুইয়ে ফেলেছে। ফিসফিস করে কানের কাছে মুখ এনে বলছে, 'সামটাইমস আই ফিল ভেরি হাংগ্রি।'

জ্ঞানেশ গাড়ি চালাতে চালাতে বললে, 'কি এখন বেশ একটু সুস্থ মনে হচ্ছে না?'

তনু এবার সামনের আসনে জ্ঞানেশের পাশে বসেছে। কপালের ওপর থেকে বাতাসে ঝুলে-পড়া চুলের গুছি সরাতে সরাতে বললে, 'মন্দ লাগছে না। দুপুরের দিকে আজকাল আমার চোরা অম্বল হচ্ছে মনে হয়।'

'ভালো কথা নয়। ইউ মাস্ট টেক প্রিকসান্।'

'আজ অবশ্য অন্য কারণ আছে। এতক্ষণে মনে পড়ল। সারাদিন কিছু খাওয়া হয় নি। পিত্তি পড়ে গেছে।'

'সে কি, খালি পেটে জল পড়ে গেল ? কিছু খাবেন ? অবশ্যই কিছু খাওয়া উচিত।'

তনু হাল্কা শব্দ করে হাসল, 'ম্যান প্রোপোজেস্ গড ডিসপোজেস্। বাবাকে এখানে এসে রেঁধে খাওয়াব বলে বেরিয়েছিলুম। সব গোলমাল হয়ে গেল। এখন বেশ ভয় ভয় করছে। অফিস থেকে ফিরে এসে ও যদি দেখে আমি নেই, কি যে করবে ! কি যে হবে ! ভাবতেও পারছি না।'

'আমি তো সঙ্গে রয়েছি। বলবো, মাস্টারমশাইয়ের বিপদ শুনে আপনি ছুটে গিয়েছিলেন।'

তনু পরিমিত মাপের একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললে, 'দুনিয়াটা বড় জটিল জ্ঞানেশবাবু। অত সহজে সমস্যার সমাধান হয় না।'

'অমিতাভবাবু শিক্ষিত ছেলে। এনলাইটন্ড্ ম্যান। বোঝালে তিনি অবশ্যই বুঝবেন।'

তনু উদাস গলায় বললে, 'কিছু কিছু প্রিমিটিভ ফিলিংস আছে জ্ঞানেশবাবু যা সহজে চাপা পড়ে না। তার মধ্যে একটা হল পজেসিভনেস। অধিকারবোধ। মানুষ যত শিক্ষিতই হোক, জরুকে সে গরু ভাববেই।'

জ্ঞানেশ বললে, 'আমরা মনে হয় এসে গেলাম না !'

'হ্যাঁ। ওই তো সামনে। ভেতরে ঢুকিয়ে দিন। তলার গোটাটাই পার্কিং লট।'

ধীরে গাড়ি ঢোকাতে ঢোকাতে জ্ঞানেশ বললে, 'একেবারে বিলেত।'

'হ্যাঁ, একেবারে বিলিতি ধরন। ঝকঝকে। চকচকে। তবে ওই। সমুদ্রের শীতল ঢেউয়ে যেমন ফসফরাস জ্বলে, এ জীবনও তেমনি। খুব পশ। মাপা কথা, চাপা হাসি, যেন কতই শান্তি। আসলে তা নয়। ঢেউয়ের মাথায় মাথায় আগুন নাচছে।'

তনু গাড়ি থেকে নামতে নামতে বললে, 'চলে যাবেন না কি ?'

'যেমন আদেশ করবেন।'

'আসুন না। বেশ চেনা হয়ে যাবে। বাবার প্রয়োজন হলে আসতে পারবেন।'

দুজনে লিফ্টের সামনে। স্যুটপরা লম্বা চেহারার এক বৃদ্ধ ছড়ি হাতে দাঁড়িয়ে। আর কেউ কোথাও নেই। অটো-লিফট নেমে এল। ফুস করে দরজা খুলে গেল। একেবারে শূন্য। আর তখনই জ্ঞানেশের মনে পড়ে গেল সেই কফিনের কথা।



॥ একুশ ॥

দেয়ালে পিঠ রেখে হাঁটু উঁচু করে দু'হাতে মাথা ধরে শিব বসে আছে। কিছু দূরে কৃষ্ণ বসে আছে বাবু হয়ে। সোজা টান টান। দুজনে মুখোমুখি। মাঝখানে এক ফালি লাল মেঝে ছলছল করছে। সময়ের নৌকো চলেছে পাল তুলে রাজহাঁসের মতো।

খাবার ঘরে দেবী ভীষণ ব্যস্ত। বিশাল এক ডেকচিতে গরম দুধ ঢেলেছে। দুধ, চিঁড়ে, কলা চটকে একটা ফলার মত হবে। অনেক কষ্টে দু'জনকে রাজি করিয়েছে। মানুষকে চিরকালের

মতো স্তব্ধ করে দিতে পারে এমন শোক পৃথিবীতে এখনও অজানা। জীবন থামবে, আবার চলতে শুরু করবে। এই তো দুনিয়ার নিয়ম। কোনও মৃত্যু দেখলেই স্বামীর মৃত্যু ভেসে ওঠে চোখের সামনে। মন একটু নাড়া খায়। আবার থিতিয়ে পড়ে। চিঁড়ে আর কলা দেবীই সংগ্রহ করে এনেছে।

শিব ফোঁস করে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেল্‌ল।

কৃষ্ণ বলল, 'কেন অত ভাবছিস ? কি জন্যে ভাবছিস ? কিসের জন্যে ভাবছিস ? দুঃখ আর সুখ বুঝলি শিব, দুই পথিক। চলতে চলতে কখনও এর সঙ্গে কখনও ওর সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। কাঁধে হাত রাখে বন্ধুর মতো। কিছু পথ চলার পর বিদায় নিয়ে চলে যায়। তখন সুখও নেই দুঃখও নেই। ফালফেলে জীবন। কি হবে ভেবে ? ভাবনার কূল-কিনারা আছে। আমাদের এই ঝুনো মাথাকে যতটা খালি বাখা যায় ততই ভালো।'

শিব আবার একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'আমাব ভীষণ মন কেমন করছে দাদা।'

'কার জন্যে ?'

'তনুর জন্যে। কত দেখেশুনে, পছন্দ করে, বংশ পরিচয় নিয়ে ছেলের বিয়ে দিলুম। কি হল দাদা ? কি লাভ হল ? মেয়েটার জীবনটাই মনে হয় নষ্ট হয়ে গেল।'

'জীবনের তুই বিশেষ কিছুই জানিস না। মেযেদের অসম্ভব মানিয়ে নেবার ক্ষমতা। বলে শুনিসনি, মেযেরা হল জলের মতো, যে পাত্রে রাখবি, সেই পাত্রের আকার নেবে। ওসব ভাবনাচিন্তা ছাড়। আয় দাবা নিয়ে বসা যাক এক হাত।'

'আগে খেয়ে নিন।' দেবী ঘবে এসে ঢুকলো। দুধ, কলা মাখা চিঁড়ের ভুরভুরে গন্ধ বেরোচ্ছে।

হাত বাড়িয়ে বাটি নিতে নিতে কৃষ্ণ বললে, 'এই আর একটা মেয়ে। তনু হল টাকার এ-পিঠ, দেবী হল টাকার ও-পিঠ। বাঃ ফাসক্লাস মেখেছ। ওব্বাবা আবার কিসমিস দিয়েছ। নাঃ, তোমার একেবারে খানদানি টেস্ট। শিব, খেয়ে দেখ, খেয়ে দেখ। একেবারে অমৃত। তোমার কই ! দেবী তোমার ?'

'আমার আছে। তাছাড়াও আছে। দরকার হলে চাইবেন। বাবা, আপনি মুখে তুলুন।'

'হ্যাঁ মা, জ্ঞানেশের জন্যে রেখেছ তো ?'

'হ্যাঁ বাবা।'

শিব দুঃখী, দুঃখী মুখে এক চামচ খেল। খেতে খেতে বললে, 'অপূর্ব ! পবিত্র হাতের প্রসাদ। একটা কথা কেবলই ভাবছি, তনুব কি কিছু খাওযা হল। হ্যাঁ মা, তেমন মারাত্মক লাগেনি তো !'

'একটু লাগবেই। পবে একবাব চেক-আপ করিয়ে নিলেই হবে।'

'অমিতাভ কি করাবে ? সে তো নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত।'

'অবশ্যই করাবে। আপনাব ছেলে কখনও অমানুষ হতে পারে না।'

'দ্যাটস রাইট।' কৃষ্ণ দেবীকে সমর্থন করল।

'তুই কি আর নিবি দাদা ?'

কৃষ্ণ লাজুক লাজুক মুখে দেবীর দিকে তাকিযে বললে, 'কম পড়বে না তো !'

'কম পড়বে কেন ? দাঁড়ান আনছি।'

দেবী চলে গেল। কেউ খেতে চাইলে তার ভীষণ আনন্দ হয়।

কৃষ্ণ হাসি হাসি মুখে শিবেব দিকে তাকিয়ে বললে, 'মানুষ কি সাংঘাতিক জীব দেখেছিস শিব !'

'সে আর বলতে ? পৃথিবীটাকে একেবারে ছারখার করে দিলে।'

'কেন বললুম বল তো ? সাত্যকি কফিনে চড়ে চলে গেল। এতক্ষণে মনে হয় সাত হাত

মাটির নিচে। আর আমরা এদিকে আঙুল চুষছি। ধ্যাত, মানুষকে কোনওদিন বিশ্বাস করিসনি।'

'মানুষকে না বিশ্বাস করলে বাঁচবে কি করে দাদা। বিশ্বাস করতে হবে। ঠকতে হবে। ধাক্কা খেতে হবে। উটের কথাই ভাবো না। কাঁটাগাছ চিবোচ্ছে। দু কষ বেয়ে রক্ত ঝরছে। তবু ওই তার খাদ্য। না খেলে বাঁচে না।'

'তা অবশ্য ঠিক। যীশু যদি আবার জন্মান তাহলে কি হবে! মানুষের ভালো করতে গিয়ে ক্রুশে চেপেছিলেন। সেই মানুষের জন্যেই আবার জীবন উৎসর্গ করবেন। নাঃ, আর ভাবতে পারছি না। কি পেলে যে বেশ সুখী হওয়া যায়, এইটুকু যদি জানতে পারতুম, তাহলেও হত।'

দেবী এল। দু হাতে ঝকঝকে দুটো বাটি।

শিব বললে, 'আবার তুমি নতুন বাটি আনলে! এই বাটিতেই ঢেলে দাও না।'

'না না, এঁটো বাটিতে খেতে ভালো লাগবে না। তা ছাড়া এতে আর একটু কেবামতি করেছি।'

কৃষ্ণ বাটিটা চোখের সামনে তুলে ধরে বললে, 'কি কেরামতি করেছ গো!'

'খেয়ে বলুন তো!'

কৃষ্ণ মুখে এক চামচে পুরে স্বাদ নিতে নিতে বললে, 'ডেপ্‌থ্ অনেক বেড়ে গেছে।'

শিব বললে, 'তুমি দেখছি আর্টের ভাষা বলছ?'

'হ্যা রে, কি একটা চাপিয়েছে, আগের চেয়ে ডেপ্‌থ্ অনেক বেড়ে গেছে।'

'আমি বলবো কি পড়েছে! কনডেন্সড মিল্ক।'

দেবী বললে, 'ঠিক ধরেছেন।'

কৃষ্ণ বললে, 'তোফা, তোফা। কি আমবা বোজ একঘেয়ে ভাত ডাল খাই! পেটে চড়া পড়ে গেল। আয় কাল থেকে আমরা ফুড হ্যাবিট চেঞ্জ করি।'

'অনেক খরচ রে দাদা। গরিবের ভাতডালই ভাল। তুমি যাও মা। এবার তুমি খেয়ে নাও। আমাদের আর কিছু লাগবে না।'

কৃষ্ণ বললে, 'একেবারে ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিলুম। আবার সেই কাল দুপুরে।'

দেবী যাবার জন্যে পেছন ফিরেছে, খোলা দরজা দিয়ে তোতা লাফিয়ে পড়ল ঘরে।

'মা আ। দাদাই।'

খিল খিল হাসিতে ঘর ভরে গেল। যেন ঝরনার জল।

দেবী ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'ও মা, এ কি রে! তুই কার সঙ্গে এলি?'

'একা একা।'

'একা এলি? দুর্গা?'

'ও মা জানো মা, সে কি মজা। দুর্গাদিদিকে বললুম, এসো কানামাছি খেলি। একটা গামছা দিয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে জড়িয়ে চোখ বেঁধে দিয়েছি মা। তারপর কানামাছি ভোঁ ভোঁ। দেখ গে যাও এখনও সারা ঘরে ভোঁ ভোঁ করে ঘুরছে।'

তোতা আবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

'তুই কি সর্বনেশে মেয়ে রে!'

'বলো মা, আমার কি রকম বুদ্ধি!'

'খুব বুদ্ধি মা। দুষ্টু বুদ্ধি মাথায় একেবারে ঠাসা। নাঃ, তুই আমাকে একটুও শান্তি দিবি না।'

'বা রে, তুমি সেই কখন এসেছ! আমার মন খারাপ হয় না?'

'আমি অফিসে গেলে তুই কি করিস?'

'বা রে তুমি কি আজ অফিসে গেছ!'

দুই বৃদ্ধ অবাক হয়ে মা আর মেয়ের কথা শুনছে। খাওয়া বন্ধ। তোতাকে এত সুন্দর দেখতে, যেন ডানাকাটা পরী। কচি কচি আঙুল নেড়ে নেড়ে কথা বলছে। চোখ দুটো কালো

হীরের মতো জ্বলজ্বল করছে।

কৃষ্ণ ছেলেমানুষের মতো বললে, 'শিব, কি সুন্দর! তাই না! আবার আমার তুলি ধরতে ইচ্ছে করছে।'

শিব বললে, 'জানিস দাদা, এই মেয়েটা হল পৃথিবীর পবিত্রতার মুখ। বড় বড় সেনাপতিরা রাজ্যজয়ের জন্যে অস্ত্র ধরেছেন, এই সব মেয়ের মুখ চেয়ে পবিত্র এক সমাজ তৈরির জন্যে অস্ত্র ধরা উচিত। পাপ আর আবর্জনা নিকাশ করে এদের বড় হতে দাও, সুন্দর হতে দাও।'

'সে আর হয়েছে রে শিব! ধর্ম, আদর্শ সব লোপাট। এখন শুধু ভোগ আর পাপ। পাপ মানুষকে কি রকম টানে দেখেছিস?'

তোতা পেছনদিক থেকে কৃষ্ণর গলা জড়িয়ে ধরে বললে, 'ছবিদাদু, তুমি আমায় ছবি এঁকে দেবে তো!'

'হ্যাঁ রে দিদি। কাল দুপুরে তোমার জন্যে রং আর তুলি নিয়ে বসব।'

কৃষ্ণর গলা ছেড়ে তোতা শিবের সামনে উবু হয়ে বসে বললে, 'তোমার পায়ে কি হয়েছে দাদু! বেড়ালে কামড়েছে কি? তুমি কি বেড়ালের ন্যাজ মাড়িয়েছিলে? কি খাচ্ছো গো তুমি কেঁদে কেঁদে! নিশ্চয় মা তোমাকে সাবুর পায়েস করে দিয়েছে! মে গে, ফেলে দাও, ফেলে দাও। অখাদ্য।'

কৃষ্ণ হেসে বললে, 'তুই একটু খাবি দিদি।'

'আমি ও-সব খাই না। তুমি আমাকে চানাচুর দাও না। বসে বসে খাই।'

দেবী বললে, 'তাই তো রে, বড় সাহস! জ্বর ছাড়তে না ছাড়তেই চানাচুর।'

শিব বললে, 'তোতাকে একটু দেবে নাকি? কি আর হবে!'

তোতা সঙ্গে সঙ্গে বললে, 'গন্ধটা বেশ ভালই ছাড়ছে। না বাবা খাবো না। তোমরা বলবে, মেয়েটা হ্যাংলা। খাবার লোভে ছুটে এসেছে।'

শিব আর কৃষ্ণ দুজনেই হেসে উঠল। দেবী বললে, 'কেউ না জানুক, আমি জানি তুমি বেশ হ্যাংলা আছ।'

তোতা ছুটে গিয়ে দেবীর কোমর ধরে ঝুলে পড়ল। মুখটা আঁচলের তলায় লুকিয়ে বলতে লাগল, 'যাঃ, যাঃ।'

আর ঠিক তখনই দরজা দিয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে দুর্গা এসে ঢুকলো, 'বউদি, তোতা নেই।'

বলেই ডুকরে কেঁদে উঠল।'

মায়ের আড়াল থেকে মুখ বের করে তোতা বললে, 'টুকি।'

হাতের তালুতে চোখ মুছতে মুছতে দুর্গা রাগ আর চাপা অভিমান মেশান গলায় বললে, 'যাও, তোমার সঙ্গে আর কোনওদিন খেলব না। কোনওদিন আর খেলব না। দেখে নিও।'

কান্না চাপতে চাপতে দুর্গা ছুটে বাইরে চলে গেল। দেবী পেছন পেছন ছুটল, 'দুর্গা শোনো, দুর্গা শোন।'

দুর্গা ছুটছে। বাগানের পথ পেরিয়ে একেবারে রাস্তায়।

কৃষ্ণ বললে, 'শিব, ভালোবাসাটা একবার দেখলি! দেখলি তুই! আপন পর নেই রে! মাঝে মাঝে এই পৃথিবীতেই স্বর্গ নেমে আসে। এই সব দেখলে আমার ভীষণ বাঁচতে ইচ্ছে করে। তুই আমাকে ভালোবাসিস শিব?'

'তোমার কি মনে হয় দাদা!'

বয়েস যত বাড়ছে, কৃষ্ণর আবেগও তত বাড়ছে। চোখ বেয়ে জল পড়ল দু ফোঁটা। এক পাশে দাঁড়িয়ে তোতা হাঁ করে দেখছে।

উঠোনের রকে থামে ঠেসান দিয়ে শশধর বসে আছে। গোপা গরম জল করে দিয়েছিল।

জলো কলতলায় নিয়ে গিয়ে দাদাকে মেজে ঘষে চান করিয়েছে। এমন চান শশধর বহুকাল করেনি। দেহের চামড়ায় বুড়ো আঙুলের মাথা ঘষলে কচকচ আওয়াজ হচ্ছে। পরনে পরিষ্কার পাজামা। বুক খোলা পাঞ্জাবি। বাতাসে ফুরফুর করে চুল উড়ছে। শশধরকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে। সূর্যাস্তের আকাশের মতো অস্ত যৌবনের দেহ, এত অবহেলা আর অনাচারেও কুৎসিত হয়ে যায়নি। দীর্ঘদেহী। উন্নত নাক। চোখ দুটোতেই যা উদাস ক্লান্তি। শশধর আকাশের দিকে তাকিয়ে বসে আছে। কিছুই সে ভাবছে না। জীবন এখন ভাবনাচিন্তার বাইরে চলে গেছে। হাল ভাঙা নৌকো ঘটনার স্রোতে ভেসে চলেছে। যেখানে যায় যাক। যেখানে ঠেকে ঠেকুক। জলো এক প্যাকেট দামী সিগারেট আর দেশলাই রেখে গেছে পাশে। একটা সিগারেট ধরিয়ে বার কতক টেনে আর টানেনি। ছাই ক্রমশই লম্বা হচ্ছে। শশধরের চোখ জড়িয়ে আসছে। চানের পর স্নায়ু শিথিল হয়ে গেছে। জোর করে চোখ খোলা রাখারও গরজ নেই।

বহুকাল পরে গোপা যেন আবার জেগে উঠেছে। গা ধুয়ে পবিষ্কার শাড়ি পাট ভেঙে পরেছে। চুল বেঁধেছে টান টান করে। কপালে বড় সিঁদুরের টিপ। কোমরে আঁচল জড়িয়ে রান্না করছে। আজ সে শশধরকে পরিতৃপ্ত করে খাওয়াবে। সেই যেমন খাওয়াতো বিয়ের পর যখন সে ছিল নতুন বউ। তাগায় লাল সুতো। দুর্বো খসখস করছে। মুখের লাল ভাব তখনও কাটেনি। গোপা ঠিক করেছে এবার সত্যিই সে স্বভাব পাল্টাবে। সুখেব সংসাব তৈরি করবে। এখনও সময় আছে। উঠে পড়ে চেষ্টা করে দেখবে মা হওয়া যায় কি না!

জলো চুটিয়ে বাজার কবে এনেছে। অবেলায় মাছ যোগাড করে এনেছে। গোপা বসে বসে একমনে চাকা চাকা আঁশ ছাড়াচ্ছে আর গুনগুন গান গাইছে। আজ যেন গোপার ফুলশয্যা। শশধর যখন বাড়ির সামনে রিকশা থেকে নামছে, তার অবস্থা দেখে গোপা কেঁদে ফেলেছিল। ছুটে গিয়ে শশধরের হাত ধরেছিল বাগে ঘৃণায় শশধর ঝটকা মেরে হাত সরিয়ে দেয়নি। বরং অবাক হয়ে বলেছিল, 'সত্যিই তুমি কাঁদছ! তোমার চোখে জল!'

জলো, বলেছিল, 'তোমার জন্যে আর কে কাঁদবে দাদা বউদি ছাড়া।'

শশধর বলেছিল, 'তা ঠিক, গরু এখনও দুধ দেয়, হাঁস এখনও ডিম পাড়ে, মা এখনও ছেলে মানুষ করে। ভাই এখনও ভাইকে পথ থেকে তুলে আনে। শিশির এখনও পড়ে।'

গোপার চোখে আজ সব কিছু খুব উজ্জ্বল লাগছে। আলোর তেজ বেড়ে গেছে। উনুনে গনগনে আঁচ। ঘটিবাটি কাপ ডিশ সব যেন জ্বলজ্বল করছে। গোপা গুনগুন করে গান গাইছে। এক সময় সে নাচত, গাইত। শখের থিয়েটারে অভিনয়ও করেছে দু-একবার। ছেলেদের সঙ্গে মিশতে ভালবাসত তবে সম্পর্ক এগোতে দিত না বেশি দূব।

গোপা মাছ ভাজছে। থামে হেলান দিয়ে শশধর ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘরের দরজা বন্ধ করে জলো ব্যবসার হিসেবপত্র নিয়ে বসেছে। নির্জন ঘব। জায়গায় জায়গায় ড্যাম্প লাগা বিধবা দেয়াল। ক্যালেণ্ডার, ছবিমবি, যেখানে যা ছিল সব আগেই খুলে ফেলে দিয়েছে। সাফাই অভিযান শুরু হয়ে গেছে। বাইরে এবং সঙ্গে সঙ্গে ভেতরে একটা দুটো রাত নিজেকে ধরে রাখতে পারলেই জলো নতুন পথ খুঁজে পাবে। নিজের চেয়ে আপনজন, বড় বন্ধু পৃথিবীতে আর কে আছে! খাতার পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে জলো মাঝে মাঝে উদাস হয়ে যাচ্ছে। অতীতের বহু ঘটনা এসে লজ্জা দিয়ে যাচ্ছে।

তনু দরজা খুলতে খুলতে বললে, 'ওর ফেরার কোনও ঠিক নেই। কখনও সন্ধের মুখে, কখনও গভীর রাতে।' জ্ঞানেশ চুল ঠিক করতে করতে বললে, 'এই তো কাজের বয়েস।'

দরজার দুটো পাল্লা হাট খুলে দিয়ে তনু বললে, 'তা ঠিক। কাজ, কেরিয়ার, পদোন্নতি, অ্যাম্‌বিশান। সংসার টংসার কিছু নয়। চলুন। ভেতরে চলুন।'

জ্ঞানেশ ঢোকার জন্যে পা বাড়িয়েও থমকে গেল। ‘আমি বরং চলেই যাই। ফিরে এসে আমাকে দেখলে অমিতাভ যদি কিছু মনে করে!’

‘কি মনে করবে? মনে করার কি আছে?’

‘আমি কে! কোথা থেকে এলুম! কেনই বা এলুম!’

‘লুকোচুরির তো কিছু নেই। আমরা তো কোনও অন্যায় করছি না।’

‘ভাবতে পারে। অমিতাভ আমাকে চিনতেও পারে। নাও পারে। একেবারে চেনে না তা নয়।’

‘চলুন তো ভেতরে। যত সব সাবেকী চিন্তা, কুচটে বুড়ীদের মতো!’

জ্ঞানেশ হাসল। হাসতে হাসতে বললে, ‘পৃথিবীর বয়েস কম হল না। পৃথিবীই বুড়ী হয়ে গেছে। ওল্ড মাদার আর্থ। ভাবনা, চিন্তা, জীবন সব বুড়িয়ে গেছে।’

তনু বললে, ‘আসুন তো ভেতরে। বড় বেশি বকবক করেন। বয়েস না হতেই বার্ধক্য!’

আলোর সুইচের দিকে হাত বাড়িয়েই তনু যন্ত্রণায় ‘উঃ’ করে উঠল। কোনও রকমে আলো জ্বেলে, ঘাড় মুখ গুঁজড়ে শুয়ে পড়ল, সবুজ রঙের নরম কার্পেটে। কাটা ছাগলের মতো ছটফট করছে তনু।



॥ বাইশ ॥

‘আই লাভ ইওর ওয়াইলড্ প্যাসান’। মেরি ফিসফিস করে অমিতাভের কানে বিষ ঢেলে দিল।

অমিতাভ ছটফট করছে মুক্তির জন্যে। পিতার চেহারা ভাসছে চোখের সামনে। মা বসে আছেন ঠাকুরঘরে, লাল পাড় শাড়ি পরে। বিয়ের রাতে তনুর গলায় গোড়ের মালা পরাচ্ছে। সেন্টের গন্ধে, শরীরের উত্তাপে অমিতাভের দম বন্ধ হয়ে আসছে। সারা শরীর জ্বলছে। হিমবাহের মতো মন সগর্জনে ভেঙে পড়ল বলে। অমিতাভ জানে, নারী হল প্রচণ্ড শক্তি। পুরুষকে উন্নত করতে পারে আবার অবনতও করতে পারে। অমিতাভ কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। ভীষণ লজ্জাও করছে। ড্রাইভারটি শেয়ানা। ফিরে না তাকালেও অবশ্যই বুঝতে পারছে, পেছনের আসনে হাপরের লড়াই চলেছে। সামনের আয়নাতেও নিশ্চয় ধরা পড়ছে পেছনের আসনের দৃশ্য। অমিতাভকে ধরেছে যেমন অজগর ধরে ছাগলছানাকে।

মেরি ড্রাইভারকে বললে, ‘স্টপ’।

গাড়ি রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে দাঁড়াল। পেছন দিকে হাত বাড়িয়ে অমিতাভের ব্রিফকেসটা তুলে নিল।

‘গেট ডাউন।’

দরজা খুলে রাস্তায় পা বাড়াল। অমিতাভ বুঝতে পারছে না, কি করা উচিত! জেনে শুনে পা দেবে ফাঁদে। আর উপায় নেই। মেরি ব্রিফকেস হাতে ফুটপাথে দাঁড়িয়ে আছে টান টান হয়ে। সংক্ষিপ্ত স্কার্ট আর টাইট ব্লাউজে বড় উদ্ধত দেখাচ্ছে তাকে। কিছু ভেবে না পেয়ে অমিতাভ নেমে পড়ল। ড্রাইভারকে বললে, ‘তুমি চলে যাও। গাড়ি গ্যারেজ করে দাও।’

'দো ঘণ্টে বাদ ঘুম্কে আয়ি !'

'ঘুম্কে ?'

অমিতাভ কেমন যেন হয়ে গেছে। ড্রাইভার কেমন করে জানল যে সে ঠিক দু ঘণ্টাই থাকবে। এইসব ব্যাপারে এই রকমই হয় বুঝি ! অমিতাভ বেপরোয়া হয়ে বললে, 'নেহি! খুদহি হাম চলা যায়েগা।'

স্মার্ট ড্রাইভার। বোঁ করে সামনের পথে অদৃশ্য হয়ে গেল। গাড়ির ন্যাজের লাল আলো অমিতাভের দিকে সাবধান করে দেবার চোখে তাকিয়ে আছে মিটি-মিটি। অমিতাভের সেই রকমই মনে হল।

শরীরের ঊর্ধ্বদেশ ঝাঁকিয়ে মেরি বললে, 'ওয়াইজ ডিসিসান, নাও লেট আস গো।'

হাইহিলের খটখট শব্দ তুলে ফুটপাথ ধরে এগিয়ে চলল। অমিতাভ না তাকিয়ে পারছে না। শরীরের এমন ছন্দ কদাচিৎ দেখা যায়। বাঙালী মেয়েদের সব আছে। তারা থ্রো করতে জানে না। মেরির পেছন পেছন যেতে যেতে অমিতাভের সেইরকমই মনে হল।

সরু এক চিলতে-গলি। রাজপথের রোশনাই নেই সেখানে। ঢ্যাঙা ঢ্যাঙা বাড়ির অতল ছায়ায় পথ পড়ে আছে মৃতের মত। ঢোকার মুখেই অমিতাভের মন ছমছম করে উঠল। সে একি করছে ! পাগলের মতো। তবু অমিতাভ এগিয়ে চলেছে পায়ে পায়ে। অদ্ভুত এক আকর্ষণ ; মন আর কাজ করছে না। শরীর এগিয়ে চলেছে কি একটা ধরার আশায় ! মানুষের মন কত পরাধীন ! মেরি চলছে তো চলছেই। কত রকমের শব্দ ভেসে আসছে। ইংরেজী গান। ভাঙা গলার কাশি। কোনও বযস্কা মহিলার উচ্চ কণ্ঠ। বাড়ির অন্ধকার দরজার সামনে এসে মেরি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়াল। দু' হাত দিযে অমিতাভের কোমর জড়িয়ে ধবে বললে, 'কিস মি। অ্যাজ হার্ড অ্যাজ ইউ ক্যান।'

সিঁড়ির ধাপে অমিতাভের ব্রিফকেস। ইতস্তত করছে অমিতাভ। তিন চাব বছর বিয়ে হয়েছে, তনু তাকে কখনও এভাবে আক্রমণ কবে নি। বাঙালী মেয়েরা এসব জানে না। বোঝে না। তাদের সংস্কার বড় প্রবল। মেরির চকচকে রসাল ঠোঁট ক্রমশ এগিযে আসছে। ধীরে ধীরে সাপের ছোবলের মতো। চোখের মনি দুটো জ্বল জ্বল করে জ্বলছে।

হঠাৎ অমিতাভেব মনে হল সামান্য একটা ব্যাপার নিয়ে অকারণ দ্বিধায় সে কেন এমন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে। পাশ্চাত্ত্যেব মানুষ এসব আর গ্রাহ্যই করে না। তার প্রাচীন সংস্কার শিং-অলা গরুর মতো ভেতর থেকে অনবরত গুঁতিয়ে চলেছে। এই মহাকাশযান আর আণবিক যুগে একটা পুরুষ মানুষের এই প্যানপ্যানানি শোভা পায না। ন্যাকামির চূড়ান্ত। কোনও কালে কোনও আদর্শ, নীতি, ধর্ম নারী আর পুরুষকে আটকাতে পেরেছে ! এ হবেই। যতদিন মানুষ বাঁচবে ততদিন কেউ ঠেকাতে পাববে না। ভণ্ডামির কোনও মানে হয় না। মেরি ধরে ফেলেছে। তীব্র অতি তীব্র। সুতীক্ষ্ণ মাদকতা। জড়িত কণ্ঠস্বর 'ও মাই। ও মাই।'

বন্ধ দরজার গায়ে হেলে পড়েছে। দেহের ভারসাম্য বজায় রাখার জন্যে অমিতাভ দু হাতে মেবিব পিঠ ধরে সামনে আকর্ষণ কবতে বাধ্য হচ্ছে। কেবলই তাব মনে হচ্ছে, 'এখানে কেন ? দরজা খুললেই তো ভেতর !' বলতে চাইছে, 'ও লেট আস গো ইনসাইড।' বলার সুযোগ পাচ্ছে না।

এক ফাঁকে অমিতাভ বলল, 'ওপন দি ডোর।'

'ও ইয়েস।' মেরির গলা শুনে মনে হল, সে মাতাল হয়েছে।

দরজায় পিঠ রেখে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে সুদৃশ্য হ্যাণ্ড ব্যাগটা অমিতাভের হাতে দিয়ে সদ্য ঘুম ভাঙা গলায় বললে, 'ওপন, ওপন।'

মেরি হাঁপাচ্ছে। ভারি বুক ওঠানামা কবছে হাপরের মতো। মেয়েদের এই মত্ততার সঙ্গে অমিতাভ পরিচিত ছিল না। সে নিজেও এখন জ্বলছে।

দরজার একটা পাল্লা খোলা মাত্রই ভস করে খানিকটা চাপা হাওয়া বেরিয়ে এল। যেন অশরীরী কেউ ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল।

অমিতাভ বললে, 'গেট ইন।'

'নো—ও। আই কাণ্ট। লিফ্‌ট মি আপ।'

অমিতাভের মনে হল, মেরি এইবার একটু বাড়াবাড়ি করে ফেলছে। মেরির মুখের দিকে তাকিয়ে অমিতাভ কিন্তু ভয় পেয়ে গেল। মেরি কাঁপছে। থরথর করছে শরীর। যা থাকে বরাতে বলে অমিতাভ নিচু হয়ে দু' হাতে মেরিকে তুলে নিল। বেশ ভারি। যা ভেবেছিল তার চেয়েও ভারি। অন্ধকারে কোথায় কি আছে চোখেও পরছে না। দূরে একটা আয়না কেবল আলোর ইশারা ধরে রেখেছে। অমিতাভের মনে হল বাঁ-পাশে একটা ডিভানের মত কিছু রয়েছে। আন্দাজে ধীরে ধীরে মেরিকে নামিয়ে দিতে সে দুবার পা ছুঁড়ল। এক এক পাটি জুতো অন্ধকারে ছিটকে গেল এক এক দিকে। এক পাটি ধাতব কোনও কিছুর ওপর পড়ল মনে হয়। টং করে এক ঝঙ্কার উঠে ধীরে ধীরে মিলিয়ে যেতেই ফ্যাঁস করে একটা শব্দ হল। শব্দটা অমিতাভের চেনা। জিপফাস্টনার।

অমিতাভ বললে, 'হোয়্যার ইজ দি সুইচ।'

নো সুইচ। নো লাইট। ক্লোজ দি ডোর।'

তনুর যন্ত্রণাকাতর অবস্থা দেখে জ্ঞানেশ ভীষণ ভয় পেয়ে গেল। এত বড় সুসজ্জিত একটা ফ্ল্যাট। আশেপাশে অনেকেই হয়তো আছেন ; কিন্তু কেউ কোথাও নেই বলেই মনে হয়। চারপাশ অসম্ভব নিস্তব্ধ। বহু দূর থেকে ছিটকে ছাটকে ছেঁড়া ছেঁড়া শব্দ ভেসে আসছে। গাড়ির শব্দ। তীব্র হর্নের শব্দ। জ্ঞানেশ কি করবে! তনু যদি হঠাৎ মারা যায়! সে তো খুনের দায়ে পড়বে। মুহূর্তে জ্ঞানেশের সমস্ত ভয় দ্বিধা কেটে গেল। আধুনিক মানুষের স্বার্থপর চিন্তা সরে গেল। হাঁটু গেড়ে তনুর পাশে বসে পড়ল। তনুর মুখ নীল। কপালে মুক্তোর দানার মতো ঘাম জমেছে।

জ্ঞানেশ ডাকল, 'তনু!'

একটা অস্ফুট গোঙানি। জ্ঞানেশ বুঝে গেল, এভাবে হবে না। যেমন করেই হোক হাসপাতাল অথবা নার্সিংহোমে নিয়ে যেতেই হবে। এখুনি। এই মুহূর্তে। কাছে সাহায্য করার মতো আর একজন কেউ থাকলে বেশ হত। এই সব গগনচুম্বি বাড়ির একক ফ্ল্যাটের বসবাস কত আতঙ্কের।

জ্ঞানেশের মন খুব দ্রুত কাজ করতে শুরু করেছে। দু' হাতে পাঁজাকোলা করে তনুকে তুলে নিল। তুলে নিয়েই মনে হল, দরজায় তালা দেবে কিভাবে! পরক্ষণেই মনে হল বড় একটা ফ্ল্যাটের কোথাও কি কোনও ডাক্তার নেই, যাঁর সাহায্য নেওয়া যেতে পারে! আর ভাবতে পারছে না। তার দু' হাতের ওপর তনুর ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। বুঝতে পারছে জ্ঞানেশ। জ্ঞানেশ দ্রুত বেরিয়ে এল ঘর থেকে। তনুকে সাবধানে একপাশে নামিয়ে রেখে দরজায় তালা লাগাল। সে ঠিক করে ফেলেছে, কি করবে। কিশোর আগরওয়াল তার বন্ধু। কলকাতার নাম-করা ডাক্তার। অ্যাপোলো নার্সিংহোমের সঙ্গে যুক্ত। কোনও রকমে তনুকে সেখানে একবার ফেলতে পারলে, সব সমস্যার সমাধান।

বোতাম টিপতেই লিফট ওপরে উঠে এল। ভাগ্য ভাল, লিফটে জনপ্রাণী নেই। নির্জন কফিনের মত বুক পেতে শূন্যে ভাসছে। জ্ঞানেশ তনুকে নিয়ে নিচে নেমে এল। সে কেবলই বলে চলেছে, 'ভয় নেই। কোনও ভয় নেই। সব ঠিক হয়ে যাবে। আর একটু। আর একটু।'

নিচের বিশাল বাঁধান চত্বরে আয়া শ্রেণীর এক মহিলা, একপাশে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে কার সঙ্গে ফিস ফিস করে কথা বলছে। জ্ঞানেশ আর তনুর দিকে তাদের নজর নেই। গাড়ির সামনে এসে

জ্ঞানেশ তনুকে বললে, 'যেমন করেই হোক, এবার একটু দাঁড়াতে হবে।'

তনু শব্দ করল। কি বলল বোঝা গেল না।

কোনও উপায় নেই। এবার একটু সাহায্যের প্রয়োজন। তনুকে দাঁড় করাবার ঝুঁকি সে নেবে না। অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ডাকল, 'শুনিয়ে বহেনজী।'

স্বাস্থ্যবতী আয়াটি ফিরে তাকাল। দূর থেকে মিষ্টি গলায় বললে, 'হাঁ ভাইসাব। আতি হ্যায়।'

মেয়েটি এগিয়ে এসে তনুকে দেখে বললে, 'কেয়া হুয়া ? গির গিয়া না !'

'নেহি জী। দর্দ হুয়া। আপ থোড়া ইন কো রাখে গা ! নেহি তো দরোয়াজা কেয়সে খুলে গা !'

'হাঁ হাঁ। জরুর। জরুর।'

মেয়েটি তনুকে পরম যত্নে গ্রহণ করল। অতি সন্তর্পণে। জ্ঞানেশ দরজা খুলে দিয়েছে। এইবার তনুকে সাবধানে পেছনের আসনে শোয়াতে হবে। মেয়েটি পরিষ্কার বাঙলায় বললে, 'সরুন। আমি শুইয়ে দিচ্ছি। মাথায় চোট লেগে যেতে পারে।'

তনুকে শোয়াবার পর মেয়েটি বললে, 'গাড়ি আপনি চালাবেন ?'

মেয়েটির ব্যবহারে জ্ঞানেশ মুগ্ধ। সে বললে, 'হ্যাঁ বোন।'

'আপনি কি এইখানেই থাকেন ?'

'না না।'

'বুঝেছি। এখানের কেউ আপনাব মতো এত ভালভাবে কথা বলে না। কোথায় নিয়ে যাবেন ?'

'আমার বন্ধুর নার্সিংহোমে।'

'চলুন, আমি যাচ্ছি আপনার সঙ্গে। ধরে বসতে হবে। নয় তো পড়ে যাবে।'

'তুমি ! তুমি যাবে। তোমার অসুবিধে হবে না !'

'না।'

মেয়েটি দৃঢ় গলায় 'না' বলে তনুর পাশে সাবধানে বসে পড়ল। জানলা দিয়ে হাত বের করে ইশারায় দূরে দাঁড়িয়ে থাকা লোকটিকে জানাল, সে আসছে। ঘুরে আসছে। জ্ঞানেশ রাস্তায় পড়ে তীরবেগে গাড়ি ছুটিয়ে দিল। তনু একটানা যন্ত্রণার কাতরোক্তি কবে চলেছে। জ্ঞানেশের মনে হচ্ছে সময় আর দূরত্বের ব্যবধান যদি কুঁচকে ছোট করা যেত !

অমিতাভ কোথায় আছে, কিভাবে আছে, কিছুই বুঝতে পারছে না। বোঝার মতো অবস্থায় নেই। কখনও ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। কখনও নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হচ্ছে। কোনও ভাবনাই বেশিক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে না। উন্মাদ ঘটনাস্রোতে সব কুটোর মতো ভেসে যাচ্ছে। এভাবে তাকে কেউ কখনও নাড়াচাড়া করেনি। এর আগে বহুবার সে জৈব হতে চেয়েছে। পারেনি। আর একটা পশুর অভাবে সে পশু হতে পারেনি। আজ আর সে ক্ষোভ নেই। একটু একটু করে অমিতাভের সব কিছু ঝরে পড়ছে। শিক্ষা, পদমর্যাদা, বংশগৌরব, ভালো ছেলের অহংকার, পবিত্রতা। অমিতাভের সব ভয় ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে। এই হল যুগধর্ম। কেউ যদি জেনেও ফেলে তার এই অভিসারের কথা, অগৌরব তো হবেই না বরং গৌরব বেড়ে যাবে। বলবে, এই তো পুরুষ। জিও, পিও আব অর্থনীতির চাকা ঘোরাও। বৈদিক সভ্যতা শেষ হয়ে গেছে অমিতাভ। ঋষির তপোবনে সামগান আর শোনা যাবে না। হোমের আগুনে রাতের অন্ধকার আর কাঁপবে না। মহাদেব কৈলাস ছেড়ে পালিয়েছেন। শিগগির মানুষ সেথায় ফাইভস্টার হোটেল বানিয়ে ক্যাবারে নাচাবে। অমিতাভ তুমি প্যারিসের রাত, কোপেনহেগেনের রাত, নিউইয়র্কের রাত, জার্মানির রাতের কথা চিন্তা কর। বেদ, বেদান্ত, গীতা ভোগের জগতে

ভেসে গেছে। সাঁতার না জানা মানুষের মতো।

অমিতাভের হঠাৎ মনে হল, ভীষণ খিদে পেয়েছে। মেরির কানে কানে বললে, 'আই অ্যাম হাংগ্রি।'

মেরি ফিস ফিস করে বললে, 'স্টিল ইও আর হাংগ্রি। সিমস্ ইউ হ্যাভ এনরমাস্ অ্যাপেটাইট। দেন ওভার এগেন।'

অমিতাভের শরীরে বাজ পড়ল। চোখের সামনে এতক্ষণ ছিল ভাসা ভাসা অন্ধকার। এখন তাল তাল জমাট অন্ধকার।

ভাতের ফুট দেখে এসে গোপা রান্নাঘর ছেড়ে বেরিয়ে এল। ফ্যানে রঙ ধরেছে। আর বেশি দেরি নেই। আর এক ফুট হলেই নামিয়ে দুজনকে খেতে দেবে। রান্নাঘরের দরজা থেকে বললে, 'কি গো, তুমি অত কি ভাবছ বলো তো। হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে?'

শশধরের দিক থেকে কোনও উত্তর এল না। ফুর ফুরে বাতাসে শশধর ঘুমে একেবারে অচেতন। গোপা কাছে এল। অনেক দিন পরে সে ঘুমন্ত শশধরের মুখের দিকে তাকিয়ে দেখছে। ভীষণ মায়া হচ্ছে। অকারণে লোকটাকে সে ভীষণ কষ্ট দিয়েছে এতকাল। কেন সে বড়লোক হতে পারে না। কেন সে হিলিলি-দিললি্ বেড়াতে নিয়ে যেতে পারে না। কেন সে হাজার টাকা দামের শাড়ি কিনে দিতে পারে না। কেন সে নতুন একটা বাড়ি করতে পারে না। লোভের আগুনে লোকটাকে সে ঝলসেছে। চরম শাস্তি দিয়েছে বঞ্চিত করে। স্ত্রীর কাছে পুরুষ যা চায় তা চাইতে এলেই ঠেলে সরিয়ে দিয়েছে। দিনের পর দিন একই বিছানায় দু'জনে দু-মুখো।

শশধর ঘুমোলেই ভীষণ ঘামে। ঘাড়, কপাল, পিঠ ঘামে জবজবে হয়ে যায়। এখনও তাই, কানের পাশ বেয়ে ঘাম গড়িয়েছে। গোপা শাড়ির আঁচল দিয়ে যেই ঘাম মুছিয়েছে, শশধর ধীরে চোখ মেলেছে। গোপাকে দেখেই ধড়মড় করে সোজা হয়ে বসল। মুখে ভয়ের ভাব। মৃদু গলায় বললে 'তোমাদের কোনও অসুবিধে করছি না তো!'

গোপা ধীরে ধীরে পাশে বসল। প্রায় গায়ে গা লাগিয়ে। বুকের আঁচল সরে গেছে। চাপা দেবার চেষ্টা করল না। বরং দু হাত মাথার ওপর তুলে খোঁপা ঠিক করতে করতে বললে, 'আবার তুমি ওইভাবে কথা বলছ!'

গোপার বাঁ হাতের কনুই শশধরের গাল ছুঁয়ে যাচ্ছে। গোপা বুকের ভেতর আঁচল পুরে ঘাম মুছল ইচ্ছে করে। শশধরের কাছে আজ সে ধরা দেবে অনেক দিন পরে। এসব তারই প্রস্তুতি। বিয়ের সময় গোপার শরীর ছিপছিপে ছিলো। এখন বেশ ভারি হয়েছে। গুরু নিতম্ব। কোমরে মধ্যবয়সের মেদ। আজ গোপার মনে হচ্ছে, রাত আরও তাড়াতাড়ি গভীর হোক। এ বাড়িতে আজ তাড়াতাড়ি নেমে আসুক রাতের প্রশান্তি। আজকের রাত শশধরের সঙ্গে বোঝাপড়ার রাত। সন্ধির রাত। খাওয়া-দাওয়ার পর একসঙ্গে দু খিলি পান পুরবে মুখে। এক চিমটি জরদা। তারপর বেশ মৌজ করে...।

'আর ঘুমিও না।'

গোপা শশধরের হাঁটুতে হাতের ভর রেখে উঠে দাঁড়াল। শশধরের গায়ের ওপর আঁচল খসে পড়ল। সেই অবস্থায় দু হাত ওপরে তুলে গোপা আড়মোড়া ভাঙল। তারপর আঁচল উঠিয়ে চলে গেল রান্নাঘরে। শশধর তাকিয়ে তাকিয়ে নিজের স্ত্রীকে দেখল। নতুন লাগছে। ভালো লাগছে। মনের জমিতে অনেক দিন পরে যেন বৃষ্টি নামল।

জ্ঞানেশ গাড়ি চালাতে চালাতে, রাস্তার দিকে চোখ রেখে একবার শুধু বললে, 'তুমি ভারি ভাল মেয়ে। কি নাম তোমার।'

পার্বতী ।'

'বাড়িতে বলে এলে না। ভাববে না তো !'

'বাবুরা বাইরে গেছে। কাল ফিরবে।'

তনু দাঁতে দাঁত চেপে আছে। অদ্ভুত একটা যন্ত্রণা ঠেলে ঠেলে ওপর দিকে উঠছে। পথ যেন ফুরোতেই চাইছে না। অমিতাভ এখনও কেন ফেরেনি। অন্য দিন তো ফিরে আসে। কি হল। বিপদ-আপদ কিছু হয়নি তো !



॥ তেইশ ॥

দূর থেকে চোখে পড়ছে আলোর হরফে লেখা, অ্যাপলো। জ্ঞানেশ যেন হালে পানি পেল। যন্ত্রণাকাতর অসুস্থ মানুষের জন্যে যখন কিছু করা যায় না, তখন মনে হয় এর চেয়ে নিজে অসুস্থ হওয়া ছিল ঢের ভালো। এতক্ষণ তনু খুব চেষ্টা করছে নিঃশব্দে সহ্য করার। পারছে না। মাঝে মাঝে বেরিয়ে পড়ছে আর্ত শব্দ। যাক, এইবার যা হয় একটা কিছু হবে।

পার্বতী বললে, 'সাহেব আর কতদূর ! বড় কষ্ট হচ্ছে মেমসায়েবের। কি হয়েছে সায়েব ?'

'কি হয়েছে ঠিক জানি না গো ? এইবার জানা যাবে। আমরা এসে গেছি।'

কথা বলতে বলতে জ্ঞানেশের গাড়ি নার্সিং হোমের গেটে ঢুকে গেল। ভেতরে গাড়ি রাখার সুন্দর ব্যবস্থা। জ্ঞানেশকে পার্বতীর ভীষণ ভাল লেগে গেছে। কি সুন্দর দেখতে ! যেন রাজেশ খান্না। কি সুন্দর মিষ্টি কথা ! পার্বতী জোরে একটা নিঃশ্বাস ফেলল। তার ভীষণ ভালোবাসতে ইচ্ছে করে। একটু আগে যে ছেলেটার সঙ্গে কথা বলছিল তার নাম মেহের। তিন মাস ছেলেটা পেছন পেছন ঘুরছে। এই বয়সেই দু-দুবার জেল খাটা হয়ে গেছে। কোমরে সব সময় ছ'ইঞ্চি একটা চাকু গোঁজা থাকে। বাপের ঠিক নেই। মা কোথায় ভেগে গেছে তাও জানে না। পার্বতী সব সময় ভয়ে ভয়ে থাকে। ডাকলেই চলে আসতে হয়। নয় তো জানে মেরে দেবে। ভদ্রলোকদেরও পার্বতী সহ্য করতে পারে না। জরু কা গোলাম অথচ এমন করে তাকায় যেন পার্বতী একটা লাড্ডু। সুযোগ পেলেই জিভে ফেলে দেবে। কিন্তু এই বাবুটিকে তার ভীষণ ভাল লেগেছে। পার্বতী আবার একটা নিঃশ্বাস ফেলল। আচ্ছা মেমসায়েব তো অসুস্থ ! এখুনি নার্সিং হোমে ভর্তি হবে। দেখ-ভাল করার জন্য একজন আয়া তো লাগবে। বলবে না কি নিজের কথা বাবুকে ?

জ্ঞানেশ নেমে এসেছে। পেছনের জানলায় মুখ বাড়িয়ে জ্ঞানেশ বললে, 'তুমি একটু বসবে ! আমি স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করি।'

তনু দু হাতের মুঠোয় পার্বতীর শাড়ি খামচে ধরে আছে। পার্বতী বললে, 'সায়েব সারাদিন তোমার খাওয়া হয়নি। তাই না সায়েব ?'

জ্ঞানেশ অবাক হয়ে গেল। একেই বলে মায়ের জাত। সে ম্লান হেসে বললে, 'ঠিক ধরেছ।'

জ্ঞানেশের আর দাঁড়াবার সময় নেই। হন হন করে এগিয়ে গেল অফিসের দিকে। সন্দেহ হচ্ছে, কিশোর আছে তো ? কিশোর ছাড়া আর কারুকে সে চেনে না।

কিশোর আছে। এক মহিলা ডাক্তারের সঙ্গে গম্ভীর মুখে কথা বলছে। চোখে সোনার

ফ্রেমের চশমা। আলো পড়ে ঝকঝক করছে। কিশোরকে দেখলেই জ্ঞানেশের ভীষণ ভাল লাগে। ঠিক যেন যীশু খ্রীস্টের মতো চেহারা।

জ্ঞানেশকে দূর থেকে আসতে দেখেই কিশোর বললে, 'হ্যালো ফ্রেণ্ড। কি ব্যাপার!'

জ্ঞানেশ কাছে গিয়ে বললে, 'একটা এমার্জেনসি কেস আছে। এখুনি অ্যাটেণ্ড করতে হবে। তুমি স্ট্রেচারের ব্যবস্থা করো।'

'রুগি কোথায়?'

'বাইরে গাড়িতে।'

'ইজ ইট!'

কিশোর জ্ঞানেশের সঙ্গে যেতে যেতে মহিলা ডাক্তারকে বললে, 'হারি-আপ, এ স্ট্রেচার।'

গাড়ির কাছে পৌঁছতেই পার্বতী বললে, 'মেমসায়েবের কাপড় রক্তে ভেসে গেছে।'

কিশোর বললে, 'তোর বউ?'

'না। আমার মাস্টার মশাইয়ের পুত্রবধূ।'

'কি হয়েছে?'

'জানি না রে।'

জ্ঞানেশ যা জানে সংক্ষেপে বললে।

'ইজ শি প্রেগনান্ট?'

'হতে পারে।'

স্ট্রেচার এসে গেল। তনু আর কোনও শব্দ করছে না। হয়তো জ্ঞান হারিয়েছে। পার্বতী একাই তনুকে স্ট্রেচারে শুইয়ে দিল। এমন যত্নে, যেন তার নিজের কোনও আপনজন।

নিঃশব্দে, মন্থর গতিতে স্ট্রেচার এগিয়ে চলেছে লিফটের দিকে। পার্বতী চলেছে স্ট্রেচারের পাশে পাশে। একটা হাত ছুঁয়ে আছে তনুর মাথা। মুখে অসীম উৎকণ্ঠা। জ্ঞানেশ অচেনা, অজানা এই মেয়েটিকে যত দেখছে তত অবাক হচ্ছে। মধ্যবিত্ত-ঘরের লেখাপড়া জানা মেয়ে হলে কি হত।

কিশোর ফিসফিস করে বললে, 'জানিস, মনে হচ্ছে মিসকারেজ হয়ে গেল।'

'সে কি রে? কোনও ভাবে বাচ্চাটাকে সেভ করা যায় না!'

'দাঁড়া, আগে টেবিলে তুলি। তারপর সবই তাঁর ইচ্ছা।'

সার্ভিস লিফটে স্ট্রেচার ঢুকে গেল। প্রায় একটা ঘরের মতো আকৃতি। ভেতরটা দুধের মতো সাদা। ফ্লোরেসেন্টের আলোয় থমথম করছে। মনে হচ্ছে কত রাত। জ্ঞানেশের মনে হচ্ছে, সে যেন এক স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে ভেসে চলেছে। তনুর দিকে সাহস করে তাকাতে পারছে না। একেবারে বুকের কাছে পার্বতী। তেল-চুকচুকে চুলে আলো পড়ে চকচক করছে। চওড়া পিঠ। সুন্দর ঘাড়। গোল খোঁপা। নীল ব্লাউজ। উজ্জ্বল ঝকঝকে চামড়া। জ্ঞানেশ এই সবই দেখছে। নারীদেহ সবই ভুলিয়ে দেয়।

পালকের মতো ভেসে ভেসে লিফট্ ঊর্ধ্বগামী।

অমিতাভ নাগপাশ থেকে মুক্তির জন্যে ছটফট করছে। আর ভালো লাগছে না। ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। মেরি বললে, 'লেট আস হ্যাভ সাম ড্রিঙ্ক। অ্যাণ্ড স্টার্ট এগেন উইথ ফ্রেশ এনার্জি।'

হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপল মেরি। চাপা আলোর মায়া ছড়িয়ে পড়ল সাজানো ঘরে। লম্বা লম্বা সুগঠিত পায়ে মেরি উঠে দাঁড়াল। সম্পূর্ণ নগ্ন। পোশাকের উপর এত ঘৃণা, সব খুলে তালগোল পাকিয়ে ফেলে দিয়েছে একপাশে। অমিতাভ তাকিয়ে আছে। আবার সে সব কিছু ভুলে যেতে শুরু করেছে। শুধু মনে হচ্ছে, জ্যাঠামশাইয়ের আঁকা একটা ক্যানভাস হঠাৎ জীবন্ত হয়ে উঠেছে। একবার তনুর কথা ভাবার চেষ্টা করল। এসেই মিলিয়ে গেল। বড় অ্যানিমিক?

একেবারে সাদামাটা, গাঁটছড়া-বাঁধা বউ। পিতা শিবপদকে ভাবার চেষ্টা করল। অসম্ভব। ধারে-কাছে আনা গেল না। বড় করুণ। জীবনহীন জীবন। মেরি ফ্রিজের দরজা খুলেছে। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে আছে। আলোর আভায় সর্বনেশে দেখাচ্ছে। অমিতাভ যতটা দূরে সরার চেষ্টা করছিল ঠিক ততটাই কাছে সরে গেল আবার। তার শুভবুদ্ধির ডানা ভেঙে গেছে। দুটো গেলাস হাতে মেরি এগিয়ে আসছে। পা ফেলার তালে তালে তার যৌবন নাচছে। অমিতাভর ভেতরে একটা আগুনের সাপ আবার হিস হিস করতে শুরু করেছে। মেরি দুপা তুলে অমিতাভের কোলের কাছে বসল। মায়াবিনীর মত হেসে, অমিতাভের ঠোঁটে গেলাস তুলে ধরল, 'দিস ইজ লাইফ। ওয়াইন অ্যাণ্ড ওম্যান ইন দিস গডলেস ইউনিভার্স।' মেরির ডান হাতে গেলাস। বাঁ হাত অমিভাভের শরীরে খেলে বেড়াচ্ছে। সব ভুল হয়ে যাচ্ছে অমিতাভের। সে কে? কার ছেলে? কার স্বামী?

দেবী শিবের বিছানার চাদর পাল্টাতে পাল্টাতে বললে, 'আজ ঠিক দশটার মধ্যে শুয়ে পড়বেন। সারাদিন অনেক ধকল গেছে।'

কৃষ্ণ বললে, 'আমার কি রকম বড় বড় হাই উঠছে! ঠিক যেন বাঘের মতো?'

তোতা বললে, 'মা, আজ আমি দাদার কাছে থাকবো। থাকবো মা? তুমি রাগ করবে?'

'তুমি মাঝ রাতে বড় জ্বালাও মা। দাদাকে ঘুমোতে দেবে না।'

'আমি জল খাব না। তাহলে আর হিস হবে না।'

শিব বললে, 'তোমার আপত্তি না থাকলে ও থাকুক না আমার কাছে। মাথায় হাত রেখে বেশ কেমন ঘুমিয়ে পড়ব।'

'আমার আপত্তি নেই বাবা। তবে ও কিন্তু আপনাকে ঘুমোতে দেবে না।'

'আর ঘুম? আমাকে তো জাগতেই হবে। জ্ঞানেশ না আসা পর্যন্ত। বড় দুশ্চিন্তায় আছি। তনু কেমন রইল! ঠিক মত পৌঁছল কি না!'

কৃষ্ণ বললে, 'আব বেশি ভাবিসনি। ষাট সত্তর বছর ধরে বহুত ভেবেছিস। এখন সব ভাবনা ফেল দে। ভেবে কিছু থামানো যায় না। যা হবার তা হবেই। হ্যাঁরে আমি এবার উঠি। পাগলিটা একা আছে।'

'হ্যাঁ গো, তুমি এবার যাও। বাত ভন ভন করছে।'

'বাঃ বেশ বললি তো?'

কৃষ্ণ উঠে পড়ল। কোঁচাটা দুবার ঝেড়ে নিয়ে বললে, 'একটা সুবিধে, আজ আর রাতে খেতে হবে না। রাজসিক খাওয়া হয়ে গেছে।'

কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল। রাত নটা বাজল।

শিব বললে, 'তোতা, তুমি তাহলে খেয়ে এস।'

'আজ আর আমি কিছু খাবো না দাদাই। আমার পেট ভরে গেছে।'

দেবী বললে, 'হ্যাঁ বাবা, আজ রাতে ওকে আর কিছু দোব না।'

'ও কি তাহলে এখানেই থাকবে?'

'থাকুক না। তবু আপনার একজন সঙ্গী হবে।'

'তোমাকে একটা কথা বলব মা?'

'বলুন না বাবা।'

'দ্যাখো মা, আমাব খুব ইচ্ছে তুমি ও বাড়িটা ছেড়ে দাও। আমার এত বড় বাড়ি, তোমরা এখানে এসে সাজিয়ে বোসো। অত টাকা ভাড়া বেঁচে যাবে। তাছাড়া দিনকাল ভাল নয়! একা একা থাকো। আমি বড় দুশ্চিন্তায় থাকি। দ্যাখো আমার তো কেউ নেই মা। কবে আছি কবে নেই। একটা ডিড ডকুমেন্ট করে বাড়িটা তোমাকেই দিয়ে যেতে চাই। মেয়েটাকে মানুষ

কোরো। বেস্ট এডুকেশান। আমাদের দেশের মেয়েদের পরাধীনতা আজও ঘুচল না। এখনও তারা ক্রীতদাসী। সারা জীবন সংসারের জোয়াল টানে আর ঝ্যাঁটা জুতো লাথি খায়। যারা বিদ্রোহ করে তাদেরও কম শাস্তি ? ভেসে বেড়ায়। ঘর পায় না। ভোগের দুনিয়া। আদর্শ বইয়ের পাতায়, মহাপুরুষের বাণীতে হাই তুলছে।'

দেবী বিছানায় উঠে হামাগুড়ি দিয়ে মশারি গুঁজছিল ঘুরে ঘুরে। শিবের কথা শুনে থমকে গেছে। সর্বনাশ ! বৃদ্ধের এ কি সিদ্ধান্ত ! ছেলে, ছেলের বউ। আজ তারা দূরে। একদিন তারা আসবেই। রক্তের সম্পর্ক, যাবে কোথায় ! পাড়া-প্রতিবেশীই বা কি বলবে ! এমন বদনাম রটাবে—দুজনেরই মুখ পুড়বে। মানুষের মুখে কোনও লাগাম নেই। মনে নরককুণ্ড।

তাড়াতাড়ি মশারির মাথার দিকটা গুঁজে দেবী নেমে এল। আজ এ ব্যাপারে সে কোনও কথা বলবে না। হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আবেগে। ছেলের ওপর অভিমানে। হয়তো নিজে থেকেই মত পাল্টাবেন। দেবী বললে, 'বাবা,আজ আর কোনও কথা নয়। আজ আপনারা শুয়ে পড়ুন। এসব কথা পরে হবে।'

'না না। আর তো কথার কিছু নেই। আমার জীবনের একটাই নীতি, সিদ্ধান্ত আর সমাধান। পেণ্ডুলামের মতো আমি দুলি না। নো সুইঙ্গ। না, তুমি আর দেরি কোরো না। তুমি এবার এসো।'

তোতার মাথায় হাত রেখে দেবী বললে, 'কি রে কাঁদবি না তো !'

'না গো মা ! কাঁদব কেন ? আমি কি বাচ্চা মেয়ে।'

'না মা তুমি ডেঁপো মেয়ে ! পেকে একেবারে ঝুনো হয়ে গেছ।'

'মা গুড নাইট।'

'শুভরাত্রি মা।'

জলো খাতাপত্র গোছগাছ করে এক পাশে সরিয়ে রেখে উঠে দাঁড়াল। মাথার ওপর দু হাত তুলে আড়ামোড়া ভাঙল। তার কাছে কারুর কোনও পাওনা নেই। উল্টে তারই পাওনা আছে অনেকের কাছে। আদায় করতে পারলে দশ বারো হাজার এখুনি এসে যায়। ভবিষ্যতের একটা ছবি মনে মনে এঁকে ফেলেছে। এখন দরকার একটু মনের জোর। এই রাত ! রাতকেই তার ভীষণ ভয়। কানে কানে ফিস ফিস করে কত প্রলোভনই যে দেখায় !

দখিনের বাতাসের মত মৃদু পায়ে গোপা ঘরে এল, 'কি গো বাবু ! হিসেব-নিকেশ হল ?'

শরীরে ঝাঁকুনি মেরে জলো বললে, 'হ্যাঁ। হয়ে গেল।'

'কি দেখলে ? লাখোপতি না ক্রোড়পতি ?'

'সামান্য হাজার বিশেক টাকা ছড়িয়ে আছে বাজারে।'

'আমার সব রান্না শেষ। চলো। সারাদিন ঘুরছো। এবার খাবে তো !'

'তোমাকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে বউদি। আমার পয়সা থাকলে আজ বাড়িতে সানাই বসাতুম। রজনীগন্ধার মালা। ছোট ছোট আলোর ঝিলমিলি। আবার বিয়ে লাগিয়ে দিতুম বাড়িতে।'

'দাঁড়াও না, ফাল্গুনে তোমার বিয়ে দোব। তখন যা ঘটা হবে না ! জোড়া সানাই লাগাব।'

'আমার বিয়ে ! আমাকে কেউ মেয়ে দেবে না বউদি। এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।'

'বিয়ে তো আমি দোবো, তুমি দয়া করে পিঁড়েতে বসবে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে রেডি হয়ে নাও। আজ যা রেঁধেছি না। অনেক দিন এমন রান্না রাঁধিনি।'

'দাদা কি করছে গো ?'

'ফুর ফুরে বাতাসে ঘুমিয়ে পড়েছে।'

'দাদার সামনে যেতে আমার ভয় করছে। জানো বউদি, দাদা আমাকে ক্ষমা করেনি।'

'তুমি তোমার দাদাকে ঘোড়ার ডিম চেনো। নিজের আখের হয়তো গুছোতে পারে নি। সেই বিচারে অপদার্থ। কিন্তু মনের দিক থেকে রাজা।'

জলো মনে মনে বললে, এই আবিষ্কারটা যদি দিন কতক আগে হত, তাহলে তোমার ওস্কানিতে আমাকে আর জানোয়ার হতে হত না। জলো কাঁধে তোয়ালে ফেলে বাথরুমের দিকে চলে গেল। গোপা আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কপালে ঘষে যাওয়া সিঁদুরের টিপ আঁচলে মুছে মুছে আবার গোল করতে লাগল।

কিশোরের কপালে ঘাম ফুটে উঠেছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘর। তবু কিশোর ঘেমেছে। জ্ঞানেশের দিকে তাকিয়ে বললে, 'কেস খুব ক্রিটিক্যাল।'

'তুমি যেমন করেই হোক বাচ্চাটাকে বাঁচাও।'

'তুই কি ভাবছিস, উপায় থাকলে আমি চেষ্টা করব না!'

'না, তা কেন? তোর জানা সম্ভব অসম্ভব যত রকম চেষ্টা আছে, সব, সব তুই লাগা।'

'তোকে একটা কাজ করতে হবে জ্ঞানেশ। তুই ভদ্রমহিলার স্বামীকে একবার নিয়ে আয়। হি মাস্ট বি হিয়ার। কিছু কিছু ব্যাপারে তাঁর অনুমতি চাই। সই-সাবুদ চাই। তুই ইমিডিয়েটলি ভদ্রলোককে নিয়ে আয়।'

জ্ঞানেশ নিচে নেমে এল। গাড়ির পাশে পার্বতী চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। জ্ঞানেশকে দেখেই প্রশ্ন করল, 'সাযেব সব ঠিক আছে তো?'

'না পার্বতী। কি হবে, বোঝা যাচ্ছে না।'

'একটা কথা বলব সাযেব!'

'বলো।'

'আপনি চট করে এই মেঠাই দুটো মুখে ফেলে দিন।' পার্বতী আঁচলের আড়াল থেকে ছোট্ট একটা ঠোঙা বের করে জ্ঞানেশের হাতে ধরিযে দিল। অবাক হযে গেছে জ্ঞানেশ। স্নেহের উৎস কোন হৃদযে গুপ্ত আছে কে জানে। জ্ঞানেশ না বলতে পাবল না।



॥ চব্বিশ ॥

তোতা মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসে আছে। শিব তাকে অনেক কাল আগের একটা পুতুল বেব করে দিয়েছে আলমারি থেকে। অমিতাভের শৈশবেব কিছু কিছু খেলনাপত্তর এখনও সাজানো আছে আলমারিতে। মানুষের শৈশব চলে গেলেও পুতুলের শৈশব থেকেই যায়। একজন খেলতে খেলতে চলে যায়, তো আব একজন এসে ধবে। শৈশবেব কি শেষ আছে!

তোতা বললে, 'দাদাই, এর নাম কি?'

শিব এক মুহূর্ত ভেবে বললে, 'ওর নাম মোহন।'

'এ খুব লক্ষ্মী ছেলে?'

'খুব লক্ষ্মী।'

'কোনও দিনও দুষ্টুমি করেনি ?'

'না। একদিন কেবল আলমারি থেকে লাফিয়ে পড়ার চেষ্টা করেছিল। আমি ধরে ফেলেছিলুম।'

'তুমি না ধরলে ওর কি হত ?'

'মাথা ফেটে যেত। পা ভেঙে যেত।'

'মরে যেত ?'

'কি যে হত কে জানে !'

'দাদাই, আমার বাবা কেন মরে গেল ?'

শিব কথার কোনও জবাব দিতে পারল না। কোথা থেকে কোথায় চলে এল ! কথা ঘুরিয়ে দেবার জন্যে বললে, 'আর কি, পুজো তো প্রায় এসেই গেল। কি মজা যে হবে !'

'কি মজা হবে দাদাই ?'

'আকাশে ইযা বড় বড় তুলোর হাতি, ঘোড়া, উট ভাসবে। সাদা সাদা পদ্মফুল ফুটবে। শিউলি বিছিয়ে থাকবে ঘাসের ওপর। দোয়েল শিস দেবে। তোমার কত নতুন নতুন জামা হবে। জুতো হবে।'

'তোমার কি হবে দাদাই ?'

'আমারও কত কি হবে !'

'কৃষ্ণ দাদুর ?'

'তারও হবে।'

'মোহনের ?'

'ওরও প্যান্ট জামা হবে।'

'খুব ছোট ছোট। তাই না দাদাই ? এক্টুকু এক্টুকু। এর পুরো নাম কি মোহনচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ?'

'হ্যাঁ ঠিক বলেছ। পুরো নাম, মোহনচন্দ্র মুখোপাধ্যায।'

তোতা হাই তুলল। মোহনকে বুকেব কাছে চেপে ধরে বললে, 'চলো এবার শোবে চলো। তোমার ঘুম পেয়েছে। কাল আবার সকাল সকাল উঠতে হবে। মাস্টারমশাই আসবেন।'

শিব তোতাকে কোলে করে বিছানায় তুলে দিল। তোতা বালিশে মাথা রেখে আর একটা হাই তুলে, ঘুম জড়ানো গলায় বললে, 'দাদাই, আমার একটা ভাই নেই কেন ?'

শিশুর এই প্রশ্নেব কি জবাব দেবে শিবের জানা নেই। উত্তর শোনার অপেক্ষায় তোতা আর জেগে নেই। শিশু এইভাবেই ঘুমিয়ে পড়ে। জ্যান্ত পুতুল ঘুমের রাজ্যে চলে গেছে। দু চোখের পাতা ফুলের কুঁড়ির মত বুজে গেছে। ঠোঁটের কোণে পাতলা হাসি। বাঁশীর মতো নাক। মসৃণ ঢালু কপাল। সারা মুখ ঘিরে থমকে আছে পবিত্র জ্যোতি। শিব অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। কে বলেছে, স্বর্গ অনেক দূরে ! বুকের কাছ থেকে ধীরে ধীরে পুতুলটা সরিয়ে নিল। মোলায়েম হাতে কপালের ওপর এসে পডা চুল তুলে দিল ওপর দিকে। মানুষ কেন শিশুই থেকে যায় না চিরকাল ! সেই তো ছিল ভাল ! বড় হওয়া মানেই পাপের জগতে তলিয়ে যাওয়া। শৈশব থেকে বার্ধক্য, মানুষের এই অনিবার্য গতি কিভাবে ঠেকান যায় ! নাঃ কোনও উপায় নেই।

Life's as we
Find it, death too.
A Parting poem ?
Why insist ?

শিব উঠে গিয়ে বিছানার মাথার দিকের জানালা খুলে দিল। চাঁদের আলো গড়িয়ে এল ঘরে। চারপাশ ফুট ফুট কবছে। কামিনীগাছ ফুলে ছেয়ে গেছে। তীব্র গন্ধ উড়ে এল ঘরে। কি

সুন্দর এই পৃথিবী ! নভোচারী মহাকাশ থেকে এই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে আনন্দে চিৎকাব করে উঠেছিলেন, 'বাঃ, কি সুন্দর !'

শিব আলো নিবিয়ে দিল। চেয়ারটাকে শব্দ না করে টেনে নিয়ে এল জানালার কাছে। বহুকাল পরে আজ চাঁদের আলোয় জেগে থাকার সঙ্কল্প। বিয়ের পর সুধাকে নিয়ে মুসৌরী গিয়েছিল। এমনি চাঁদের আলোর রাত ছিল। নীল আকাশ থমথম করছে মাথার ওপর। চারপাশে থমকে আছে ভারি ঠাণ্ডা। দূরে, বহু দূরে তুষারের মুকুটপরা পর্বতশ্রেণী ঝলমল করছে দেবতার মতো। হোটেলের বারান্দায় আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে বসে আছে দুজনে। সুধা একেবারে বুকের কাছে। গালে গাল ঠেকিয়ে। নিস্তব্ধ রাত। বাতাসও যেন চঞ্চলতা প্রকাশ করতে সাহস পাচ্ছে না। সুধার সেই উষ্ণ, নরম শরীর। শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে কোমল বুকের ওঠাপড়া। শাড়ির মসৃণতায় আবৃত দুটি জানু। সুধা মৃদু স্বরে গেয়ে চলেছে—তাঁরে আরতি করে চন্দ্রতপন। চুলের মিষ্টি গন্ধ। শরীরের ঘ্রাণ। এই তো সেদিনেব কথা। নাঃ, বহু বছর আগের কথা। মুসৌরিতেই অমিতাভ এসেছিল। না, হিসেবে কোনও ভুল হচ্ছে না। শিব, তুমি তখন যুবক ছিলে। কুচকুচে কালো চুল। সরু গোঁফ। শরীরে অসীম শক্তি। মনে কত স্বপ্ন, প্রেম, কল্পনা। এই দেহেই সব ছিল। সব চলে গেছে। নদীতে আব স্রোত নেই। মৃত উপলখণ্ড পড়ে আছে। অল্প অল্প জলধারা, প্রাণধারা ঝিরঝিব করে বয়ে চলেছে কোথাও কোথাও।

শিবের শরীরে হঠাৎ একটা কাঁপুনি খেলে গেল। দূরে একটা পেঁচা ডেকে উঠল, বাতচেবা সুরে। শিব নড়েচড়ে বসল। এবাবের মত খেলা শেষ। এই সাজপোশাক খুলে সরে যেতে হবে সাজঘরে। এবার নাট্যকার আবার কোন চরিত্র দেবেন কে জানে ' সুধা মনে হয় এতদিনে অন্য নাটকে নতুন চরিত্র পেযে গেছে।

আমি মুক্তিটুক্তি চাই না ঈশ্বর। আমি আবার আসতে চাই। আবাব আমি সুধাকেই চাই। কত কথা বলা হয়নি। কত খেলা খেলা হয়নি ! সুধা জানেই না। হঠাৎ চলে যাবাব কয়েক দিন আগে একটা বিলিতি সাবান আনতে বলেছিল। এই সবে তাব খুব শখ ছিল। শিব এনেছিল। সে-সাবান মাখার সুযোগ আর আসেনি। ঝকঝকে ব্যাপার মোড়া সেই সাবান সযত্নে রেখে দিয়েছে শিব। মাঝে মাঝে বের কবে দেখে। এ তো একটা আশা ' এমনি কত আশা মানুষ ফেলে রেখে যায় !

তোতা ঘুমের ঘোরে খিলখিল করে হেসে উঠল। স্বপ্ন দেখছে মেয়েটা : কি দেখছে কে জানে ' হযতো চাঁদের আলোয় ফুলের বাগানে দেবীব পেছন পেছন ছুটছে। হযতো ওই পুতুলটা, যার নাম রেখেছে মোহন, সে-ও জীবন্ত হযে উঠেছে। দীর্ঘ স্বপ্ন, ক্ষণস্বপ্ন, সব মিলিযে এ এক মধুর খেলা।

আজকাল নানা বকম কবিতা মনে ভেসে ওঠে। যত বয়েস বাড়ছে গদ্যের চেয়ে পদ্যেব ভক্ত হয়ে পড়ছে। তাকাহাশির সেই সুন্দর কবিতা মনে পড়ছে। এক সময় সুধাকে কবিতা আবৃত্তি করে শোনাত। বড় মনোযোগী শ্রোতা ছিল। এখনও সে কবিতা আবৃত্তি কবে। শ্রোতা সুধাই। শিব বুঝতে পারে, সুধা এসেছে। মৃত্যুর পর মানুষের জরা, ব্যাধি সব চলে যায়। চাঁদেব আলোয় জরির শাড়ির মতো ঝলমলে একটা অশরীবী শরীর পায়।

'শোনো সুধা' বলে শিব মৃদু গলায় শুরু কবল :

Nothing, nothing at all
is born,
dies, the shell says again
form the depth of hollowness.
Its body

swept off by tides—so **what?**
It sleeps
in sand, drying in Sunlight,
bathing
in moonlight, Nothing to do
with Sea
Or anything else. Over
and over
It vanishes with the Wave.

ঝিনুকের খোলা ॥ শূন্যগর্ভ ॥ জন্ম নেই ॥ মৃত্যু নেই ॥ ঢেউ আসছে ॥ ভেসে চলে যাচ্ছে ॥ তাতে কি ॥ বালির বিছানায় ঘুম ॥ রোদে পুড়ছে ॥ চাঁদের আলোয় স্নিগ্ধ হচ্ছে ॥ সমুদ্রে কি আসে-যায় ॥ কোনও কিছুতেই যায-আসে না ॥ ঢেউ আসছে ॥ ঢেউ যাচ্ছে ॥ এই ঝিনুক আছে ॥ এই আবার নেই।

কামিনীর থোকা বাতাসে দুলছে। সাদা ফুটির মতো চাঁদের আলো। সেই পেঁচাটা আবার ডাকছে। শিবের মাথা ক্রমশই ঝুলে আসছে বুকের দিকে। সেই কফিনেব ডালাটা খুলে গেছে। ভেতরে শুয়ে আছে সাত্যকি। তার মুখে অমলিন হাসি। একটা হাত ধীরে ধীরে ওপর দিকে উঠছে। হাতে একটা চামচে। চামচেটা ধীবে ধীরে এগিয়ে আসছে শিবের ঠোঁটের দিকে।

মেরি উঠে দাঁড়াল। সারা শরীরে একটা ঝাঁকুনি মেরে অমিতাভকে বললে, 'গেট আপ। ডান উইথ। ড্রেস আপ। নাও আই উইল প্রিপেয়ার মাই লেসনস্।'

অমিতাভ জড়ান গলায় বললে, 'হোয়াট লেসনস্?'

নেশা হয়ে গেছে। পেট খালি ছিল। চোখে ঘোর লেগেছে। উঠতে ইচ্ছে করছে না।

জিপফাস্টনার টানতে টানতে মেরি বললে, 'আই অ্যাম প্রিপেযারিং ফব চার্টার্ড সেক্রেটারিযালশিপ। গেট আপ মাই ম্যান। হারি ফব দি হোম। সামওয়ান ইজ ওয়েটিং দেযার।'

অমিতাভ উঠে পড়ল। জড়ানো গলায় বললে, 'হোয়্যাব ইজ দি লাভ?'

ব্রিফকেসটা হাতে ধরিয়ে দিতে দিতে বললে, 'নট হিয়াব ম্যান। মে বি ইন দি হেভন।'

অমিতাভকে ধরে ধবে দরজাব বাইরে অবধি নিয়ে এসে, মৃদু একটা ধাক্কা মেরে বললে, 'গেট এ ট্যাকসি। গুড নাইট।'

অমিতাভ বললে, 'নাইট ইজ সো ডার্ক। অ্যাণ্ড আই অ্যাম সো লোন্‌লি!'

মেরি বললে, 'অ্যাণ্ড দি পাথ ইজ নট স্ট্রেট।'

দরজা বন্ধ করে দিলে। মেবি প্রযোজন আর অপ্রয়োজনকে সহজেই আলাদা করতে জানে। যতক্ষণ প্রয়োজন ততক্ষণ টয়লেটে থাকবে। প্রয়োজন শেষ হয়ে গেলেই ফ্লাশ টেনে উঠে আসবে। জোর আলোটা জ্বেলে মেরি ফ্রিজ খুলল। রান্নার কোনও পাট নেই। পুরোপুরি 'ক্যানেডিযান লাইফ'। তৈরি খাবার। মোড়ক খোল আর খাও। মেরির দ্বিতীয় পিতা প্রায়ই বলত, 'লিভ ফর মানি। আদার দ্যান মানি এভরিথিং ইজ ট্র্যাশ।' সেই মহামানব এখন ক্যানাডায সেটল করেছে। তাব এই একটা কথাই বেদবাক্য হয়ে লেগে আছে মেরির মনে। সে বিযে করবে না। বিয়ে মানে টরচার। পবে ডিভোর্স। মেরি কথায় কথায বলে, 'আই উইল ম্যারি এ ডগ, দ্যান ডগ অফ এ ম্যান।' পুরুষদের সে ঘৃণা করে। ওয়ার্থলেস, সেলফিশ, ভালগার। যতক্ষণ যৌবন ততক্ষণ অলরাইট। তারপব কিক ইওর ওম্যান, অ্যাণ্ড হ্যাঙ অ্যারাউণ্ড বটল্‌স্। তার মাযের কান্না সে এখনও শুনতে পায়। টালিগঞ্জের কবরে শুয়ে আছে

সে মহিলা। মাঝে মাঝে মেরি যায়। জীবনে একজনকেই সে ভালবাসে। সে-জন তার মা।

গুন গুন গান গাইতে গাইতে মেরি স্যাণ্ডউইচ তৈরি করছে। রুটির পরে মাখন, তার ওপর হ্যাম, শশা, টোম্যাটো। মেরি গাইছে—দ্যাটস এ টাগ অফ ওয়ার। গানের ফাঁকে ফাঁকে হেসে ফেলছে। যখনই ভাবছে, এ এক আচ্ছা ফাঁদ। সাধু, শয়তান সকলকেই ধরা যায়। আর কি তাদের করুণ অবস্থা। ধর্ম, আদর্শ, মান, মর্যাদা, পজিশান, অপোজিশান সব ভেসে যায়। দ্যাটস এ টাগ অফ ওয়ার।

বড় রাস্তায় এসে অমিতাভ অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। সে বেরিয়ে গিয়েছিল। আবার ফিরে আসছে ভেতরে। না, কোনও অনুশোচনা, অপরাধবোধ, বিবেকের দংশন কিছুই আসছে না মনে। আদর্শবাদী, শিক্ষক পিতার কথা মনে আসছে না তার। তনুকেও মনে পড়ছে না। রাত একটু নেশাদার হওয়াই তো ভাল। শিক্ষিত, উন্নত পশ্চিম। রাতে কজন লোক ঘুমোয়। লিভ ফর প্লেজার।

ধারাল শিস দিতে দিতে দু'একটি যুবক পাশ দিয়ে চলে যাচ্ছে। কেউ কেউ সন্দেহের চোখে তাকাচ্ছে। পায়ের ফাঁকে ব্রিফকেস চেপে ধরে অমিতাভ দাঁড়িয়ে আছে। স্থির। গোলাপী দুনিয়া ঘুরেছে। রক্তে যেন বুলবুলি নাচছে। এই দুনিয়া তার বাড়ি। সবাই তার ভাই। সকলেই তার প্রেমিকা।

হঠাৎ একটা গাড়ি এসে থামল তার সামনে।

'আ গিয়া সাহাব। হাম দূর সে দেখা।'

ড্রাইভার দরজা খুলে ধরল। অমিতাভ অবাক। সেই সঙ্গে লজ্জিত। শরীরের স্বাভাবিক অবস্থা নেই। একটু বেহাল। শরীর জ্বলছে। রক্ত উন্মাদ। কোনও রকমে গাড়ির পেছনের আসনে নিজেকে ধপাস করে ফেলে বললে, 'তুমি এখনও গাড়ি গ্যারেজ করো নি?'

'নেহি সাব।'

গাড়ি চলতে শুরু করল। অমিতাভ কাঁপা কাঁপা হাতে একটা সিগারেট ধরাল। শরীর ক্রমশই ঝিম মেরে আসছে। গোটা দুয়েক টান দেবার পর তার মনে হল, যত দিন সে পৈতৃক বাড়িতে ছিল ততদিন সে যেন একটা শক্তির আশ্রয়ে ছিল। দুর্গে ছিল। আজ সে দাঁড়িয়ে আছে উন্মুক্ত রণাঙ্গনে, সম্পূর্ণ একা, নিরস্ত্র। রক্ষা করার মতো কোনও শক্তি আর তাকে ঘিরে নেই। চারপাশ থেকে ভয় তেড়ে আসছে। হালফিল ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনার কথা মনে পড়ছে। সহপাঠী বন্ধু তাপসের কথা সবার আগে এসে ভয় দেখাচ্ছে। ছেলেটাকে সবাই ভালো বলেই জানত। হাসি, খুশি, আমুদে, মিশুক, পরোপকারী, খরচে। খুবই জনপ্রিয় ছিল। এই কয়েক দিন আগে অমিতাভ খবর পেয়েছে, তাপস বেপাত্তা। ভালোবেসে বিয়ে করেছিল। একটি মাত্র ছেলে। নিউ আলিপুরে ফ্ল্যাট। ব্যাঙ্কের মোটা মাইনের চাকরি। ব্যাঙ্ক থেকে জালিয়াতী করে লাখ চারেক টাকা সরিয়েছে। সেই টাকা আর একটা মেয়েকে নিয়ে কোথায় যে ভেগেছে! পুলিস এখন হন্যে হয়ে খুঁজছে। ছাত্রজীবনে অমিতাভ রোজ কথামৃত পড়ত। কথামৃতে ঠাকুরের একটি গান এই মুহূর্তে ঘুরপাক খাচ্ছে মনে,

পড়িয়ে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী
মোহ ঝড় মায়া তুফান
ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী
একে মন মাঝি আনাড়ি
তায় রিপু ছজন কুজন দাঁড়ি
কলুষের কু-বাতাসে দিয়ে পাড়ি
হাবুডুবু খেয়ে মরি ॥

অমিতাভ একটু জোরেই বলে ফেলল, 'আমি কি তাপস হয়ে যাচ্ছি?'

ড্রাইভার কি বুঝল কে জানে, উত্তর দিলে, 'নেহি সাহাব।'

অমিতাভ সোজা হয়ে বসল। 'নেহি'। কিন্তু তাপসের বীজ যে তার মধ্যেও রয়েছে। বেশ জীবন্ত বীজ। আজ সার পড়েছে। জল পড়েছে। ছোট্ট একটা চারা মাথা তুলেছে। প্রবণতা কোন দিকে!

বেশ জোরেই নিজেকে প্রশ্ন করলে, 'কোন্ দিকে?'

ড্রাইভার মগনলাল বললে, 'কাহে সাহাব? ঘর তো চলেঙ্গে।'

'ঘর! কাঁহা ঘর! কিসকা ঘর?'

সায়েবের নেশা হয়েছে। মগনলাল বললে, 'আপ শো যাইয়ে। আরামসে রহিয়ে।'



॥ পঁচিশ ॥

পার্বতী জ্ঞানেশের পাশে বসেছে। জ্ঞানেশ ঊর্ধ্বশ্বাসে গাড়ি চালাচ্ছে। রাস্তা সাঁই সাঁই করে গুটিয়ে যাচ্ছে পেছন দিকে। জ্ঞানেশের মন এখন সম্পূর্ণ চিন্তাশূন্য। কোনও কিছুই তার আর ভাবতে ভাল লাগছে না। যা হয় হবে। গীতার কর্মযোগ কি একেই বলে! কাজ করে যাও। ফলের আকাঙ্ক্ষা কোরো না।

জ্ঞানেশ মৃদু গলায় বললে, 'পার্বতী, তোমার মন খারাপ?'

পার্বতী একটু হেসে বললে, 'আমার মন নেই গো দাদা।'

'সে কি, মন ছাড়া মানুষ হয়?'

'এই তো হয়েছি।'

'তা হলে তুমি আমায় মিষ্টি খাওয়ালে কেন? সত্যিই আমার খিদে পেয়েছিল।'

পার্বতী উত্তর দিতে পারল না। তাকিয়ে রইল পথের দিকে। সোজা চলে গেছে দূরে। জোড়া জোড়া আলো ছুটে আসছে হু হু করে। ভাসতে ভাসতে চলে যাচ্ছে পাশ দিয়ে।

জ্ঞানেশ বললে, 'তুমি খুব ভালো মেয়ে। তোমার সঙ্গে আর কি কোনও দিন দেখা হবে!'

'ওই মেহেরশালা মেরে না ফেললে দেখা হতেও পারে। আপনাকে আমার ভীষণ ভাল লেগে গেছে।'

'মেহের শালা কে?'

'ওই যে গুণ্ডাটা। যার সঙ্গে কথা বলছিলুম। বহত্ খতরনক আদমী।'

'খুন করবে কেন?'

'ও আমাকে খারাপ কামে লাগাতে চায়। আর আমি খারাপ হতে চাই না। আমি ভালো হব। সায়েব তুমি আমাকে তোমার ওই বন্ধুর হাসপাতালে একটা আয়ার কাজ করে দাও না। আমি বেঁচে যাই।'

'করবে তুমি?'

'জরুর।'

পার্বতী উত্তেজনায় জ্ঞানেশের দিকে সরে এল। জ্ঞানেশ যেন লাইট হাউস। পার্বতী দিশাহারা নাবিক।

'আমি কিশোরের সঙ্গে কথা বলব। মনে হয় হয়ে যাবে।'

'সত্যি হবে ?'

'কিশোর আমার বন্ধু। খুব ভাল ছেলে। আমি তোমার জন্যে বলব।'

'সায়েব তোমার ঠিকানাটা আমাকে দেবে ? পরে তোমার সঙ্গে দেখা করব।'

'আজই তোমাকে আমার বাড়ি চিনিয়ে দোব।'

উত্তেজনায় কাপড় এলোমেলো হয়ে গিয়েছিল। পার্বতী গুছিয়ে বসল।

জ্ঞানেশ বললে, 'আমার বাঁ পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট আর লাইটারটা বের করো তো।'

জ্ঞানেশের গায়ে হাত ঠেকিয়ে পার্বতীর খুব সুখ হল। হালকা নেশার মতো।

'একটা সিগারেট বের করে আমার ঠোঁটে লাগিয়ে দাও। লাইটার জ্বালাতে পারো ?'

'পারি।'

লাইটারের আলোয় পার্বতীর মুখ উদ্ভাসিত হল। সিগারেটের আগায় আগুন নিতে নিতে জ্ঞানেশ আড়চোখে তাকিয়ে দেখল। বেশ দেখতে। সাজিয়ে গুজিয়ে দিলে যে কোনও আচ্ছা-সুন্দরীর কান কেটে দিতে পারে। গোল হাতে কাঁচের চুড়ির রিনিঠিনি। নেশা ধরে যায়, নেশা।

তনুর অ্যাপার্টমেন্টের বিশাল গেটের সামনে জ্ঞানেশকে থামতে হল। চকোলেট রঙের আর একটা গাড়ি ঢুকছে। পেছনের আসনে আরোহী এলিয়ে বসে আছে। মাথাটা একদিকে হেলে আছে। হয় পরিশ্রমে ক্লান্ত, না হয় খুব টেনেছে। আজকাল উঁচু মহলে মদ্যপান একটা ফ্যাশান। না করলে জাতে ওঠা যায় না।

সামনের গাড়ির পেছনের লাল আলো পিক পিক করে জ্বলছে নিবছে। কিরি কাটা কাঁচ। দেখলেই মনে হয় লেবু লজেন্স।

পার্বতী বললে, 'সায়েব আমি এখানে নেমে যাই। অন্ধকারে লুকিয়ে থাকি। মেহের শালা এখুনি ধরবে।'

'কোথায় সে ?'

'ওপাশে কোথাও আছে ঘাপটি মেরে।'

পার্বতী সাবধানে নেমে গেল। শব্দ না করে। ক্লিক করে দরজা বন্ধের শব্দ হল। জ্ঞানেশের পাশটা ফাঁকা হয়ে গেল। আসনে লেগে রইল উষ্ণতা। শিক্ষিতা, সফেসটিকেটেড, প্যানপেনে মেয়েদের চেয়ে এই ধরনের মেয়ে যেন অনেক ভাল। শিক্ষা নেই, প্রাণ আছে। একেবারে মাটি ছেনে তৈরি।

গাড়ি পার্ক করতে করতে জ্ঞানেশ দেখল আগের গাড়িটা গোল হয়ে ঘুরে বেরিয়ে যাচ্ছে। দূরে অস্পষ্ট আলোয় একটি লোক ধীরে ধীরে হেঁটে লিফ্‌টের দিকে এগোচ্ছে। বড় নির্জন, ভুতুড়ে পরিবেশ। এত বড় একটা অ্যাপার্টমেন্ট কমপ্লেক্স ! সব গেল কোথায় ? না এইটাই বড় মানুষের ধরন। কেউ কারুর সঙ্গে মিশতে পাবে না। পশুরা যূথবদ্ধ জীব। মানুষ দেবাংশ। তার বিচরণ একক ভূমিতে।

ভাবতে ভাবতে দরজাটা লক করে ফেলল জ্ঞানেশ। লিফটের দিকে আপন মনে এগোচ্ছে চাবি ঘোরাতে ঘোরাতে। কিছুই সে আর ভাবছে না। ভাবতে ভাল লাগছে না। মাঝে মাঝে তার এমন হয়। বিশেষত সঙ্কট মুহূর্তে। চারদিকে খিচিরমিচির। জ্বলে পুড়ে যাচ্ছে। ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাচ্ছে। সম্পর্কে চিড় ধরছে। মৃত্যু। আত্মীয় বিরোধ। জ্ঞানেশ লক্ষ করে তার মনটা ধীরে ধীরে বেলুনের মতো উঠে যাচ্ছে ওপর দিকে। সবেতেই আছে, অথচ কোনও কিছুতেই নেই।

মাথার ওপর থেকে আলো পড়ে লিফ্‌টের সামনে একটা আলোর বৃত্ত তৈরি হয়েছে। কেউ

নেই। কিন্তু কেউ ছিল। পোড়া তামাকের, বিলিতি সেন্টের গন্ধ বেরোচ্ছে। পুট্ পুট্ করে আলো জ্বলছে নিবছে। লিফট ওপরে উঠছে। হঠাৎ জ্ঞানেশের মনে হল, সে কোন ফ্লোরে যাবে! তনুর সঙ্গে উঠেছিল। আবাব নেমে এসেছিল। কোন উঁচুতে উঠেছিল সে। মনে তো নেই?

নিঃশব্দে লিফটের দরজা খুলে গেল। শূন্য নিষ্প্রাণ একটা ব্রিফকেস ফ্লোরের একপাশে বিপন্নের মতো বসে আছে।

এ আবার কি!

জ্ঞানেশ জিজ্ঞেস করল, 'কি হে এলে কোথা থেকে? যাবে কোথায়? মতলবটা কি?'

নিজেব মনেই হাসল। এ যেন আবব্যবজনীর বাত। কত কাণ্ডই যে ঘটছে। উঠবে কি উঠবে না। চুরির দায়ে পড়বে না তো। তার জন্যে কেউ ফাঁদ পাতে নি তো?

মন আবাব বিকল হয়ে গেল। থাক না। চলুক না সহযাত্রী হয়ে। তার কি এসে যায়! তবে যাব জিনিস তার কাছে ফিরে গেলে মন্দ হত না।

হঠাৎ লিফ্টেব দরজা ধীরে ধীরে বন্ধ হচ্ছে দেখে জ্ঞানেশ টপাস করে ঢুকে পড়ল আড় হয়ে। ওপর দিকে উঠছে। জ্ঞানেশ বোতাম টিপতে ভুলে গেছে। লিফ্ট কিন্তু উঠছে। পায়ের কাছে ব্রিফকেস কাঁপছে। কিছু দূর উঠে থামল। দবজা খুলে গেল হুস্ করে। সামনেই এক যুবক। লম্বা। এক মাথা ঘন কালো চুল। কোঁকড়া কোঁকড়া। পাকা সায়েবী পোশাক। বুকেব কাছে দুলছে ফাঁস আলগা টাই। সবই আছে তবে এলোমেলো। ঝড বয়ে গেছে শরীরের ওপর দিয়ে। এখানে যারা থাকে তাদের এই রকমই বোধ হয জীবন।

'আমার ব্রিফকেস। থ্যাঙ্ক ইউ।'

ব্রিফকেসটা তুলে নিতে নিতে অমিতাভ জ্ঞানেশকে বললে।

জ্ঞানেশ অমিতাভকে তেমন ভাবে না চিনলেও, তাব মনে হল চেনা চেনা। কোথায় যেন দেখেছে। জ্ঞানেশও নেমে পড়ল। নেমেই মনে হল এই ফ্লোব। মেঝেতে একটা চুলের ক্লিপ পড়ে আছে। তনুব চুল থেকেই খুলে পড়েছে।

দবজায় চাবি গলাবার চেষ্টা কবছে অমিতাভ। পাবছে না। মেবি কি খাইয়ে দিয়েছে কে জানে। ঘোব নেশা। মাথা ভোঁ ভোঁ কবছে।

জ্ঞানেশ বললে, 'আপনি অমিতাভবাবু?'

অমিতাভ সোজা হতে গিযে টাল খেল। চোখ বড় বড কবে জ্ঞানেশেব দিকে তাকাবার চেষ্টা করল। অসম্ভব ঘেমেছে। জ্ঞানেশের নাকে হুইস্কিব গন্ধ আসছে।

অমিতাভ সন্দেহ জড়ানো গলায় বলল, 'কেন বলুন তো!'

'দিন, আমার হাতে চাবিটা দিন। খুলে দিচ্ছি।'

'হু আর ইউ!'

'আমি আপনার বাবার ছাত্র।'

'বাবা? বাবার ছাত্র! সে আবার কে?'

'ভেতরে চলুন, বলছি।'

'বলার কি আছে, আমি সব জানি। আই নো এভরি থিং। আমাকে জানাবার কিছু নেই। ইউ ক্যান গো। আপনার সঙ্গে বাজে বকার সময় আমার নেই।'

আলতো করে অমিতাভের পিঠে হাত রেখে জ্ঞানেশ বললে, 'উত্তেজিত হবেন না। আপনার খুব বিপদ হয়েছে।'

'বিপদ? কি বিপদ?'

কথায় কথায় দরজা খুলে গেছে। খোলাই ছিল। তনুকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার সময় জ্ঞানেশ দরজা ভেজিয়েছিল! চাবি দেবার কথা মনে ছিল না।

অমিতাভ ঘরে ঢুকে আর একবার টাল খেল। দেয়ালে পিঠ রেখে জড়ান গলায় বললে, ‘কি বিপদ? কার বিপদ?’

‘আপনার স্ত্রী তনুর।’

অমিতাভ মাতালের মতো হাত নেড়ে বললে, ‘জানি, জানি। সে হাওয়া খেতে গেছে। ফূর্তি করতে গেছে। হু আর ইউ? তুমি কে? ওটা আমার কাছে কোনও খবরই নয়। আই ওন্ট পে ইউ এ ফার্দিং ফর দ্যাট। ক্লিয়ার আউট। ক্লিয়ার আউট।’

ব্রিফকেসটা দুম করে কার্পেটের উপর ফেলে দিল। সেটা ধড়াস করে উল্টে পড়ল।

জ্ঞানেশ বললে, ‘আপনার স্ত্রী এখন নার্সিংহোমে।’

‘আপনি আমার স্ত্রীর নাম জানলেন কি ভাবে? এনি ইলিসিট রিলেশান্?’

জ্ঞানেশ দৃঢ় গলায় বললে, ‘কথা না বাড়িয়ে আমার সঙ্গে চলুন।’

‘কোথায়? হোয়্যার টু।’

‘নার্সিংহোমে।’

‘তনু এখন একটা লোকের সঙ্গে কোল্ড ড্রিংক খাচ্ছে। আই নো দ্যাট। ইউ আর এ ব্লাফার।’

জ্ঞানেশ অবাক হল। অমিতাভ জানল কি ভাবে! আশ্চর্য! দৈবশক্তির অধিকারী! কে জানে! জ্ঞানেশ অমিতাভের দু কাঁধ ধরে ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে বললে, ‘ইউ আর ড্রাঙ্ক্।’

‘সো হোয়াট?’

‘আপনি আমার সঙ্গে চলুন। সিরিয়াস কেস। প্লিজ কাম টু সেনসেস্।’

‘ডু ইউ থিঙ্ক আই অ্যাম এ ননসেনস্... ? লেট হার ডাই। সে আমার কেউ নয়।’

‘অমিতাভবাবু!’

জ্ঞানেশের চিৎকারে অমিতাভ চমকে উঠল। জ্ঞানেশ আরও দুবার ঝাঁকাল প্রচণ্ড জোরে।

‘ডোণ্ট টাচ মাই বডি।’

অমিতাভ ঠেলে সরাতে চাইল জ্ঞানেশকে। পারল না। জ্ঞানেশের শক্তি অনেক বেশি।

‘আপনাকে আমি টানতে টানতে নিয়ে যাব। আপনি আমাকে চেনেন না।

‘আমি যাব না। শি ইজ মাই ফাদারস ওয়াইফ।

জ্ঞানেশ সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে একটা চড় কষাল অমিতাভের বাঁ গালে। রাগে তার সবশরীর জ্বলছে। এ কি? কোন বাপের কি ছেলে! এর নাম শিক্ষা! এর চেয়ে মূর্খ অনেক ভালো।

সপাটে চড় খেয়ে অমিতাভ চমকে উঠল। মাথা হেট হয়ে আছে বুকের কাছে। নেশার অর্ধেক উড়ে গেছে জ্ঞানেশের একটি মাত্র চড়ে।

ধীরে ধীরে মাথা তুলে বললে, ‘জানেন, আমি কে?’

‘জানি। আপনি বেহেড মাতাল। এবং অসভ্য জানোয়ার।

‘আমি পুলিস ডাকব। আই উইল থ্রো ইউ আউট।

‘আপনি সব করবেন। চলুন আমার সঙ্গে। আর সময় নেই।

অমিতাভ দেয়াল ঘেঁষে বসে পড়ল ধপাস করে। সজীব একটা পুটলির মতো পড়ে আছে জ্ঞানেশের পায়ের কাছে।

‘আচ্ছা জ্বালাতনে পড়া গেল দেখছি।’ জ্ঞানেশ মনে মনে বললে।

অমিতাভ দু হাঁটুর ওপর কপাল রেখে বসে আছে। আবার ঘোর আসছে। আলো ঘোলাটে হয়ে গেছে। হঠাৎ অমিতাভ কাঁদতে শুরু করল। ফুলে ফুলে। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে। ছোট ছেলের মতো।

জ্ঞানেশ পাশে বসে পড়ল। পিঠে হাত রেখে নরম গলায় ডাকল, ‘অমিতাভবাবু।’

অমিতাভ জড়িয়ে জড়িয়ে বললে, ‘আমি খারাপ হয়ে গেছি। আমার কেউ নেই। লোন্লি

ম্যান। অ্যাবসল্যিউটলি এ লোন্‌লিম্যান। আমাকে আপনি একটা টিকিট কেটে দিন। আই উইল ফ্লাই। আই ওয়ান্ট টু ফ্লাই। আই অ্যাম ইন এ কেজ।'

কানের কাছে মুখ এনে জ্ঞানেশ বললে, 'কি হচ্ছে অমিতাভবাবু ? আপনার স্ত্রী অসুস্থ। শি ইজ ব্লিডিং হোয়াইট। আপনি চলুন।'

'হু আর ইউ !'

'আমি আপনার বন্ধু। এ ফ্রেণ্ড।'

'বন্ধু ! এতদিন কোথায় ছিলে বাবা। আমার স্ত্রী নেই। শি ইজ মাই স্টেপমাদার।'

'বেশ আপনি আপনার মাকেই দেখবেন চলুন।'

'হোয়াই ! গেট মাই ফাদার। সেই প্রেমিক ভদ্রলোককে নিয়ে যাও বন্ধু। আমার যৌবন তার ব্যভিচার। উই সাফার ফর হিজ সিন। ক্লিয়ার আউট। ক্লিয়ার আউট। আই হ্যাভ মাই ড্রিমস্‌।'

জ্ঞানেশ উঠে পড়ল। ধ্যাত বেটা মাতাল ! আবোল-তাবোল, থার্ড ক্লাস, ভালগার কথাবার্তা। এই কারণেই তার বাপ হবার সামান্যতম ইচ্ছে নেই। জন্মের পথ ধরে কখন কোন মহাপুরুষ এসে হাজির হবে ! শেষ বয়েসটা একেবারে জ্বলেপুড়ে যাবে।

আর তো অপেক্ষা করা যায় না। ক' বোতল খেয়েছে ? ভোরের আগে ঘোর কাটবে ? তেঁতুল গোলা জল খাওয়াতে পারলে হত। কোথায় তেঁতুল ! এ কি উত্তর কলকাতার সাবেকি বাড়ি ! তেঁতুলের আচার, আমচুর, লেবুর আচার। এ হল মডার্নম্যানের হ্যাপি ভ্যালি।

ছেলেটাকে ছেড়ে যেতেও মায়া হচ্ছে। জাত মাতাল নয়। সবে ধরেছে। তবে এলেম আছে। মকার সাধনায় সিদ্ধিলাভ অবধারিত। অমিতাভ শুয়ে পড়েছে ইতিমধ্যে। বড় বড় নিঃশ্বাস। আর কিছু করার নেই।

তবু জ্ঞানেশ সারা ফ্ল্যাটটা একবার ঘুরে এল। সামনেই ফ্রিজ। খুলে এক বোতল ঠাণ্ডা জল বের করল। ফ্রিজের হাতলে পাট করা একটা ন্যাপকিন। ওয়াশ বেসিনে ফেলে ন্যাপকিনটাকে ঠাণ্ডা জলে আচ্ছা করে ভেজাল। ঘাড়ে আর মুখে চেপে ধরে রেখে দেখা যাক। নেশা যদি ছুটে যায়।

তোয়ালে ভেজাতে ভেজাতে জ্ঞানেশ চোখ বোলাচ্ছে চারপাশে। থরে থরে সাজান সুখের উপাদান। ছবি। ফুলদান। জিরে ফুল। টিংলিং পর্দা। আলোর ফানুস। স্বাগতম খাবার টেবিল। প্রেমিকা চেয়ার। যুগলমিলন খাট। কি নেই। সব আছে। নেই কেবল চিৎশক্তি। চিদানন্দ ছাড়া সব আনন্দই যে ম্লান !

নিজের মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপ্টা মারল জ্ঞানেশ।



॥ ছাব্বিশ ॥

শশধর আর জলো একসঙ্গে পাশাপাশি খেতে বসেছে। বহুকাল পরে এমন একটি ঘটনা ঘটছে এ বাড়িতে। গোপা খাবারঘর আর রান্নাঘরে ছোটাছুটি করছে। সরু বাসমতী চালের সুবাসে ঘর ভরে গেছে। মালাইকারির রঙ দেখলেই জিভে জল আসবে। আবেগের রান্না

খুলেছে বেশ।

শশধর খেতে খেতে বললে, 'বুড়ো, এ স্বপ্ন নয় তো ?'

শশধর ভাইকে বুড়ো বলেই ডাকত। সেই ডাক আবার ফিরে এসেছে এক যুগ পরে।

জলো বললে, 'আমার মতিচ্ছন্ন হয়েছিল তাই স্বপ্ন ভেঙে গিয়েছিল। তোমার মনে আছে দাদা, মা যখন বেঁচেছিলেন তখন আমাদের জীবনে অভাবের মধ্যেও কত সুখ ছিল ! কেমন করে যে আমরা এমন হয়ে গিয়েছিলাম ! মনে হয় ভূতে ধরেছিল।'

শশধর বললে, 'গ্রহ রে ভাই গ্রহ। আমার রাহুর দশা চলছিল। আজ মনে হয় শেষ হল !'

'জানো দাদা, আমার কি মনে হয় জানো, বাপমায়ের কথা ভুলে গেলে মানুষের এই অবস্থা হয়। আশীর্বাদ থেকে সরেছ কি মরেছ। দিনে রাতে একবারও অন্তত চোখ বুজিয়ে ভাবা চাই।'

'ধরেছিস ঠিক। পবিত্র না থাকলে পদে পদে ঠোক্কর।'

'শোনো দাদা, আমার পাপ-ব্যবসা আমি গুটিয়ে ফেলছি।'

'অ্যাঁ। সে কি। কি করবি তাহলে !'

'ঠিক করে ফেলেছি। কাল সকালেই আমি হাওয়া হয়ে যাচ্ছি।'

'কোথায় ?'

'একেবারে নতুন কোনও জায়গায়, নতুন করে শুরু করব। একেবারে নতুন জীবন।'

'সে তো এখানেই করা যায়।'

'না। এখানে যারা আমার সাঙ্গপাঙ্গ তারা আমাকে পেছন থেকে টেনে ধরবে। এগোতে দেবে না। এ গাছ আর এ মাটিতে বাড়বে না। শেকড়সুদ্ধ তুলে অন্য জমিতে বসাতে হবে।'

'জানতুম। আজকের এই রাত স্বপ্নের মতই মিলিয়ে যাবে। সময় কখনও ফিরে আসে না রে।' গোপা হাতে একটা হাতা ধরে বসেছিল। সে উদাস গলায় বললে, 'তুমি চলে যাবে ?'

'হ্যাঁ বউদি, আমার অতীত আমাকে বসন্তের মত দেগে দিয়েছে। আর এখানে থাকলে আমি ভাল হতে পারব না।'

'আমরা কি নিয়ে থাকবো ?'

'তোমাদের সংসার নিয়ে। তোমাদের সুখ, দুঃখ, ভালবাসা নিয়ে।'

'তোমাদের ? তুমি আমাদের কেউ নও ?'

'তা কেন ? আমি দূর থেকে তোমাদের কথা ভাবব।'

'অত সহজে তোমাকে আমরা ছাড়ব না।'

শশধর বললে, 'এই বাড়িটা আয় আমরা বেচে দি। বেচে দিয়ে নতুন জায়গায় নতুন ভাবে জীবন শুরু করি।'

'তোমার চাকরি আছে দাদা। এখনও অনেক বছর ঘানি ঘোরাতে হবে।'

'চাকরি আমার আর ভাল লাগছে না। একই জায়গায় আটকে আছি বহু বছর। এও এক ধরনের মৃত্যু। বরং আয় তোতে আমাতে ব্যবসায় নেমে পড়ি।'

'কি ব্যবসা ?'

'কাঠের লাইনটা আমি কিছু বুঝি। ফার্নিচারের ব্যবসা মন্দ হবে না।'

'ভালো জায়গা চাই।'

'চেষ্টা করলে জায়গার অভাব হবে না।'

জলো বউদির দিকে তাকিয়ে বললে, 'আমাদের আর কিছু লাগবে না। তুমি বসে যাও না বউদি। রাত হয়েছে। আজ যা রেঁধেছ না ! ফাসক্লাশ। মানুষের শেষ খাওয়া এই রকমই হওয়া উচিত।'

'তার মানে ?' গোপা ভুরু কুঁচকে তাকালো।

'কাল আমি এই সময়ে অনেক দূরে।'

‘ওসব চালাকি ছেড়ে দাও ঠাকুরপো। তুমি খেয়ে ওঠ, তোমাকে আমি চাবি দিয়ে রাখবো।’

‘দ্যাখো বউদি, আমার সঙ্গে সঙ্গে একটা অশুভ গ্রহ ঘুরছে। আমার ছায়ায় আলো নেই। শুধুই কালো। আমার জন্মের সঙ্গে সঙ্গে বাবা মারা গেলেন। আমার জন্যেই মা কাঁদতে কাঁদতে চলে গেলেন। আমার জন্যেই দাদা এমন ছন্নছাড়া। কিছুকাল আমি সরে যাই। তোমাদের সংসারে শান্তি আসুক।’

শশধর বললে, ‘পাগলামি করিস নি বুড়ো। অশুভ গ্রহ ঘুরছে আমার পেছন পেছন। মাঝে মাঝে আমার মাথায় পোকা নড়ে ওঠে। তখন আমি শয়তানের মতো হয়ে যাই। কাম, ক্রোধ, লোভ, লালসায় একেবারে চটকাচটকি হয়ে যায়। তুই যদি আমাকে শাসনে না রাখিস তোর বউদি ভেসে যাবে। তোর কৃপা চাইছি ভাই। তুই আমার অনেক বেশি পুরুষ।’

গোপা বললে, ‘আমার মাথার দিব্যি রইল। তুমি যদি চলে যাও, আমার মরা মুখ দেখবে। তুমি আমাকে চেন না। আমি সাংঘাতিক মেয়েমানুষ। আমি সব পারি।’

জলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল গোপার মুখের দিকে। আলো পড়ে ফর্সা কপাল চকচক করছে। সিঁদুরের গোল টিপ। টিকলো নাক। পাতলা ঠোঁট। পানের মতো চিবুক। এত দুঃখেও বউদির সুন্দর স্বাস্থ্য। স্পষ্ট কথা বলে। মনে কোনও প্যাঁচ নেই। নোংরামি নেই। এসব মেয়ে সংসার ভাঙে না ; কিন্তু ভাঙা সংসারেই এসে পড়ে কপাল গুণে।

শশধর বললে, ‘নে উঠে পড। ওসব বাজে চিন্তা ঝেড়ে ফ্যাল মাথা থেকে। তোর ভরসাতেই আমি আবার একবার চেষ্টা করব। এবার ভাঙলে ভেঙেই যাবে। শোন, দিন ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে। রাত নামার আগে আয় বাকি কাজ সেরে ফেলি। কাঁদতে কাঁদতে এসেছি, হাসতে হাসতে যাবার চেষ্টা করি।’

গোপা বললে, ‘তোমাদের ওসব ভালো ভালো কথার মারপ্যাঁচ আমি বুঝি না। আমাকে কথা দাও, তুমি যাবে না, তাহলে আমি খেতে বসব, নয় তো উপোস।’

জলো ধরাধরা গলায় বললে, ‘তুমি খেয়ে নাও বউদি।’

‘কথা দিচ্ছ?’

‘দিচ্ছি।’

শশধর বললে, ‘চল, তাহলে পান কিনে আনি। এরপর একখিলি পান না খেলে সর্বাঙ্গসুন্দর হবে না।’

গোপা বললে, ‘পান বাড়িতে আছে। আজ তোমরা রাস্তায় বেরোবে না। মোড়ের মাথায় অনেক শত্রু আছে।’

জ্ঞানেশ ভিজে তোয়ালে চেপে ধরল অমিতাভের ঘাড়ে, কপালে। অমিতাভ যেন মোমের পুতুল। এত কাছ থেকে একটা জ্যান্ত মানুষের মুখ এমনভাবে দেখার সুযোগ কোনওদিন আসেনি। বেশ ধাবাল মুখ। খাঁড়ার মত নাক। দেখলেই মনে হয় একটু নিষ্ঠুর প্রকৃতির। এই ধরনের মুখের মানুষ সাধারণত নিজেকে নিয়েই থাকতে ভালবাসে। অপরকে যতটুকু ধরা দেয় নিজের স্বার্থে। এদের মন থাকে অতলে। অন্যের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। ভাল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর হয়। সৈন্যবাহিনীতে থাকলে নামকরা জেনারেল হতে পারে। চরিত্র, আদর্শ, নীতি, দুর্নীতি নিয়ে বিশেষ মাথাব্যথা থাকে না। জোড়া ভুরু। ভিজে তোয়ালে জোরে চেপে ধরল অমিতাভের মুখে। দম বন্ধ হয়ে যায় যাক। এই রকম একজন অহঙ্কারী, অপদার্থ, অন্তঃসারশূন্য মানুষকে মেরে ফেললে পৃথিবীর কি এমন ক্ষতি হবে?

অমিতাভ নড়েচড়ে উঠল। জ্ঞানেশের ভীষণ ইচ্ছে করছে, মারে এক লাথি। যে দেশের নব্বই ভাগ মানুষ আধমরা না খেয়ে, প্রায় খাটালে বসবাস, সে দেশে এই ভুঁড়ো মাতাল আকাশের আটতলায় কার্পেটে বেহুঁস। নিজের স্ত্রী আর ঋষিতুল্য পিতার স্নেহের সম্পর্কে

যৌনতা ঢোকাতে লজ্জা পায় না। নীচ। ইতর।

তোয়ালেটা মুখ থেকে সরিয়ে নিল জ্ঞানেশ। অমিতাভর ফর্সা মুখ জবা ফুলের মতো টকটকে লাল হয়ে উঠেছে। ডান গালে ধারাল একটা আঁচড়ের দাগ। ওই দাগের অনেক ব্যাখ্যাই করা যায়।

অমিতাভ ধীরে ধীরে উঠে বসল। মাথাটা একবার ঝাঁকিয়ে নিয়ে বললে, 'অল রাইট।'

জ্ঞানেশ বললে, 'চলুন।'

'কোথায় ?'

'নার্সিংহোমে।'

'নাম বলে যান। কাল সকালে যাব। আমি আমার নিয়মে চলি।'

জ্ঞানেশ তড়াক করে উঠে পড়ল। মনে মনে বললে,'ব্লাডিবাগার । সভ্য শয়তান।'

'আপনার স্ত্রী মারা যাক সেইটাই আপনি চান ?'

'প্রশ্ন করবেন না। বাজে বকার ধৈর্য আমার নেই। ঠিকানাটা রেখে চলে যান। যাওয়া না যাওয়া আমার মর্জি। নার্সিংহোমে কে নিয়ে গেছে ?'

'আমি।'

'দেন ইট ইজ ইওর হেডেক। আমার কোম্পানির ভাল নার্সিংহোম আছে। আমি সেখানে দিতে পারতুম। আপনাকে কে নাক গলাতে বলেছিল ?'

জ্ঞানেশ আর কথা বাড়াতে চায় না। এবার তার ঘুসি চালাতে ইচ্ছে করছে। একটা কাগজে খসখস করে ঠিকানা লিখে সামনে ছুঁড়ে দিল।

লিফ্‌টে উঠে নামতে নামতে মনে হল, আবার তাকে ফিরে যেতে হবে এতটা পথ। সেখান থেকে ফিরতে হবে পাড়ায়। হয়তো মাস্টারমশাইকেই টেনে আনতে হবে। সারা রাত এই চলবে। সেই সকাল থেকে শুরু হয়েছে। মানুষ যত সভ্য আর শিক্ষিত হচ্ছে ততই অমানুষ হয়ে যাচ্ছে।

জ্ঞানেশ স্টার্ট দিল গাড়িতে। মিটার দেখল। পেট্রল নিতে হবে। সারাদিনের ধকলে চোখ জ্বালা করছে। রগের দুটো পাশ টিপটিপ করছে। জ্ঞানেশ পার্বতীর কথা ভুলেই গিয়েছিল। অন্ধকারের আড়াল থেকে সে হিস্ শব্দ করতেই জ্ঞানেশ চমকে গাড়ি থামাল। পার্বতী নিঃশব্দে উঠে বসল।

গাড়ি ছেড়ে দিয়ে জ্ঞানেশ বললে, 'আর পারছি না গো। এবার মনে হচ্ছে শুয়ে পড়ি।'

জ্ঞানেশের গা ঘেঁষে এল পার্বতী, 'তুমি শোবে ?'

'কে গাড়ি চালাবে ?'

'একটু আরাম করে তারপর চালাও। সায়েব, আগে শরীর তারপর কাজ।'

জ্ঞানেশের ডান হাত স্টিয়ারিংএ। বাঁ হাত রাখল পার্বতীর কাঁধে। পার্বতী আরও একটু সরে এল। তার ভেতরটা কেমন করছে। জালে পড়া মাছের মতন। ছটফট। জ্ঞানেশের হঠাৎ মনে হল, সে এ কি করছে! জানা নেই শোনা নেই। এক অপরিচিতা। খারাপও লাগছে না। উৎসাহ আসছে। ক্লান্তি কেটে যাচ্ছে। অদ্ভুত ওষুধ। ঝনঝনে আকাশ। টাটকা, গরম গরম তারা। অমলিন এক নারী। শিশুর শ্বাসের মত রাতের বাতাস।

তা হোক। তবু পাপ।

হাত উঠিয়ে নিল জ্ঞানেশ। সামনেই ফিলিং স্টেশান। দম ফুরিয়ে আসছে গাড়ির। ঢাল বেয়ে গাড়ি উঠে গেল ওপর দিকে।

কৃষ্ণ বুঁদ হয়ে বসে আছে তার ইষ্টদেবতার সামনে। বেশ মৌতাত হয়েছে। চোখের সামনে নানা বর্ণের আলোর খেলা চলেছে। শিবঠাকুরের মাথায় সোনালী জটা উড়ছে। বিশাল পুরুষ

সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। এক হাতে ত্রিশূল ! অন্য হাতে ডম্বরু। বুকে দুলছে জীবন্ত সাপ। কৃষ্ণ হাত বাড়িয়ে যতবার পা ছুঁতে চাইছে, ততবার দুটো পা সরে যাচ্ছে নেচে নেচে।

'কেন ছলনা করছ প্রভু ?' আর কবে ধরা দেবে !'

কুমু খিলখিল করে হেসেই চলেছে। হাসি আর থামে না। হাসছে আর বলছে, 'খেলা খুব জমেছে প্রভু। খুব জমেছে। কে থাকে। কে যায়। কে যায়। কে থাকে।'

দেয়ালে ঠেস দিয়ে সামনে পা ছড়িয়ে বসে আছে। চুল এলো। গায়ের জামা খুলে টান মেরে ফেলে দিয়েছে দূরে।

কৃষ্ণ ভাবের ঘোরে বললে, 'খেলা যতই জমুক শেষপর্যন্ত কেউ থাকবে না।'

কুমু খিলখিল করে হাসছে। প্রায় অন্ধকার ঘর। একটা ধূপ জ্বলছে। ছোট্ট একটি আলোর বিন্দু। দেয়ালে বড়বড় ক্যানভাস। অস্পষ্ট নারী মূর্তি নানা ভঙ্গী। কৃষ্ণর হাতে রুদ্রাক্ষের মালা। মাঝে মাঝে কাঁকরি কাটা শব্দ উঠছে রুদ্রাক্ষে রুদ্রাক্ষে ঘষা লেগে। কৃষ্ণ বুঁদ হয়ে বসে আছে। দেহ এ জগতে থাকলেও মন ভাসছে অন্য জগতে।

দেবী হাত বাড়িয়ে আলো নেবাল। পাশের বিছানা থেকে দুর্গা বললে, 'তোতাকে কেন রেখে এলি দিদি ?'

'তোতা নিজেই রয়ে গেল। এ বাড়ির চেয়ে ওই বাড়িটাই ওর বেশি ভাল লাগে।'

'দুস, আমার কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগছে।'

'আমারও। ঘুম আসছে না।'

দুর্গা হাই তুলল। দেবী অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে রইল। একটা জোনাকি ঢুকে পড়েছে ঘরে। আলোর ফুলকি ভেসে বেড়াচ্ছে। এ আলো যেন সাগর থেকে স্নান করে ওঠা আলো। সেই বিশ্বাস দেবীর আজও গেল না। জোনাকি হল আত্মা। তা না হলে এমন সুন্দর নীলচে আলো আসে কোথা থেকে ! যে আগুন পোড়ায় না। জলে পড়লে নেবে না।

দেবী চিত থেকে পাশ ফিরল। শিব বলেছেন, তোমরা এই বাড়িতে চলে এস। বাড়িটা তোমাদের নামে লিখে দিয়ে যাব। কোন অধিকারে, সেখানে গিয়ে থাকব ! কেনই বা নোব ! আমি যদি তাঁর মেয়ে হতুম ! বিধবা মেয়ে। প্রাণ দিয়ে বাবার সেবা কবতুম। যা হলে ভাল হয় এ জগতে তা কোনওদিনই হতে চায় না। যাকে সবচেয়ে ভালবাসতুম, সেই স্বামী চলে গেলেন, একেবারে হঠাৎ। শেষ কথাটিও বলা হল না। কত বউ আছে যারা স্বামীর মর্মই বোঝে না। পাশাপাশি থাকে এই মাত্র। ঠোকাঠুকির সময় চিৎকার করে, ,আমি তোমার বউ।

বাবার কথা মনে পড়ছে দেবীর। একটা দৃশ্য বারেবারে ফিরে আসে। পুরীর সমুদ্রে দু'জনে পাশাপাশি। ঢেউয়ের পরে ঢেউ এসে পায়ের কাছে লুটিয়ে লুটিয়ে পড়ছে। বাতাসে দেবীর ফ্রক উড়ছে। উড়ছে বাবার ধুতির কোঁচা। তিনি থেকে থেকে বলছেন, দেখ মা দেখ, বিরাট, স্বরাট, বিরাট, স্বরাট। আমরা কি ক্ষুদ্র !

দেবীর হাই উঠল। এইবার হয়তো মৃত্যু হবে কিছুক্ষণের জন্য। একা একটা জীবন বয়ে বেড়ান কি সাংঘাতিক কঠিন কাজ ! তার আজকাল প্রায়ই মনে হয়—নাটক শেষ হয়ে গেছে। সহচরিত্ররা সবাই চলে গেছে। দর্শকশূন্য আঁধার রঙমহল। সে একা দাঁড়িয়ে আছে মঞ্চে সাজপোশাক পরে। আশাই মানুষকে টেনে নিয়ে যায়। তার জীবনে আর কোনও আশা নেই। সেই গানটা বারে বারে মনে পড়ে :

যে লতাটি হায় শুকায়েছে মূল।
কুঁড়ি ধরে শুধু নাহি ফোটে ফুল ॥

কিশোর ঘড়ি দেখছে, আর পায়চারি করছে। জ্ঞানেশ গেছে তো গেছেই। তনুর 'ড্রিপ'

চলেছে। সিস্টার মাঝে মাঝে এসে খবর দিয়ে যাচ্ছে পেশেণ্টের। মা আর শিশু দু'জনকেই কি বাঁচানো যাবে ? একটা একস্‌রে নিয়ে দেখতে হবে, কতটা 'ডিসপ্লেসড' হয়েছে। কোন পজিশানে, কিভাবে আছে ! ভগবানের 'মেকানিজম'। অনেক 'গার্ড'। অনেক 'চেকভালভ্'। সহজে অঘটন ঘটার কথা নয়। তবু যদি ঘটে যায়। নাঃ আর তো অপেক্ষা করা যায় না।

গাড়ির হেডলাইট এগিয়ে আসছে। কিশোরের টেনসান কিছুটা কমে এল। মনে হয় জ্ঞানেশই আসছে।

জ্ঞানেশ ঘরে এসে ঢুকল।

'কি রে তুই একা ?' কিশোর অবাক।

'স্কাউনড্রেল। একেবারে পারফেক্‌ট শয়তান। মাল খেয়ে আউট হয়ে পড়ে আছে। জলফল থাবড়ে যদিও বা ধাতে আনলুম, কিছুতেই এল না। বড-চাকরির গরম। স্ত্রীর সঙ্গে রিলেশানও তেমন ভাল নয় মনে হল।'

'কি হবে ! সামওয়ান শুড বি হিয়ার। তা না হলে কে রিস্ক নেবে। যদি অ্যাবরশান করতে হয় ?'

'বৃদ্ধ শ্বশুরমশাইকে তাহলে আনতে হয়। এ ছাড়া আর কোনও উপায় নেই।'



॥ সাতাশ ॥

দু' হাঁটুর ওপর কপাল রেখে অমিতাভ বেশ নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে রইল কিছুক্ষণ। কি হবে ছটফট করে ! কারুর সময় চলে যায়। সময় কি আসলে চলে ! একজন মানুষের আসা-যাওয়ার হিসেবেই সময়ের চল আর অচল। সতেরই ফাল্গুন। তারপর থেকে এক বছর, দু' বছর, পাঁচ বছর। তনু তার জীবনে পাঁচ বছরের পুরনো। পৃথিবীতে আসার হিসেবে কত হবে ! পঁচিশ বছরের পুরনো। ইংরেজীতে তো ওইরকমই বলবে, টোয়েণ্টি ফাইভ ইয়ার্স ওলড। ঘোড়সওয়ার। জীবনের ঘোড়ায় চেপে টগবগাও। এ এমন ঘোড়া থামাবার উপায় নেই। পেছন থেকে অন্য ঘোড়া মেরে বেরিয়ে যাবে। হর্স রেস।

· গত শীতে রেসের মাঠে গিয়েছিল এক শনিবার। দৌড়চ্ছে। ডায়না, রস, সিলভার অ্যারো, ব্যাট্‌লশিপ পোটেমকিন, নরম্যান স্যাণ্ডি, বিলি বাক্‌স্টার, টমটম। দৌড়, দৌড়।

স্টার্ট। বাঁশী বাজিয়ে দিলেন তিনি। সেই তিনি। তিনি কে ? হু ইজ হি ? ক্যাপিট্যাল হি। আমি কে ? কে আমি ? পিতা শিবপদ। মাতা সুধারানী।

পিতা অমিতাভ। মাতা তনুশ্রী। কে আসছে ?

অমিতাভ মুখ তুলে তাকাল। সর্বত্র তনু। পর্দায়, ফুলদানির ফুলে, বিছানার চাদরে, দেয়ালের ছবিতে, ফ্রিজের হাতলে ঝোলা ন্যাপকিনে। ড্রেসিং টেবিলের চিরুনিতে। সর্বত্র। এক ইঞ্চি স্থানও খালি নেই।

হাতে ভর রেখে শরীরটাকে কার্পেট থেকে টেনে তুলল অমিতাভ। দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ। অদৃশ্য কোনও ফিল্‌ড মার্শাল যেন হেঁকেছেন—অ্যা টে ন শা ন। কেউ নেই। মিষ্টির দোকানের ঘিনঘিনে মাছির মতো, ঘিনঘিনে রাত ছাড়া চারপাশে কেউ নেই। কেন নেই ?

কেন নেই ?

ড্রেসিং টেবিলের সামনের ছোট টুলে অমিতাভ বসে পড়ল । সে যেন এই মাত্র একটি সন্তান লাভ করেছে । একটি প্রশ্ন—কেন নেই ? কেউ নেই কেন তার পাশে ?

সে চায় না, তাই নেই ।

আয়নায় নিজের মুখ । নিজের মুখের দিকে তাকিয়ে আছে অমিতাভ । কার মুখের সঙ্গে বেশ যেন মিল আছে । খুব চেনা মুখ । কে তুমি ?

মনে পড়েছে, পিতার যৌবনের মুখের সঙ্গে অদ্ভুত সাদৃশ্য । এই রকমই হয় বুঝি !

ধীরে ধীরে পিতা এইভাবে পুত্রে এসে নষ্ট হয় । বংশাবলির ধারায় ক্রমে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় । ছিঃ । আই হেট ইউ । তোমাকে আমি ঘৃণা করি । তুমি আমার স্বপ্ন নও । দুঃস্বপ্ন । তুমি ক্রীতদাস । শৃঙ্খলিত ভগবান নও । শৃঙ্খলিত শয়তান । বাণ্ডল অফ অ্যাপেটাইটস । অর্থ, সম্মান, লোভ, লালসা, জৈব তৃপ্তি । হাজারটা শুঁড় লকলক করছে চারপাশে । সাকারস ।

রামকৃষ্ণ মিশনে তুমি পড়েছিলে । দু'বেলা প্রার্থনা করতে । ওই তো দেয়ালে ছবি । সব অভিনয় । বাইরের মুখোশ । এক ইঞ্চিও ওপরে উঠতে পার নি । চাকায় ঘুরছ ক্রীতদাসের মত । নিজের মুক্তি নিজের হাতে । কেউ তোমাকে উদ্ধার করবে না ।

অমিতাভ তাকিয়ে আছে আয়নায় নিজেব বিশুদ্ধ প্রতিফলনের দিকে । যত পাপ এই কায়ায । ছায়ায় কোনও অপবিত্রতা নেই । মিশনে পড়ার সময় সাধু বলেছিলেন, মাঝে মাঝে এইভাবে তাকিযে থাকবে অপলকে নিজের চোখের দিকে । দেখবে তুমি ফিরে আসছ নিজের কাছে । যত ছোট হবে, তত বড় হবে । যত আপন হবে, তত পথ খুঁজে পাবে । নিজের হাত নিজে ধবো ।

নিজেব উপনয়নের চেহারা ফুটে উঠছে আযনায । মুণ্ডিত মস্তক । গেরুয়া বসন । দণ্ডধারী সন্ন্যাসী । অমিতাভ উঠে পড়ল । পিছলেছি তবে এখনও খাদে পড়িনি । এ জীবন তার নয় । যজন, যাজন, অধ্যাপন । পিতামাতার আশীর্বাদ । এই গণ্ডীর বাইরে বেরলেই সীতা হরণ ।

একটানে খুলে ফেলল গলার টাই । কে বলেছিল এই ফাঁস পরতে । ধরাচূড়া খুলতে খুলতে তাব মনে পড়ল, উইলহেলম রাইখের সেই বিখ্যাত উক্তি :

For, many thousands of time, I have seen you naked, physically and psychically, without a mask, without a party card, without your 'popularity', naked like a new-born, naked like a Field Marshal in his underpants.

লিটল ম্যান, কমন ম্যান ॥ রাইখের গলায় অমিতাভ নিজেকে সম্বোধন করল । তুমি নগ্ন, দেহে, মনে । তোমাব মুখোশ ওরা টেনে খুলে ফেলবে । তোমার আবার রাজনীতি কি ? জনপ্রিয়তা ! ফুস ? লিটল ম্যান ! নবজাতকের মতই তুমি নগ্ন ! ওই যে ফিল্ড মারশাল দাঁড়িয়ে আছে লেংটি পরে ॥

You are heir to a dreadful past.
Your heritage is a burning diamond in your hand.

পেছনে তাকাও । মানব সভ্যতার ভয়ংকর অতীত তোমাকে অনুসরণ করছে । তোমার উত্তরাধিকার ! হাতের তালুতে জ্বলন্ত একটি হীরকখণ্ড ॥

ধীরে ধীরে অমিতাভর নিষ্ক্রিয়তা, উদাসীনতা কেটে আসছে । only you yourself can be your liberator. তোমার মুক্তি তোমারই হাতে । ঘড়ির শব্দে অমিতাভ চমকে উঠল । বোকার মতো, জানোয়ারের মতো কি ভাবছে আবোল-তাবোল । এখন তাকে ছুটতে হবে নার্সিংহোমে ।

জ্ঞানেশের রেখে যাওয়া চিরকুটটা তুলে নিল হাতে । অ্যাপোলো নার্সিংহোম । নামটা

শোনা। পাজামা পাঞ্জাবি পরে অমিতাভ নেমে এল নিচে। চারপাশে উঁচু উঁচু বাড়ি। জানলায় জানলায় নরম আলো। মিহি মিহি পর্দা।

চিৎকার করে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, লিটলম্যান, তোমরা কি সুখী ? সুখে আছ তোমরা ? দুপাশে, দুই বাহু প্রসারিত করে পড়ে আছে মসৃণ, নির্জন, পিচের রাস্তা। নেচে নেচে একটা কুকুর চলেছে। দূর থেকে ভেসে আসা কোনও গন্ধের টানে। বহু দূরে কোথাও রামনাম হচ্ছে। ভেসে আসছে সুর, রামা হো। রামা হো।

যে উৎসাহ নিয়ে অমিতাভ রাস্তায় নেমে এসেছিল, সে উৎসাহ আর নেই। শহর শুয়ে পড়েছে। এ-পাশ, ও-পাশ দু'পাশই ফাঁকা। একটাও গাড়িঘোড়া নেই। সামনের ধোবীখানায় তোলা উনুনের লাল আঁচ। স্বাস্থ্যবান ধোবী ধমাস ধমাস করে ইস্ত্রি করছে। কাপড়ের ডাঁই একপাশে। ফুটপাথে একটা খাটিয়া। খাটিয়ায় একটা বাচ্চা বেহুঁস ঘুমে।

কি করা যায় ! এই রাতে এতটা পথ কি ভাবে যাওয়া যায়। শহর তো আর আগের মতো নিরাপদ নেই। আইনের প্রভুরা ক্লান্ত। আততায়ীরা সশস্ত্র। খাটিয়ায় শুয়ে থাকা বাচ্চাটার দিকে তাকিয়ে অমিতাভের ভীষণ হিংসে হল। কি সুন্দর একতারায় বাঁধা জীবন।

সেই সন্ন্যাসী বলেছিলেন, ভেতরের শিশুটাকে সাবধানে আগলে রেখো। বড় হতে দিও না। বড়দের জগতে বড় অশান্তি।

অমিতাভ হাঁটা ধরল। কিছু দূর এসে তার বুদ্ধি খেলে গেল। ধোবীখানার দেয়ালে ঠেসানো একটা সাইকেল তার চোখে পড়েছে। সাইকেলটা ধার চাইলে দেবে না ! নিশ্চয় দেবে। বড়মানুষরা-স্বার্থপর, আত্মপর। যারা কয়েক ধাপ নিচে আছে, তাদের মধ্যে মানবতা এখনও লোপাট হয়ে যায় নি।

অমিতাভ ফিরে এল।

ঘর্মাক্ত মহিলা শাড়ির আঁচলে মুখ মুছতে মুছতে বললে, 'কিছু বলবেন বাবু ?'

'মাঈ, আমি ওই সামনের ফ্ল্যাটে থাকি। খুব বিপদে পড়েছি।'

'কি বিপদ বাবু ?'

'অফিস থেকে ফিরে এসে শুনলুম আমার বউকে নার্সিংহোমে নিয়ে গেছে। আমাকে এখুনি সেখানে যেতে হবে। আমার গাড়ি নেই। এখন ট্যাক্সিও পাব না। তোমাদের এই সাইকেলটা কিছুক্ষণের জন্যে আমাকে দেবে! আমি টাকা জমা রাখছি।'

ঝকঝকে দাঁত বের করে মহিলা হাসল।

'সাইকেল আপনি নিয়ে যান বাবু। টাকা রাখতে হবে না। কিন্তু এত রাতে সাইকেল চালিয়ে একা যাবেন !'

'মাঈ, আমাকে যেতেই হবে। কোনও উপায় নেই।'

'সাবধানে যাবেন, বাবু। জোরে চালাবেন না।'

অমিতাভ মহিলার মুখের দিকে অপলকে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ। গোল মুখ। টেপা নাক। একটা নাকছাবি। উনুনের গনগনে লাল আগুন। লোহার ইস্ত্রির পোড়া পোড়া গন্ধ।

অমিতাভ সাইকেলে চেপে বসল। এসের মত রাস্তা তিনটে মোচড় মেরে সোজা হয়ে গেছে। সাইকেল চালাতে চালাতে অমিতাভ-র মনে হল, তার ছাত্রজীবন ফিরে এসেছে। একজিকিউটিভ ইনজিনিয়ারের মূল্যবান তখমা খুলে পড়ে গেছে। সাজানো ফ্ল্যাট, অফিসের ঘোরা চেয়ার, মাসিক কয়েক হাজার টাকার মিথ্যা নিরাপত্তা, মূর্খের অহঙ্কার সব পড়ে আছে দূরে। মধ্যরাতের রাজপথ, ভিজে ভিজে বাতাস, ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ, কেমন যেন একটা মুক্তির স্বাদ। আড়ম্বরহীন সরল জীবনই শান্তির জীবন। জীবনকে কর বাউলের একতারা।

অমিতাভ ভাবছে, আর আপন মনে গাড়ি চালাচ্ছে। পেছন থেকে আলোর একটা রেখা ঠিকরে এল। গাড়ি আসছে। অমিতাভ মাঝখান থেকে পাশে সরে গেল। ইঞ্জিনের শব্দ।

গাড়ির ভেতরের হইহল্লার শব্দ কানে আসছে। গাড়িটা তীব্র বেগে আসছে। ফাঁকা রাস্তা পেয়েছে। অমিতাভের বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। ভয় ভয় করছে। একেবারে একা। নিরস্ত্র।

গাড়িটা ঝড়ের বেগে তার একচুল তফাত দিয়ে বাতাসের ঝাপটা মেরে বেরিয়ে গেল। ভেতরে যারা ছিল তারা নরখাদকের মতো হই হই করে উঠল। অমিতাভ টাল খেয়ে আরও ধারে চলে গেল। প্রায় রাস্তার বাইরে। বহুকাল সাইকেল চালায় নি। আর একটু হলে ছিটকে পড়ে যাচ্ছিল। বুকটা ধক করে উঠল। জিভে নোনতা স্বাদ। মরে যেতে কি বিশ্রী লাগে!

বেশ কিছু দূরে গাড়িটা থেমে পড়েছে। অদ্ভুত চেহারার তিন চারটে ছেলে নেমে পড়েছে। অমিতাভের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বললে, আর এগিও না। বিপদে পড়বে। বাঁ পাশে একটা অনিশ্চিত সরু পথ। অমিতাভ ঢুকে পড়ল। কানে এল ইঞ্জিন স্টার্ট করার শব্দ। গাড়িটা ঘুরে আসছে। প্রাণপণ শক্তিতে অমিতাভ প্যাডেল ঠেলতে লাগল। কিছুই হয়তো হবে না। তবু ভয়। ফাঁকা রাস্তার মধ্যরাতের সঙ্গে পূর্ব পরিচয় নেই তাই হয়তো ভয়।

রাস্তাটা ক্রমশ চেপে আসছে চারপাশ থেকে। অমিতাভকে কোথায় নিয়ে যাবে কে জানে! কিন্তু পেছনে ফেরার উপায় নেই।

জলো বললে, 'নাও, তোমরা এবার শুয়ে পড়ো। তোমাদের ঘরে একটা ধূপ জ্বেলে দিয়ে এসেছি।'

গোপা বললে, 'আর তুমি কি কববে?'

'আমি কিছুক্ষণ এই ফাঁকায় বসি।'

'কেন?'

'আমার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে, বউদি। অনেক হিসেবনিকেশ।'

'বেশি আঁতলামো কোরো না তো।'

গোপা শশধরের কানে কানে ফিসফিস করে বললে, 'হাবভাব কথাবার্তা সুবিধের মনে হচ্ছে না। চোখে চোখে রাখতে হবে। মনে আছে, এর আগে একবার আত্মহত্যার চেষ্টা করেছিল। তুমি ওকে নিযে ঘরে চলে যাও। আমি বাইরে থেকে শেকল তুলে দি। রাতের মতো নিরাপদ।'

শশধর হাই তুলল, 'তোমাব কি মনে হয় আমাদের সময় ফিরবে না। গ্রহ কি কাটেনি!'

'অতই সোজা? তুমি কি ভাবো এর পর রেলগাড়ির মতো সোজা লাইনে সব চলবে! কিছু মানুষ ভুগতে আসে। কিছু মানুষ আসে ভোগ করতে। কেউ আসে দিতে। কেউ আসে নিতে। রাশ আলগা দিও না। টেনে রাখো। জীবন এক শত্রু। সুযোগ পেলেই মারবে ঝাপটা।'

শশধব অবাক হয়ে গোপার দিকে তাকিয়ে রইল। মেয়েদের কত রকম রূপ আছে! এই গোপা, মনে হত ভোঁতা, মুখরা, অবুঝ মেয়ে। তা তো নয়। সেটা এক রূপ। আজ সম্পূর্ণ অন্য রূপ। ঠিকই বলে, জ্ঞান কারুর একচেটিয়া নয়।

শশধব বললে, 'ঠিক আছে। তুমি ধরে নিয়ে এসো। তোমার জোর খাটবে।'

গোপা বাইরে এল। এ কি! কোথায় গেল ঠাকুরপো? গোপার বুকটা ছাঁত করে উঠল। গলা চড়িয়ে ডাকল, 'ঠাকুরপো।'

একবাব, দুবার, তিনবার। শশধর বেরিয়ে এল ঘর থেকে, 'কি হল?'

'এই তো ছিল এখানে। গেল কোথায়?' গোপা প্রায় কেঁদে ফেলেছে।

শশধর গোপার কাঁধে আলতো হাত রেখে বললে, 'আগেই খারাপটা ভেবে নিচ্ছ কেন? মানুষের মন কি জিনিস দেখেছ! একেই বলে, রজ্জুতে সর্পভ্রম।'

গোপা শশধরের বুকে মাথা রেখে অবরুদ্ধ গলায় বললে, 'তুমি জান না, ও সব পারে। এই

যে গেল আর হয়তো ফিরবে না।'

'তুমি ভেব না। আমি দেখছি।'

শশধর চটি গলিয়ে রাস্তায় বেরিয়ে এল। গোপা জলোকে কি অসম্ভব ভালবাসে। দুজনেই প্রায় সমবয়সী। স্বামী-স্ত্রী হলে এমন ভালবাসা সম্ভব হত না। দেহের দাবি ঢুকলেই সব ছিঁড়েখুঁড়ে যায়। শশধর মোড়ের পানবিড়ির দোকানের দিকে এগোচ্ছে। এখনও খোলা আছে। ভোলা অনেক রাত অবধি দুলে দুলে বিড়ি বাঁধে আর গুনগুন করে শ্যামাসংগীত গায়। জলো যেতে পারে কোথায়! পানের কথা হচ্ছিল, নিশ্চয় পান কিনতে গেছে। আর একটা বাঁক ঘুরলেই ভোলার দোকান।

শিবপদর বাড়ির সামনে জ্ঞানেশ দমাস করে গাড়ির দরজা বন্ধ করল, ইচ্ছে করে। যাতে জোর শব্দ হয়। ভীষণ বিরক্ত লাগছে এইবার। এমন জালে জড়িয়েছে, বেরবার পথ নেই। যত ছাড়াতে চাইছে তত জড়িয়ে যাচ্ছে।

শিবের ঘরে আলো জ্বলছে। জ্ঞানেশ খড়াং করে লোহার গেট খুলল। দরজার সামনে এসে জোর গলায় ডাকল, 'মাস্টারমশাই!'

ভক্তিশ্রদ্ধা এবার উবে আসছে।

শিব ইজিচেয়ারে ঘুমিয়ে পড়েছিল। জ্ঞানেশের ডাকে ধড়মড় করে উঠে বসল।

'কে, জ্ঞানেশ! খবর কি?'

'দরজা খুলুন, মাস্টারমশাই।'

জ্ঞানেশ দমকা বাতাসের মতো ঘরে ঢুকল। কোনও ভূমিকা না করে বললে, 'নিন চলুন। আর দেরি না। তনু দেবীকে নার্সিংহোমে রেখে এসেছি। একা পড়ে আছে। ক্রিটিক্যাল অবস্থা।'

'সে কি? সে কি বাবা!'

শিবের শরীর থরথর করে কাঁপছে, 'অমিতাভ কোথায়? অমিতাভ নেই?'

'অমিতাভ?'

জ্ঞানেশ হাসল। বলতে ইচ্ছে করছিল, আপনার বড় ছেলে বোতল বগলে গড়াগড়ি যাচ্ছে। নিজেকে সংযত করল কষ্টে। শান্ত গলায় বললে, 'কথা বলার সময় নেই। চলুন



॥ আটাশ ॥

গলির পর গলি, আবার গলি। পথ অমিতাভকে ক্রমশ গভীর থেকে গভীরে টেনে নিয়ে চলেছে। একটা শহরের এত রহস্য! জানা তো ছিল না। দু পাশের বাড়ির একতলার ঘরে ঘরে পনপন করে পাখা ঘুরছে। যে সব জানালায় পর্দা ঝুলছে, বাতাসে কাঁপছে। মানুষের পলকা সঙ্কল্পের মত। কোনও কোনও বাড়িতে রাত-জাগা শিশুর ওয়া ওয়া কান্না। প্রেতের রাত। একটু ভয় ভয় করছে অমিতাভর। এক ধরনের ভূত আছে, যারা অকারণে মানুষকে ঘুরিয়ে মারে। ছেলেবেলার শোনা গল্প। ভুলভুলাইয়া ভূত। সেই ভূতেই ধরল নাকি! পেট আর বুক

দুটোই জ্বলছে। অম্বল হয়ে গেছে।

আর একটা বাঁক ঘুরতেই অমিতাভ ফাঁকা মত একটা জায়গায় চলে এল। মাঠের মাঝখানে অন্ধকাব একটা প্যাণ্ডেল। পতাকা, শোলার ফুল, আম পাতা, কাগজের শিকলি ঝুলছে। ভেতরে দুটো আগুনের ফোঁটা বড় হচ্ছে, ছোট হচ্ছে। সিগারেট অথবা বিড়ির আগুন।

অমিতাভব মনে হল. ওবা দুজন, আমি একজন। মনে হতেই জোরে জোরে প্যাডেল ঘোবাতে লাগল। পথের পাশে ল্যাম্পপোস্টের তলায় একটা পাগলী বসে আছে উবু হয়ে। একটা মিষ্টির দোকান। এত রাতেও ভিয়েন হচ্ছে। গরম রসের গন্ধ আসছে নাকে। কড়ায় ভাসছে টাপুর টুপুব বসগোল্লা।

ক্লান্ত অমিতাভ বড রাস্তায় এসে উঠল। সামনেই একটা নির্জন পার্ক। বড় বড় গাছে হিস হিস শব্দ হচ্ছে। ভেতরে একটা জলাশয। রাতের তাবা গুড়ো গুঁডো হযে ছডিয়ে আছে জলে। ছল ছল কবছে। অমিতাভ চলেছে। সাইকেলেব বেল কাঁপুনিতে ঠিং ঠিন শব্দ কবছে। এই সামান্য শব্দই অমিতাভব এখন একমাত্র সঙ্গী। অমিতাভব হঠাৎ মনে হল, পাপের পথ, অহঙ্কারের পথ বড় নির্জন। সে ভুল করছে। এ জীবন সে ভালবাসে না. সেই কারণেই এই এত লোক-দেখানো বাডাবাডি। এ-জীবন তাব নয়। হতে পাবে না তার। স্কুলমাস্টারের সংস্কার তাব বক্তে ' মা পাটেব কাপড পবে ঠাকুবঘবে বসে থাকতেন ঘণ্টা আডাই। বাবা স্নানের পর সূর্য নমস্কার করছেন। প্রশস্ত গৌববর্ণ পিঠে ধবধবে সাদা পইতে। পবিত্র, পবিত্র। মেরিব পেঁয়াজ খাওযা ঠোঁটে কি অমৃতেব সন্ধানে সে চুমুক দিয়েছিল '

ফুল ! ইডিযেট !

পিতা হল পর্বত। সেই পর্বতেব ছাযা থেকে মূর্খেব মত সবে যেতেই এই দুর্যোগ। বিবেকের কাছে হার হযেছে। দংশন, দংশনে জ্বলছে ভেতব। দেবালয উচ্ছিষ্ট হয়েছে। অপবিত্র হযেছে। প্রাযশ্চিত্ত চাই। বহু দূরে সমস্বরে গোটাকতক কুকুর হাহাকাব করে উঠল।

চাবজনের কাঁধে চেপে মৃতদেহ ছুটছে. বামনাম সত হ্যায। বামনাম সত হ্যায। সবার পেছনে একটি শিশু চলেছে নেচে নেচে। আহা, বেচাবা আর পারছে না। দলের কেউই দেখছে না, সে যে পেছিয়ে পডছে। শিশুটিব বাবাই হযতো মবেছে। কে জানে ' কার যে কখন সন্ধ্যে হয !

তনুর জন্যে অমিতাভর বুকটা মোচড দিযে উঠল। হে ঈশ্বব ! এ যাত্রা ভাল করে দাও। তনুকে এরপব সে প্রাণ দিযে ভালবাসবে। স্নেহ দিয়ে পিতাকে অন্তত একশো বছর ধরে রাখবে। জ্যাঠা কৃষ্ণুর কি ভালবাসা ' শুধু ঈশ্বব কেন, মানুষকেও ঠিক ঠিক ভালবাসতে পারলে সিদ্ধ হওয়া যায। স্বৰূপানন্দ হওয়া যায। কই কৃষ্ণুকে তো কোনও সময় দুঃখী মনে হয় না। বাজার মত চালচলন। মুখে অপূর্ব জ্যোতি। যত বযেস বাডছে তত রূপ খুলছে। অন্ধকারে বসে থাকলে মনে হয আলোকময।

এক-আধটা ক্লান্ত মটব গাডি অমিতাভকে অতিক্রম কবে যাচ্ছে। একটা মাতাল টলতে টলতে সামনে এগোচ্ছে আবার টাল খেয়ে ঘুরে চলে আসছে। এইভাবে সারা রাত নেশার বৃত্তে ঘুরবে না কি ! কি শাস্তি ! বাঁ ধাবের ফুটপাথে বাঁ পায়েব পাতা ঠেকিয়ে অমিতাভ একটু জিরিয়ে নিল। ভীষণ সিগারেটের ইচ্ছে হচ্ছে। সব ফেলে এসেছে। দূরে একটা চার্চের চূড়ো দেখা যাচ্ছে দেবদারু গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে।

অল্পস্বল্প পাপ না করলে ঈশ্বব-চিন্তা আসে না মানুষের। যেমন করেই হোক আগে কাঁদতে হবে। ছাত্রজীবনে আশ্রমের মাঠে বসে রাতের আকাশ দেখত অমিতাভ। পাশে বসে শম্ভু মহারাজ নক্ষত্রপুঞ্জ চেনাতেন। উরসা মেজর। ওরিয়ন। সেই সময় হঠাৎ চোখে পড়ত আকাশের গা বেয়ে অগ্নিপিণ্ড নেমে আসছে পৃথিবীর দিকে। উল্কা। জ্বলতে জ্বলতে, অবশেষে শান্তি। না পুড়লে ছাই হবে কি করে ? অমিতাভ আবার সাইকেল ছেড়ে দিল। রাত-ফোটা

ফুলের গন্ধ আসছে নাকে। রাতের চক্রান্ত মানুষ কি বুঝবে! ঝোপে ঝাড়ে, পাতায় পাতায়, কত কাণ্ডই যে হচ্ছে! গাছের ডালে পাতার বাসায় পাখির ছানা কাঁদছে চিঁচিঁ করে।

আর একটুও নেশা নেই। ঘোর নেই। চিন্তা এখন অনেক পরিচ্ছন্ন। আবার ফিরে আসছে অধীত কবিতার লাইন:

What regiment are you from
brothers?
Word trembling
in the night
A leaf just opening
In the racked air
involuntary revolt
of man face to face with his own
fragility
Brothers

কবিতার লাইন উঠে এলেই অমিতাভ বুঝতে পাবে ভেতরটা পবিত্র হয়ে আসছে মন্দিরের মত। দূরে সাদা মত একটা মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে রাস্তার ধারে। নিশ্চল। সাইকেলের বেল ঝিনঝিন করছে। কাছে এসে অমিতাভ কিছুই দেখতে পেল না। কেউ কোথাও নেই। ফাঁকা রাস্তা আকাশের চোরা আলোয় চকচক করছে। শুধু মনে হল, শীতল বাতাস কারুর নিঃশ্বাসে যেন সামান্য উত্তপ্ত। আসনে যেমন বসে থাকা দেহের উত্তাপ উঠে যাবার পরেও লেগে থাকে কিছুক্ষণ। এই চেনা পৃথিবীও রাতে কেমন অচেনা রহস্যময় হয়ে ওঠে। এইবার বেশ ভয় ভয় করছে।

ভাবতে ভাবতে অমিতাভ আরও কিছু দূর এগিয়ে গেল। অনেকদিন সাইকেলে ওঠার প্রয়োজন হয়নি। অভ্যাস নষ্ট হয়ে গেছে। পা যেন আর চলছে না। দূরে কিছুটা জায়গা সোনালি আলোয় ঝলমল করছে। অমিতাভ ভেবেছিল সোডিয়াম লাইট। যতই এগোয় আলোটা সরে যেতে থাকে। আশেপাশে কোনও ল্যাম্পপোস্ট নেই, আলো নেই, অথচ আলোর সোনালি আঁচল সরে সরে যাচ্ছে। নর্তকী যেন আঁচল উড়িয়ে চলেছে।

অমিতাভ এবার সত্যিই ভয় পেয়ে গেল। চোখের ভুল! তা কি করে হয়! স্বপ্ন দেখছে? সে তো মানুষ ঘুমোলে দেখে। ফিরে যাবে? না, ফিরে যাবে কেন? এতদিনে তনু তাকে ভীষণ টানছে। অমিতাভ অল্প সময়ের জন্যে চোখ বুজিয়ে ঠাকুর রামকৃষ্ণ আর মা সারদাকে স্মরণ করার চেষ্টা করল। মনের কাঁচে ময়লা ধরে গেছে। ছাত্রজীবনে যেমন স্পষ্ট দেখতে পেত, সেরকম স্পষ্ট হল না। ঝাপসা। তবু বললে, তোমরা আমার হাত ধরো। তোমরা আমার হাত ধরো। বলা মাত্রই অমিতাভর মনে হল, সে কি অসহায়! স্যুট, টাই, ব্রিফকেস, বড় চাকরি, ফ্ল্যাট, গাড়ি, এই এতটুকু চেনা জগতের যত হম্বিতম্বি। বিশাল জগতে শবের মত কাঁপছে অমিতাভ। বিশাল আকাশ। খই ফোটা তারা। এক ঠ্যাঙা বাড়ি। গোরস্থান। মসজিদ। আদিগঙ্গার ওপর পোল। চিড়িয়াখানার বাগান। হর্টিকালচার। কালীঘাটের মন্দির। সোনালি আলো দুপুরের চিলের ছায়ার মত ভাসতে ভাসতে, এক একটি জায়গা আলোকিত করতে করতে ক্রমে পশ্চিম আকাশে উঠে গেল। আশ্চর্য ঘটনা। অমিতাভ আর ভাবতে পারছে না। আচ্ছন্ন চিন্তা।

গোপা আর শশধর দুজনে পাশাপাশি বসে আছে দাওযায। থামে ঠেসান দিয়ে। ডানপাশে

ছাতে ওঠার সিঁড়িব কাছে ঝুরঝুর বালি ঝরছে। সারা বাড়িটায় নোনা ধরে গেছে। জোরে বাতাস দিলেই বালি ঝবে পড়ে। ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘ মাথার ওপরের চৌকো আকাশে এসেই সরে যাচ্ছে। শশধর এক নজরে তাকিয়ে আছে ফালি আকাশের দিকে।

ঘন্টাখানেক এখানে ওখানে সেখানে ঘুরেছে পাগলের মতো জলোর খোঁজে। কোথাও নেই। উধাও। কর্পূর হয়ে গেছে।

গোপা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'কি সাংঘাতিক ছেলে !'

শশধরও নিঃশ্বাস হাল্কা করলে, 'বললে এক করলে এক। কাকে বিশ্বাস করবে ! সবাই অবিশ্বাসী !'

'তোমার হাই উঠছে। যাও তুমি শুয়ে পড়ো।'

'ঘুম হবে না। ভেতরটা ছটফট করছে।'

'আমার কি হচ্ছে জানো ? আমার ভীষণ রাগ হচ্ছে। আমাদের কি রকম বোকা বানিয়ে দিয়ে চলে গেল। একেবারে অসহায় করে দিয়ে গেল। মিথ্যেবাদী। কাপুরুষ।'

'সকাল না হলে আর কিছু করা যাবে না। এই রাতে আর কি কবব ! বাস্তাঘাট খাঁ খাঁ করছে।'

'তুমি শুয়ে পড় গে। আমি আব একটু বসে যাই। যদি ফিরে আসে।'

'ভিজে ভিজে বাতাস দিচ্ছে। তুমিও ভেতরে চলো। জেগেই থাকবো। ডাকলে সাড়া পাবে। মশায় গা হাত ফুলিয়ে ছেড়ে দিলে।'

'কি করে যাই বলো তো ! আমার কেবলই মনে হচ্ছে যদি আত্মহত্যা কবে !'

'খারাপটাই ভাবছ কেন ?'

'ভাল চিন্তা আর আসে না। মনের দোষ। মনটা এমন হয়ে গেছে। এই বললে গ্রহ কেটে গেছে। কোথায় কেটেছে ! আমার বরাতটা একবার দেখেছ ? তুমি যেই ঘুরে এলে আব একজন অমনি সরে পড়ল ! হয়েছে ভাল।'

শশধর গোপার অনাবৃত কাঁধে হাত রাখল। ঠাণ্ডা। ভিজে ভিজে। সামান্য আকর্ষণ করতেই গোপা শশধরের গায়ে ঢলে পড়ল। আর শশধরের ঠিক তখনই মনে হল, জলো থাকলে তারা দুজনে এই মুহূর্তে এত ঘনিষ্ঠ হতে পারত কি !

মনে হওয়া মাত্রই ভেতরটা কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল। মানুষ কি অসম্ভব স্বার্থপর, আত্মসুখী। পোড়ো জায়গাটায় ছুঁচো ডাকছে। শশধর ভয়ে পা তুলে বসল। মানুষ আদর পেলেই মৃত্যু ভয়ে মরে।

গোপা বললে, 'চলো আমরা এখান থেকে চলেই যাই। বললে তোমাকে অফিস থেকে বাইরে ট্র্যান্সফার করবে না !'

'বললে হয়তো করবে। কলকাতা ছেড়ে কজনই বা সাধ করে বাইরে যেতে চায় !'

উত্তেজনায় গোপা উঠে বসল, 'তাহলে চল,চল না, ছোট্ট কোনও শহরে চলে যাই। ঝাউবন, একটা নদী। ছোট্ট একটা বাংলোটাইপের বাড়ি।' গোপার চোখ দুটো কালো হীরের মত চকচক করছে।

গোপার গালে আঙুলের টুসকি মেরে শশধর বললে, 'তোমার ওপর অভিমান করে আমি অনেক জায়গা বাউলের মতো ঘরে ঘুরে দেখেছি। কাছাকাছি ডানকুনিতে আমার এক বন্ধু থাকে। বেশ জায়গাটা। ওখামে কাঠা চারেক জমি কিনলে হয়।'

'না না, এমন জায়গায় চলো যেখানে আমাদের জানাশোনা কেউ নেই। এই পুরনো জীবনটায় ঘেন্না ধরে গেছে। একেবারে নতুন করে সব পাতব। বুঝলে, নতুন উনুন, শিল নোড়া, খাট-বিছানা। এ বাড়িটার দেয়ালে দেয়ালে দুর্ভাগ্য লেগে আছে।'

'আরে আকাশটা হঠাৎ এমন লাল হল কেন বলো তো ! দ্যাখো দ্যাখো। কোথাও আগুন

লাগল নাকি !'

পশ্চিম আকাশ থকথকে লাল। তির তির করে আকাশ কাঁপছে।

শশধর উঠে দাঁড়াতেই গোপা উঠে দাঁড়াল। শশধর বললে, 'ছাদে যাবে ?'

'এই অন্ধকারে ?'

'তাতে কি হয়েছে ! চলো না, দেখি কি হল। মনে হচ্ছে, বেশ বড় ধরনের আগুন লেগেছে।'

দুজনে ছাদে এসে দাঁড়াল। শুকনো ঝনঝনে ছাদ। জায়গায় জায়গায় আলসে ভেঙে গেছে। কার্নিসে বট গাছ। সতেজ ঔদ্ধত্য।

পশ্চিমদিকে কোথাও আগুনই লেগেছে। লকলকে জিভ অন্ধকারকে ছোবল মারছে। ভলভল করে ধোঁয়া উঠছে।

শশধর বললে, 'বাপরে, কি সাংঘাতিক আগুন !'

দূব থেকে অস্পষ্ট কোলাহল ভেসে আসছে। ভেসে আসছে পোড়া পোড়া গন্ধ।

জ্ঞানেশ রাস্তার দিকে চোখ রেখে একমনে গাড়ি চালাচ্ছে। এই একই পথে কতবার আসা-যাওয়া, যাওয়া-আসা হল। পাশে বসে আছে শিবপদ। স্থির পুতুলের মতো।

ঢাকা কেটলির ভেতর গরমজল ফোটার মতো শিবপদর ভেতরে চিন্তা টগবগ করছে। তনুর এই দুর্ঘটনার জন্যে সে কতটা দায়ী। অবশ্যই দায়ী। দরজাটা বন্ধ করে পেছনের বাগানে বেড়াল নিয়ে আদিখ্যেতা না করলে তনু ওভাবে ঢুকেই মৃতদেহের মুখোমুখি হত না ! কেয়ারলেস। অসাবধানী বুড়ো। অবশ্য জানবই বা কেমন করে, যে তনু হঠাৎ চলে আসবে।

ফাঁকা রাস্তা। গাড়ি একশোতে ছুটছে। স্টিয়ারিং একেবারে আলগা।

জ্ঞানেশ আবার নতুন করে ভাবছে, সত্যিই তনুর সঙ্গে মাস্টারমশাইয়ের সেই সম্পর্ক ! নেশার ঘোরে হলেও কেন অমিতাভ অমন কথা বললে। এসব ঘটনা বিলিতি কেতাবে-পড়া যায়। বাস্তবে হয় নাকি ! কে জানে বাবা ! তার জগৎ আলাদা। লোহালক্কড়। নাটবল্টু। অত কিসের ভাবনা ! বিপদে মানুষকে সাহায্য করা উচিত। করে যাবে মুখ বুজে।

হঠাৎ শিবপদ চাপা গলায় বললে, 'আর কত দূর !'

গাড়ির গতি আরও একটু বাড়িয়ে দিয়ে জ্ঞানেশ বললে, 'প্রায় এসে গেছি।'

শিবপদ আবার নিজের চিন্তায় তলিয়ে গেল। তনুর মায়ের সঙ্গে তার অনেককালের আলাপ। দুজনেরই এক বৃত্তি—শিক্ষকতা। তনুর বাবা ছিলেন প্রায় সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীর মতো। অদ্ভুত মিল ছিল শিবপদর চেহারার সঙ্গে। এমনও হয়। দুটো মানুষ প্রায় একইরকম দেখতে। এমন কি কণ্ঠস্বরেও অদ্ভুত সাদৃশ্য। তনুর মা হাঁ করে মুখের দিকে তাকিয়ে থাকত আর কেবলই বলত, আশ্চর্য ! আশ্চর্য ! শিব একটু বিব্রত বোধ করত। মনে হত, তার বেঁচে থাকাটাই ভুল হচ্ছে। কোনও কোনও দিনদুপুরে তনু পেছনদিক থেকে এসে হঠাৎ গলা জড়িয়ে ধরে পিঠে দোল খেত শিশুর মত। বলত, আমার এক বাবা গেছেন, আর এই তো আমার আর এক বাবা রয়েছেন। সেই সময় তনুর বয়েসটা হঠাৎ এত কমে যেত ! শিবের কোনও রকম সঙ্কোচ হত না। নতুন একটা মায়ার সংসার তৈরি হত। সম্পর্ক ভেঙে গড়ে, সময়ের ওলটপালট হয়ে, এ-সংসার, সে-সংসার জোড়াতালি লেগে, চরিত্রের আনাগোনায় শিবের ঘোর লেগে যেত। মনে হত, আবার শুরু থেকেই বুঝি শুরু হল। তার নিজেরই মেয়ে পিঠে দোল খাচ্ছে। সুধাকে বলেছিল, জানো, মেয়ে হলে নাম রাখব উমা। উমার মত রূপ চাই। চাই স্বভাব।

ঘাড়ের পাশ থেকে শিবের বুকের কাছে মাথা ঝুলিয়ে দোল খেতে খেতে তনু বলত, আমার মিষ্টিবাবা। বুকের দুপাশে ঝুলছে চুড়ি পরা ফর্সা দুটো হাত। অদ্ভুত সরু সরু আঙুল। শিবের মনে হত, তনু বারো-তের বছরের ফ্রক পরা একটা মেয়ে। তনু নয়, উমা। যে উমা সুধার

কোলে আসার সুযোগ পেল না।

শিব দমকা নিঃশ্বাস ফেলে বললে, 'নাঃ।' জ্ঞানেশ বাঁ দিকে বাঁক নিল।

॥ উনত্রিশ ॥

'অ্যাপোলো'। আলোর অক্ষর। রাতজাগা রুগির চোখ। ঝিমঝিম রাত। রাতেরও শব্দ আছে। শিবপদর ছেলেমানুষী বিশ্বাস, এত বড় একটা পৃথিবী ঘুরছে। সেই ঘোরার একটা শব্দ থাকবে না? কে আর মধ্যরাতে জেগে থেকে কান পেতে শুনছে?

সেদিন দুপুরে স্বামী সত্যানন্দের সাধন অনুভূতি পড়তে পড়তে শিবের বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছে। স্বামী লিখেছেন। ধ্যানের অনুভূতি। বিশ্বাস করো ভাল। বিশ্বাস না করো, তাতেও কিছু যায় আসে না। উলঙ্গ মানব এ মুখে ঢুকে ও মুখে বেরিয়ে যাবে। নাটক চলতেই থাকবে, দিনের পর দিন। রাতের পর রাত। মঞ্চ খালি যাবে না। এর ভেতরই সাধনার জোরে কেউ ওঠে। আর কেউ ভেড়ার মতো নেচে নেচে সরে পড়ে।

The song of creation
Is the song eternal,
Vibrating through time and space.
Cosmic concert.

জ্ঞানেশ আচমকা ব্রেক কষল। সাদা মতো কি একটা ছুটে চলে গেল গাড়ির সামনে দিয়ে। বেড়াল। শিব ঝাঁকানিতে ঝুঁকে পড়ল সামনে। জ্ঞানেশ এতক্ষণ বেপরোয়া চালাচ্ছিল। ভীষণ অধৈর্য অবস্থা। মনে মনে বার কতক ধ্যাততেরিকা বলে ফেলেছে। একই সঙ্গে অনেক কিছু ইচ্ছে করছে। চান, খাওয়া, নরম বিছানায় টান টান শুয়ে পড়া। সবার আগে সিগারেট ধরাবার ইচ্ছে হচ্ছে। পাশেই মাস্টারমশাই। উপায় নেই।

হিন্দি ছবির নায়কের মতো সাঁ করে গাড়িটাকে ফুটপাথের ধারে এনে জ্ঞানেশ ইঞ্জিন বন্ধ করে দিল।

'আমরা এসে গেছি।'

শিব নানা ভাবনায় বেশ একরকম ধ্যানস্থ ছিল। চমকে উঠল।

'এসে গেছি?'

শিবের কোলের ওপর দিয়ে পাশে হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে দিতে দিতে জ্ঞানেশ বললে, 'সাবধানে নামুন!'

সোজা হয়ে বসতেই, জ্ঞানেশের চোখ পড়ল, একটা সাইকেল আসছে। অন্ধকারে সাদা আরোহী। জ্ঞানেশ ইচ্ছে করে হেডলাইট জ্বালাল। পরনে পাজামা, ঢোলা পাঞ্জাবি। চেনা চেনা।

অমিতাভ আলোর বৃত্ত থেকে সরে গেল। আর তখনই জ্ঞানেশ চিনতে পারল। গাটা ছমছম করে উঠল। একটু আগে যে মাতাল হয়ে মেঝেতে গড়াগড়ি খাচ্ছিল সে এতটা পথ সাইকেল চালিয়ে এল কি করে? ভৌতিক কাণ্ড নয় তো

গাড়ি থেকে নেমে দরজায় তালা লাগাতে লাগাতে জ্ঞানেশ দেখল, গেটের সামনে অমিতাভ সাইকেল থেকে নেমেছে। ইতস্তত করছে ঢুকতে। আসল লোকই যখন এসে গেছে তখন কি প্রয়োজন তাদের যাবার। নেশার ঘোরে হলেও একটু আগে যে কথা বলেছে, তাতে বাপ-ছেলে মুখোমুখি না হওয়াই ভাল। স্নেহ নয়, ঘৃণার আদানপ্রদানই হবে।

এগোতে গিয়েও পেছিয়ে এল জ্ঞানেশ। শিবপদ লক্ষ করেনি ছেলেকে।

জ্ঞানেশ বললে, 'চলুন মাস্টারমশাই আমরা ফিরে যাই।'

শিব আঁতকে উঠে বললে, 'কেন, বাবা! সব শেষ হয়ে গেছে? সব শেষ!'

'না, শেষ নয়। অমিতাভ এসে গেছে। আমাদের আর প্রয়োজন হবে না।'

'সে কি, প্রয়োজন হবে না কেন?'

'আপনাকে সে অশ্রদ্ধা করে।'

শিব ক্ষিপ্ত হয়ে বললে, 'করুক। আমি তো শ্রদ্ধা চাই না। বিপদে আমি তার পাশে থাকতে চাই। তনু আমার মেয়ে।'

'অপমানিত হলে আমি জানি না।'

জ্ঞানেশ, মান অপমানে আমি বিচলিত হই না। কোথায় অমিতাভ!'

অমিতাভ তখন গেটের প্রহরীকে বোঝাবার চেষ্টা করছে। ক্লান্ত কণ্ঠস্বর। জামার হাতায় কপালের ঘাম মুছছে। শিব এগিয়ে গেল সেদিকে। এলোমেলো পা পড়ছে। যে কোনও মুহূর্তে পড়ে যেতে পারেন। জ্ঞানেশ হাত ধরে ফেলল উতলা হবেন না মাস্টারমশাই। অন্ধকার রাত।

জ্ঞানেশের কথা শিবের কানে গেল না। শিব বললে অমিত তুই এসেছিস। কেমন আছিস তুই?

ধরাধরা গলায় অমিতাভ বললে বাবা।

জ্ঞানেশ উৎকণ্ঠিত। মাস্টারমশাই এখুনি ছেলেকে বুকে জড়িয়ে ধরবেন। সেই ছেলে, যে সন্দেহ করে পিতা তার স্ত্রীর প্রেমিক। যার কাছে গেলে মাস্টারমশাইয়ের নাকে লাগবে ভক ভকে মদের গন্ধ। ভাগ্য ভাল, সাইকেলের ব্যবধান থাকায় পিতাপুত্রে আলিঙ্গন হল না। দু'জনে মুখোমুখি। পাশে জ্ঞানেশ। গেটের মাথায় আলো। সেই আলো এসে পড়েছে দু'জনের মুখে।

অমিতাভ আবেগহীন গলায় বললে, 'ভাল আছেন আপনি?'

জ্ঞানেশ রাগরাগ গলায় বললে, 'এখানে সময় নষ্ট না করে ভেতরে চলুন।'

অমিতাভ মুখ ফেরাল জ্ঞানেশের দিকে। ইস্পাতের মতো কঠিন কণ্ঠস্বর, 'জ্ঞানেশবাবু, আপনি যথেষ্ট করেছেন আমাদের জন্য। এবার আপনি আসতে পারেন। ডোণ্ট ওয়েস্ট ইওর টাইম। ডোণ্ট ডিকটেট ইওর টার্মস। ডোণ্ট সারপাস ইওর লিমিট।'

খুব কাছ থেকে পর পর তিনটে গুলি বুকে এসে লাগলে যেমন হয়, জ্ঞানেশের ঠিক সেই রকম একটা অনুভূতি হল। প্রচণ্ড ধাক্কা। পর পর তিনবার। জ্ঞানেশ শিবপদর হাত ছেড়ে দিল। একপা একপা করে পেছতে লাগল। মানুষ? এর নাম আধুনিক মানুষ।

শিবপদ বললে 'ছি ছি, তুই কাকে কি বলছিস? সেই সকাল থেকে ছেলেটা ঘুরছে। নাওয়া নেই, খাওয়া নেই। জ্ঞানেশ, জ্ঞানেশ তুমি কিছু মনে কোরো না বাবা। ওর মাথার ঠিক নেই।'

জ্ঞানেশ দূর থেকে বললে, 'এ-কালের মানুষ কিছু মনে করে না মাস্টারমশাই। তাদের মনটাই নেই।'

একটু আগে অমিতাভ নিজেকে হারিয়ে ফেলেছিল। নিজের ওপর এখন তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ। জ্ঞানেশ তার চোখে একটা লোফার ছাড়া আর কিছু নয়। দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে লোফারটা তাকে চড় মেরেছে। যে কথা তার মনে ছিল, মুখ ফসকে সেই কথা বলে ফেলেছে ওই

লোফারকে। যত তাড়াতাড়ি ওকে সরানো যায় ততই ভাল। একটু আগে সে জ্ঞানেশের পায়ের কাছে পড়েছিল, এইবার সে জ্ঞানেশকে মারবে লাথি।

অমিতাভ শিবপদকে বললে, 'আপনার থাকার কি খুব প্রয়োজন আছে ? আপনি বৃদ্ধ মানুষ !'

শিব হতভম্ব, 'কি বলছিস ? আমার থাকার কোনও প্রয়োজন নেই। মানুষের বার্ধক্য একটা অপরাধ ! সেই অপরাধে আমি তনুকে দেখতে পাব না ?'

'ডোন্ট বি ইমোশানাল। আপনি ওর গাড়িতেই ফিরে যেতে পারেন। আমার গাড়ি নেই যে পৌঁছে দিয়ে আসব। এক ঝলক চোখের দেখা, এর বেশি তো কিছু করার নেই আপনার ! সারা দুপুর তো দেখলেন, আর বিপদের মুখে ঠেলে দিলেন। বাকিটা আমিই ম্যানেজ করে নিতে পারব। এনাফ অফ ইওর স্নেহ অ্যাণ্ড ভালবাসা !'

শিবপদর পা কাঁপছে। শরীরে কোনও জোর নেই। মনে হচ্ছে, এখুনি দম আটকে যাবে। অমিতাভ সাইকেল সমেত ঢুকে গেল ভেতরে। এ নারসিং-হোম তার চেনা। কিশোরকে সে চেনে। তাছাড়া চিরকালই তার তেমন আবেগ অনুভূতি এসব নেই। কোনও কিছু নিয়ে প্যানপ্যানানি ভাল লাগে না। পৃথিবী এমন একটা জায়গা, যেখানে প্রতি মুহূর্তে জন্ম, মৃত্যু, দুর্ঘটনা, আত্মহত্যা, খুন রাহাজানি। যা হবার তা হবেই।

অমিতাভ যত এগোচ্ছে পেছনে তার ছায়া তত দীর্ঘ হচ্ছে। জ্ঞানেশ স্টিয়ারিং ধরে সামনে তাকিয়ে বসে আছে অন্ধকারে। দেখছে, নির্জন ফুটপাথে এক বৃদ্ধ মানুষ দিশাহারা হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন। কি করবেন, কোন দিকে যাবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

জ্ঞানেশ নেমে এল। এই আশঙ্কাই সে করছিল। চরম অপমানিত হয়ে বৃদ্ধকে ফিরতে হবে। সে জানে, সে দেখেছে, মানুষ যত ওপরে ওঠে তত ছোট হয়।

শিবপদর হাত ধরে জ্ঞানেশ বললে, 'চলে আসুন।'

হাত বরফের মত ঠাণ্ডা। সারা শরীর কাঁপছে। কিছু বলতে চাইলেন, বলা হল না। খেয়াল নেই। হেঁটে চলেছেন জ্ঞানেশের পাশে পাশে নেশাগ্রস্তের মতো।

আর সামনে নয়। পেছনের দরজা খুলে জ্ঞানেশ সাবধানে শিবপদকে বসিয়ে দিল। শিব একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়ল। নিজেকে কেমন যেন জড়পিণ্ডের মত লাগছে। তবু বললে, 'ও কি ঠিক ঠিক সব পাববে ? তোমার কি মনে হয় জ্ঞানেশ ? একেবারে একলা। ওর পাশে তো কেউ রইল না। আমি এখন কি করি ! তুমি কি বল ?'

'আমি যা বলব, তা কি আপনার পছন্দ হবে ?'

'হবে। আমি একটা ওলড হ্যাগার্ড। আমার দেহ প্রাচীন। আমার চিন্তা প্রাচীন। আধুনিক জগৎ তুমি আমার চেয়ে ঢের ভাল বোঝ।'

'তা হলে শুনুন। স্নেহ, ভালবাসার যুগ শেষ হয়ে গেছে। ভাল ভাল সেন্টিমেণ্ট সব মরে গেছে। মানুষের চিন্তা এখন কর্ক স্ক্রুর মত প্যাঁচালো। আপনি করবেন এক, লোকে বুঝবে আর এক। সব কিছুরই অন্য মানে হবে। যা হচ্ছে হোক, আপনি মাথা ঘামাবেন না। যতটা পারেন দূরে চলে যান।'

'আমাকে যে দায়ী করলে !'

'করুক। ইচ্ছায়, অনিচ্ছায়, আমরা অনেকেই অনেক কিছুর জন্যে দায়ী। মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই। সমাধান পাবেন না।'

জ্ঞানেশ স্টার্ট দিল। গাড়ি কেঁপে উঠল। জ্ঞানেশের জানলার পাশে ছায়ামূর্তি। পার্বতী।

'সায়েব। আমি—আমার কি হবে ?'

'তুমি উঠে এস। তোমাকে যাবার পথে নামিয়ে দিয়ে যাই।'

'কোথায় ?'

'যেখানে ছিলে সেইখানে।'

'না বাবু।'

জ্ঞানেশের মাথায় এইবার খুন চাপছে। যত সমস্যা সব এইবার বটগাছের আঠার মত জড়িয়ে ধরছে। কড়া জবাব দিতে গিয়েও সামলে নিল। একটু আগে অকারণে মেয়েটাকে আস্কারা দিয়েছে। এখন পেয়ে বসলে কিছু করার নেই। অকারণে, না কারণে ? নিজেকেই প্রশ্ন। উত্তর দিতে ভয় পাচ্ছে। ভেতরে অনেক সাপ আছে। ঝাঁপি খুলে দিলেই বেরিয়ে আসবে কিলবিল করে।

'তুমি উঠে এস সামনে।'

জ্ঞানেশ হাত বাড়িয়ে দরজা খুলে ধরল। কাঁচেব চুড়িব ঠিন ঠিন শব্দ। শাড়ির আঁচলের খসখসানি। পার্বতী বসল। জ্ঞানেশ জানে না, কি করবে। কোথায় নিয়ে যাবে। কিশোরকে পার্বতীর জন্যে চেপে ধবার সুযোগ হল না। যা হয় হবে। পবে হবে। গাড়ি ঘুরে গেল। রাতটা শেষ হলে বাঁচা যায়।

শিব প্রশ্ন কবলে, 'এ কে ?'

'মাস্টারমশাই, এ আর এক দুঃখ। এর সাহায্যেই তনুকে হাসপাতালে এনেছি।'

'এটা কি হাসপাতাল ?'

'না, নার্সিংহোম। ওই হল আব কি। তা একে একটা কোথাও প্লেস করে দিতে হবে। খুব বিপদে পড়েছে।'

'নমস্কাব বাবু।' পার্বতী ঘাড ঘুরিয়ে শিবকে নমস্কার কবল। অন্ধকাবে দু'হাত জোড় করে।

'নমস্কাব।'

পার্বতীব ভদ্রতায জ্ঞানেশ মুচকি হাসল। গাডি চলছে। ড্যাশবোর্ডের লাল আলোব আভাস, সামনের আসনেব অন্ধকার সামান্য তবল হযেছে।

শিব বললে, 'মেযেটিকে তুমি কোথায দেবে ?'

'ভেবেছিলুম এই নার্সিংহোমে লাগিযে দোব। আবা৷ ভাবছি পামেলা বোসেব অর্ফানেজে দিলে কেমন হয। আপনি বাখবেন মাষ্টাব মশাই ? আপনার তো দরকাব !'

'আমি ? আমাব তো কোনও রোজগাব নেই জ্ঞানেশ। কলসিব জল গডিয়ে যদ্দিন চলে। আচ্ছা জ্ঞানেশ, তুমি তোমার মা-বাবাকে এইভাবে কোনও দিন মুখের ওপব অপমান করেছ !'

নীরবে মিনিট দুই গাড়ি চালিয়ে জ্ঞানেশ বললে, 'মাস্টাবমশাই, আমি তো তেমন শিক্ষিত নই। বড চাকরিও কবি না। কুলিকামারি মানুষ। বাবা যদ্দিন ছিলেন মাথা তুলে কথা বলার সাহস হত না। এখনও মা আছেন। আমার পরম সৌভাগ্য। সব জীবনেরই তো দুটো নোঙর, মা আর বাবা। তাঁরাই এনেছেন। তাঁবাই পালন করেছেন। ফল হযে বৃক্ষকে কি করে অস্বীকার কবি। লিভিং গড তো তাঁবাই। এই সব পুরনো বিশ্বাস নিয়ে আমাব দিন বেশ চলে যাচ্ছে মাস্টাবমশাই। এখনও বাড়ি ফিবে মাযেব কোলে মাথা রেখে ছেলেবেলার গল্প শুনি। সে যেন তীর্থ-যাত্রাব মতো। মা বলেন, আমার বুড়ো খোকা। সাবাদিনে আমার সবচেয়ে সুখেব মুহূর্ত ওই সময়টুকু। একটু বোকা বোকা হলে পৃথিবী মোটামুটি সুখেরই জাযগা।'

শিব একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল। মানুষের জীবনের সবচেয়ে বড় ব্যর্থতা উত্তরপুরুষকে মানুষ কবতে না পাবা। অর্থ, সামর্থ্য, ডিগ্রি, ডিপ্লোমা সবই অসার বস্তু। সাব বস্তু পূর্ণতার প্রচ্ছন্ন অহংকার। সেই অহংকাব লুকিযে আছে নিজের পবিচয়ে। পুত্রের পরিচয়ে। বৃক্ষ তোমার পরিচয কিসে ? না, ফলে। শিবপদব ভেতবে ভীষণ একটা অস্বস্তি হচ্ছে। এমন একটা কষ্ট, যার কোনও নিরাময় নেই। জীবনের সব আয়োজন ব্যর্থ হয়ে গেল। আর কোনও অবলম্বন রইল না। এমন জীবনেব বাঁচাও যা, মরাও তাই।

নিদ্রিত শহর। সাঁ সাঁ কবে গাড়ি ছুটছে। জ্ঞানেশেব মনে হচ্ছে কোনও গাছতলায় পার্বতীর

কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়ে। এই কলের জল আর বিজলী বাতির জীবনে ঘেন্না ধরে গেছে। সে এখন থেকে চেষ্টা করবে অমিতাভের উল্টো হতে। জ্ঞানের কথা। ইংরিজীর ফোড়ন। অসহ্য। ওসব অনেক শোনা হল। দেখা হল অনেক। সব ফেলে দাও। বাঁচো। আনন্দে বাঁচো। ভালবেসে যাও পাগলেব মত। রাগো। হাসো। ভাঙো। গড়ো। দেবতা হয়ে কাজ নেই। হও স্পন্দিত মানুষ। জ্ঞানেশ মনে মনে হাসল। রোমান্স আর জীবন দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থান করে। ভাবা যায় অনেক। করার সাহস কোথায়! জীবনের চলন একবার মাপা হয়ে গেলে, তাল, লয়, ছন্দ সহজে ভাঙা যায় না।

এই শেষ রাতে চলন্ত গাড়িতে শিবপদর যার কথা মনে পড়ছে, সে অমিতাভের মা নয়। তনুব মা। মহিলার সঙ্গে একবার দেখা হলে বেশ হয। বলা তো যায় না, কবে আছে, কবে নেই। একটা চিঠি লিখবে। অনেকদিন আসেননি। আসুন না দিন কয়েকের জন্যে। কি ধবা যায়! একটা কিছু না ধরলে শেষটা যে বড করুণ হবে। ঈশ্বর-ভাবনা কিছুতেই যে আসে না। বড কঠিন লাগে।

ময়দান ঘেঁষে গাড়ি চলেছে। বড বড গাছের তলায় মাঠ শুয়ে আছে। অভিমানীর চোখের মতো অজস্র আলো জ্বলছে, দূরে, আরও দূরে। রাতেব পাশ ফেরাব শব্দ শুনতে পাচ্ছে শিবপদ। এক সময ক্লাসে পডাত ট্র্যাজেডি কাকে বলে? সবচেয়ে বড ট্র্যাজেডি হল, নিঃসঙ্গ হয়ে যাওয়া। সব হাবাতে হারাতে সম্পূর্ণ একা।

শিব আব চুপ করে থাকতে পাবল না। প্রশ্ন কবে ফেলল, 'জ্ঞানেশ, তনুর কি হল জানা যাবে কেমন করে?'

'আমি বাড়ি ফিবেই ফোন কবব কিশোরকে। তাবপব জানিযে যাব আপনাকে। তবে আমাব অনুবোধ, আপনি ওদেব ভোলার চেষ্টা করুন।'

'তা কি সম্ভব জ্ঞানেশ' তনু যে আমায স্নেহ দিযে বেঁধে ফেলেছে। সে বাঁধন কি সহজে খোলা যায়'

'যায়। জ্ঞানের ছুবি দিয়ে কেটে ফেলুন।'



॥ ত্রিশ ॥

কৃষ্ণ শব্দ না করে গেটেব আংটা খুলল। গত কযেক দিন হল শিবের বাড়ি বড বিষণ্ণ হয়ে আছে। সামনেব বাগানে পাতা পড়ে আছে। এমন থাকে না। রোজ ঝাঁট পড়ে। গাছের গোড়া শুকিয়ে আছে। জল দেওযা হয়নি। জবা গাছে গেরুয়া ফুল, বাতাসে অল্প অল্প দুলছে। কৃষ্ণ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইল সেদিকে। ঈশ্বরের আয়োজনে ত্রুটি নেই। মানুষের মন যদি এতেও না ভরে, কি আব করবেন তিনি। রোজ ভোরে পাখিদের বলছেন, শিস দাও। সূর্যকে বলছেন, ভোরেব আকাশে আবীব ওড়াও। নদীর জলে সোনার পাত ছিটিয়ে দাও। পাতাকে বলছেন, বাতাস করো। গাছকে বলছেন, ছাযা লোটাও। যাকে যা নির্দেশ করছেন সে তাই করছে। রাতে তাবাদেব বলছেন, চলে যাওয়া প্রিযজনেব চোখ হয়ে ফুটে থাক। চাঁদকে বলছেন, প্রেমের কিবণ ঢাল। মানুষকে বলছেন, আনন্দ, আনন্দ। আনন্দং খল্বিদং ব্রহ্ম। মানুষ এদিকে শুকিয়ে

মরছে। শেকস্‌পীয়র টু ডাই ইন প্লেন্টি।

শিবটা কি করতে চাইছে ! নামের অপমান ! তুই একটা জ্ঞানী মানুষ। একেবারে ঝাড়া হাত পা। তুই এই সংসারচক্রে ঘুরে মরছিস ! তাহলে জ্ঞানী আর অজ্ঞানীতে তফাৎ রইল কি !

'কইরে, কোথায় গেলি ? শিবচন্দ্র ?'

এক ডাকে শিবের সাড়া পাওয়া গেল না। কৃষ্ণ বারান্দার বেতের চেয়ারে বসে পড়ল। বড় সুন্দর দিন। প্রমিসিং ডে। একেবারে সিজন্‌ড স্কচ হুইস্কির মত। গোটা কতক মৌমাছি ফুলের মুখে যেন সেঁটে আছে। মধুর নেশায় ওলটপালট খাচ্ছে। সিরসিরে বাতাস বইছে। একে বলে জল রঙের দিন। ভিজে কাগজে দশ নম্বর তুলি দিয়ে হাল্কা করে রঙ ছেড়ে যাও। চমৎকার ছবি।

কৃষ্ণ নিজের মনকে বললে, 'না বাবা, আমি বেশ সুখেই আছি। আর দশ বছরের মতো র‍্যাশান মজুত ! এর মধ্যেই খেলা সাঙ্গ হয়ে যাবে। আর চাওযার মত কিছু নেই। লোভ গেছে। উচ্চাকাঙ্ক্ষা গেছে। দেহের দাবিটাবি বিশেষ কিছুই নেই। দুপুরে পেট ঠেসে যা হয় ডাল ভাত খেয়ে নিলে, রাতে আর কিছু না খেলেও চলে। আমি ভাগ্যবান। নিশ্চয় আমি ভাগ্যবান। কেবল শিবটাব জন্যে আমার যত চিন্তা। আচ্ছা, সব ব্যাপারে তুই নিজেকে এত জড়াস কেন ?

সব কেটেকুটে বেরিয়ে আয়। রেশমের গুটি। আরে রেশম হলেও বন্ধন তো। আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে বসে আছিস। বোকা কোথাকার।'

শিব হঠাৎ দবজা খুলে বারান্দায় বেরিয়ে এল।

'দাদা। তুমি কখন এলে ?'

'তা ধর মিনিট পনের। আধঘণ্টাও হতে পারে।'

'ডাকোনি ?'

'একবাব ডেকেছি। তারপর ধপাস করে বসে পড়েছি। শোভা দেখছি। শোভা। আহা, কি সুন্দর সেজেছে দেখেছিস ! পাকা সবুজেব কোলে কচি সবুজ। সাদার পাশে গেরুয়া। আবার গোটা কতক প্রজাপতি উড়িয়ে দিযেছে। বোস না বোস। কি করিস সারাদিন ? অবজার্ভ নেচাব।'

দীন দুঃখীর মত শিব বসে পড়ল পাশের খালি চেযাবে। গাযে কোঁচাব খুঁট। এক মুখ পাকা দাড়ি। এলোমেলো চুল। যেন অশৌচ চলেছে।

কৃষ্ণ আড চোখে ভাইকে দেখে নিল।

'শোন তোকে আজ একটু জ্ঞান দোব। আমার জ্ঞানকোষে সেবটাক জ্ঞান জমেছে। পাখি দেখেছিস, পাখি ?'

'দেখেছি।'

'পাখির সংসাব দেখেছিস ? বাসা। ডিম। তা। বাচ্চা। ডানা। যাও উড়ে যাও। আর কোনও সম্পর্ক নেই। এবাব তুমি খুঁটে খাও। ঘর বাঁধো। সংসার করো। ওই পাখিই হল মানুষের আদর্শ। তুই একটা পণ্ডিত মানুষ। তোকে সংসার কাবু করবে ? আর তুই কাবু হবি ? বেরিযে আয়। গুটি কেটে বেবিযে আয ?'

শিব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল।

'তোকে আমি একটা বেহালা কিনে দোবো।'

'বেহালা ?'

'হ্যাঁ বে বেহালা। বড় রোমান্টিক বাদ্যযন্ত্র। যখনই ছড টানবি, শুনবি কাঁদছে। এমন একটা কাঁদুনে বাজনা আর দ্বিতীয় নেই। অশ্রু দিয়ে তৈরি। প্রেমের কান্না, বিচ্ছেদের কান্না, মৃত্যুর কান্না। খুব ইচ্ছে ছিল শিখব। সুযোগ হল না। তুই শেখ। শিব তুই শেখ।'

'এই বুড়ো বয়েসে বেহালা ?'

'শেখার কি বয়েস আছে রে পাগলা। আমরা আজীবন শিক্ষার্থী। শোন শিব, আমাদের জীবন কেন এত শূন্য লাগে বলতে পারিস ?'

'বাঁচতে জানি না বলে।'

'আমি ধরে ফেলেছি। মরার আগে কেন মরে যাই জানিস ? দ্যাখ আমরা যখন ছাত্র ছিলুম তখন কিন্তু জীবনে এত শূন্যতা ছিল না। তখন আমাদের জীবনে একটা লক্ষ্য ছিল। শিখব। পাস করব। একটা জায়গায় পৌঁছব। কে মরল, কে বাঁচল, কে গালাগাল দিল, কে আদর করল, সংসার কি ভাবে চলছে এ সবের কোনও তোয়াক্কাই থাকত না। বল, ঠিক কি না ?'

'তা ঠিক। সেই অর্জুনের লক্ষ্যভেদ।'

'তার মানে ছাত্র হতে পারলেই আনন্দ। আয়, আবার আমরা ছাত্র হয়ে যাই। তুই বেহালা শেখ। আর আমি শিখি পাখোয়াজ। আয়, দু'জনে গুরু ধরি। দেখবি, দিন কোথা দিয়ে কেটে যাচ্ছে। এও তো সাধনা। ঈশ্বরের সাধনা বড় কঠিন। মন দিয়ে ছুঁতে হয়। দেহ একেবারে অকেজো। এতে তবু হাত পা নাড়া আছে। কি, শিখবি ?'

'দাদা, তোমার যত অদ্ভুত অদ্ভুত পরিকল্পনা। বৃদ্ধ বয়েসে মানুষের ধৈর্য থাকে ?'

'বৃদ্ধ বৃদ্ধ করবি না। বল ইয়াং ইয়াং। মনের আবার বয়েস আছে না কি ? নে লাগা। জীবনের শেষ আসর আমরা করে যাই। গরু, ভেড়া, ছাগলের মতো ব্যা ব্যা, ভ্যা ভ্যা করে মরব না। মরব বীরের মতো। হেঁটে গিয়ে চিতায় উঠব। জাস্ট লাইক এ কিং। শেখ হ্যাণ্ড করে শুয়ে পড়ব আগুনের বিছানায়। চালাও পানসি বেলঘোরিয়া।'

'আমার ছেলেটাই আমাকে শেষ ক'রে দিলে। পথে বসিয়ে দিয়েছে।'

'তুই কি তোর ছেলের রোজগারের আশা করতিস ?'

'না।'

'তাহলে, ছেলে ছেলে করে মরছিস কেন ? সে যেমন আছে, যেখানে আছে, সেইখানেই থাক না সুখে'। তার জীবন তার জীবন, তোর জীবন তোর জীবন। ক্রস করিসনি। দুটো রাস্তা সমান্তরাল চলুক। প্যারালাল রান। ইংরেজ হতে শেখ। প্রাপ্তে তু ষোড়শ বর্ষে। নে ওঠ।'

'কোথায় উঠব ?'

'দাড়ি কামিয়ে আয়। তোর সেই বিখ্যাত সাজ, ধুতি আর বেনিয়ান পরে আয়। তোর দিকে তাকালে আমার বৈরাগ্য এসে যাচ্ছে। বেঁচে থাকারও একটা আর্ট আছে শিব। যা হোক না হোক, চালে ডালে করে বাঁচলে হয় না ? নে ওঠ।'

'আমি গোঁফ দাড়ি রাখব ঠিক করেছি।'

'কেন, রাশিয়ান ইন্টেলেকচুয়াল হবি।'

'বৃদ্ধ বয়েসে দাড়ি গোঁফে বেশ দেখায়।'

'প্রেম করবি ?'

'কি যে বলো ? সে বয়েস আছে ?'

'শিব বি ফ্রাঙ্ক। সত্যি কথা বল, তোর মনে হয় না, বেশ সুন্দর, স্নেহপরায়ণা একজন মহিলা সব সময় পাশে পাশে থাকলে জীবনের এই ভ্যাকুয়াম অনেকটাই কেটে যেত। মনে হয় না, তুই পাথরে মাথা ঠোকাঠুকি করছিস। শোনো বৎস, সংস্কার না থাকলে যোগী হওয়া যায় না। বড় শক্ত পথ। ভালবেসে ঈশ্বরকে পাওয়া অনেক সহজ। দ্যাখ, আমি কুমুর সেবা করি আর রাতে স্বপ্ন দেখি। সে এমন এক জগৎ, বিউটিফুল, ওয়াণ্ডারফুল মারভালাস। যখন চোখ বুজিয়ে বসি, বেশ হয় বুঝলি। সুন্দর লেগে যায়। খাঁড়ি দিয়ে জল ঢোকে কুলকুল করে। ওই কুমু। আমার গুরু। আমার ইষ্ট। জীবনে একজন শক্তি চাই। এ-সব তোকে আমি কেমন করে বোঝাব ? অনুভূতির ব্যাপার। মনটাকে বেশ কিছুটা উঁচুতে তুলে তাকা, দেখবি সব অর্থ, সব

দৃশ্য পালটে গেছে। জগৎ সংসার সব কুসুম-কোমল। কি অমিতাভ অমিতাভ করছিস। প্রেম কর। প্রেম। লাগা বেহালা। সুরের এক একটা মোচড় মারবি চাঁদের চোখে জল বেরিয়ে আসবে। শেষ রাতে শিশির হয়ে ঝরে পড়বে। শিব, কবিতা লেখ। কবিতা। কি চার কাঠা জমি, দলিল দস্তাবেজ খাজনা, বাজনা, ঝোলাঝুলি করে মরছিস। লিভ লাইক এ রোমান্টিক প্রিন্‌স্। শোন, হিসেব কবলেও মরবি, না করলেও মরবি। নে ওঠ। দাড়ি কামা।'

'তুমি হঠাৎ দাড়ি নিয়ে এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন দাদা ? গৃহবন্দী মানুষের অত বাহার কিসের ?'

'শোন, শোন, মন জিনিসটা যে বাসায় বসবাস করছে, সেই বাসাটাকে একটু তকতকে রাখতে হয়। তোর যদি এতই আলস্য, আয় আমিই না হয় নামিয়ে দি।'

'বিশ্বাস করো দাদা, আমার ঘেন্না ধরে গেছে জীবনে। কি শেখালুম সারা জীবন ছেলেদের। উচ্চ আদর্শ, স্বার্থ ত্যাগ। সবই ভস্মে ঘি ঢালা হল।'

'তোকে একটা জিনিস আমি কিছুতেই বোঝাতে পারছি না, সব চেয়ে কাছের মানুষ, সবচেয়ে ভালবাসার মানুষ, সবচেয়ে বড় আঘাত দিয়ে যায় জীবনে। তুই যত আহত হবি, সে তোকে তত আহত কববে। সেইটাই তার সবচেয়ে বড় আনন্দ। এ যে কি জায়গা রে ভাই। খোঁচা মেরে আনন্দ। অপমান করে আনন্দ। দূরে সরে গিয়ে আনন্দ। এ এক অদ্ভুত চক্ররে ভাই। সব মানুষই অল্প বিস্তর স্যাডিস্ট। তুই একটা পড়ুয়া লোক, তোকে আমি কি জ্ঞান দোব। ডস্টয়েভস্কির সেই অদ্ভুত কথাটা মনে কর। আমি মুর্খ, তাও মুখস্থ কবে রেখেছি— There is only one thing that I dread: not to be worthy of my sufferings. ভাইয়া, এসেছ যখন ভবে থাকার মাশুল দিতে হবে ॥ কত ডুববে উঠবে জীবন-তরী চঞ্চলতা এনো না কো ॥ আমার দিকে তাকা, ব্রেভ ওয়ারিয়ার। একেবারে শূন্য জীবন, তবু আমি পূর্ণ। এই ভেতর। এই ভেতরেই আমি সব সাজিয়ে রেখেছি। কেয়ারী করা সবুজ একটা মাঠ। রঙ বেরঙের ফুল। এক ঝাঁক গাইয়ে পাখি। শ্বেতপাথর বাঁধান ফোয়ারা ফিনকি জল ছাড়ছে। যেই ইচ্ছে হবে চাঁদের আলো। সেখানে আমার প্রাণের সঙ্গী। দূরে দাঁড়িয়ে নিজেই দেখছি, আমি আর সে পাশাপাশি বসে আছি ফিনিক ফোটা চাঁদের আলোয়। দিকচক্রবালে ঝুলিয়ে রেখেছি এক সার নীল পাহাড়। মাথায় পরিয়েছি রুপোর তুষার মুকুট। ছোট্ট একটা পাহাড়ী নদী খেলিয়ে দিয়েছি। কান পাতলে তার শব্দ শুনতে পাই। ইচ্ছে মতো আমি বয়েস বাড়াতে কমাতে পারি। কখনও শিশু। ছুটছি ফড়িংয়ের পেছনে। কখনও কিশোর। কখনও যুবক। সব আমার হাতের মুঠোয়। ভাইয়া, জীবন রহস্যকে ধরে ফেল। আমি এক, আমি বহু। পঞ্চভূতের সঙ্গে আমার জীবনখেলা। আবার একটা বাণী শোনাব। বেশ লাগছে আজ বক বক করতে।'

'বেশ বলছও।'

'স্পিনোজা কি বলেছেন ? Emotion/ which is suffering/ ceases to be suffering as soon as we form a clear and precise picture of it. ভাবাবেগই আমাদের যন্ত্রণার কারণ ; কিন্তু বাবু তার স্বরূপটি চিনে নিতে পারলে তোফা নির্মল জীবন। লাগাও। গান লাগাও। সেই রেকর্ডগুলো কোথায়।'

'নিয়ে গেছে।'

'প্লেয়ার ?'

'নিয়ে গেছে।'

'যাক বাঁচা গেছে আপদ গেছে। তুই আমি আর আমাদের দাবা, এই তিনটে জিনিস থাকলেই হল। মনে আছে শিব, সেই একবার আমরা নৌকো করে বাদায় যাচ্ছিলুম। মাঝিরা রান্না করছে। আর আমরা দাবা খেলছি। আর পালে বাতাস লেগেছে, নৌকো চলেছে ছল ছল করে। ঠিক সেই রকম। ভেবে দেখ, দুই বুড়ো বসে বসে দাবার চাল ভাবছি, আর আমাদের

জীবন-নৌকো সময়ের স্রোতে ভাসতে ভাসতে ভাসতে… । ওই দ্যাখ কে আসছে ।'

'জ্ঞানেশ আসছে । মনে হয় ও মহলের খবর পেয়ে যেতে পারি ।'



॥ একত্রিশ ॥

'এসো । জ্ঞানেশ এসো ।'

জ্ঞানেশ বারান্দার নিচে চটি খুলে. ওপরে উঠে এল । শিব আর কৃষ্ণকে পা ছুঁয়ে প্রণাম করল । প্রণাম কবতে কবতে জ্ঞানেশের মনে হল, ভাগ্য কত ভাল হলে জীবনে প্রণামের মানুষ পাওয়া যায় ।

কৃষ্ণ জ্ঞানেশের মাথায় হাত রেখে বললে, 'মুক্ত হও ।'

এমন আন্তরিক আশীর্বাদ জ্ঞানেশকে কেউ কখনও করেনি । সত্যি, বন্ধন দিন দিন বড় বেড়ে যাচ্ছে । যখন যেখানে যাচ্ছে সেইখানেই জড়িয়ে পড়ছে । কোথা থেকে এক পার্বতী এসে ঘাড়ে চেপে বসেছে । গত তিন দিন ধরে নানা চেষ্টা করেও নামাতে পারছে না । মনে এক ধরনের দুর্বলতাও তৈরি হয়েছে । সকলকে খুলে বলাও যায় না । জ্ঞানীর উক্তি, মন না মতিভ্রম ।

শিবের উৎকণ্ঠিত প্রশ্ন, 'কোনও খবর আছে জ্ঞানেশ ? বড় দুশ্চিন্তায় কাটছে কটা দিন ।'

'আছে । মাস্টারমশাই । কিশোবকে ফোন করেছিলুম । তনুকে রিলিজ করে দিয়েছে । ভালই আছে ।'

'আর, আর !' শিব ইতস্তত করছে । জানতে চায় বাচ্চার খবর । বলতে সঙ্কোচ হচ্ছে ।

কৃষ্ণ বললে. 'আর বাচ্চা । বাচ্চার খবর ?'

'দুজনেই ভাল আছে ।'

'যাক বাবা ।' কৃষ্ণ এক মুখ হাসি নিয়ে শিবের দিকে তাকাল । 'প্রার্থনায় এখনও কাজ হয় রে শিব । আমি সর্বক্ষণ প্রার্থনা করেছি, হে ঈশ্বর, ভালো করে দাও । দেখলি তো, তিনি শুনেছেন । নে ওঠ । উঠে পড । দাড়িটা কামিয়ে আয় ।'

'উঃ, তুমি আমায় মেরে ফেলবে । দাড়িতে তোমার অ্যালার্জি হয়েছে ।'

শিব মুচকি হাসল । কৃষ্ণ বললে, 'এই তো হাসি ফুটেছে ! উঃ একেই বলে মায়া । কি কলেই পড়েছ বাবা । পঞ্চভূতের ফাঁদে পড়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ কাঁদে । আমি বাবা খুব বাঁচা বেঁচে গেছি । ছেলেও নেই মেয়েও নেই । একেবারে ঝাড়া হাতপা । নে মায়া, কি করবি কর । আর কি, এবার আমার বাড়ি ফেরার সময় হল ।'

'এরই মধ্যে চলে যাবে । বোসো । চা খাও ।'

'দূর গবেট । এ বাড়ি সে বাড়ি নয় । একটু কাব্য করলুম । কবিতা বুঝিস না । ইংরেজিতে বললে ঠিকই বুঝতিস, ব্যাক টু প্যাভেলিয়ান ।'

জ্ঞানেশ কিছু একটা বলার জন্যে উসখুস করছিল । কৃষ্ণ বললে, 'কিছু বলবে ?'

'হ্যাঁ । মাস্টারমশাই, পার্বতীকে কি আপনি রাখবেন ?'

শিব মনে করতে পারছে না, কে পার্বতী । হঠাৎ মনে পড়ল, 'অ, সেই মেয়েটি । নাঃ, আর আমি ঝঞ্ঝাট বাড়াতে চাই না । আমার দাদার উপদেশ, মুক্ত হ, মুক্ত । তা ছাড়া আমার মাইনে

দেবার ক্ষমতা নেই বাবা। এখন আমাকে খুব টেনে চালাতে হবে। এই একা আছি বেশ আছি। একবেলা ভাতে ভাত। আর একবেলা মুক্ত বাতাস। এখনও উঠতে হাঁটতে পারি, ভয় কি!'

কৃষ্ণ বললে, 'তোর ভয় নেই। তোকে আমি একটা বই দোব, সহজ রন্ধন পদ্ধতি। পড়বি আর রাঁধবি আর হাপুস হুপুস খাবি। মেয়েরা রান্নাকে জগা খিচুড়ি পাকিয়ে ফেলে। গুছিয়ে করতে পারলে ভেরি ইজি। অ্যাজ সিম্পল অ্যাজ এবিসি।'

'আমি তাহলে আসি।' পায়ে চটি গলাতে গলাতে জ্ঞানেশ বললে। প্রায় গেটের কাছে চলে গেছে। শিব ডাকলে, 'শোনো। পেছু ডাকলুম কিছু মনে কোরো না।'

জ্ঞানেশ ফিরে এল। শিব একটু ইতস্তত করে বললে, 'তোমার সঙ্গে অমিতাভের দেখা হলে বোলো, আমি একা বেশ ভালই আছি। তোফা আছি। আমাকে অনর্থক বিরক্ত করার জন্যে ওরা যেন না আসে। মনে করুক, আমি নেই। মারাই গেছি।'

জ্ঞানেশ বিমর্ষ মুখে বললে, 'আমার সঙ্গে আর তো দেখা হবে না। মাস্টারমশাই, আপনি বরং চিঠি লিখে জানিয়ে দিন।'

'ঠিকানা?'

'ঠিকানা আমি এনে দোবো।'

'বেশ তাই দিও।'

জ্ঞানেশ চলে যেতেই কৃষ্ণ বললে, 'তুই ও-কথা বললি কেন বোকার মতো। এর মানে তুই মোটেই সুখে নেই। খেলতে বসে বিপক্ষকে হাতের তাস কখনও দেখাবি না। খেলে যাবি নীরবে হিসেব কবে। শেষ দানে জয়-পরাজয়ের বিচার।'

হঠাৎ গেটের সামনে হলুদ রঙের একটা ট্যাক্সি এসে দাঁড়াল। কৃষ্ণ সেইদিকে তাকিয়ে বললে, 'কার আগমন।'

দরজা খুলে নেমে এল ক্ষিপ্র এক মহিলা। মাথায় কাঁচা-পাকা বব চুল। সাধারণ বাঙালী মহিলার চেয়ে হাতখানেক বেশি লম্বা। প্রৌঢ়া কিন্তু অসম্ভব চনমনে শরীর। পরনে সিল্কের শাড়ি। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। ধারালো মুখ। বেশ ফর্সা। চেহারায় আভিজাত্য। ড্রাইভার পেছনের বুট খুলে স্যুটকেস নামাচ্ছে। মহিলা হাতব্যাগ খুলে নোট ভরছেন।

শিব বললে, 'আরে কি আশ্চর্য! এ তো তনুর মা। মেঘ না চাইতেই জল।'

শিব কথা শেষ করে গেটের দিকে দ্রুত এগিয়ে গেল। বেশ কয়েকদিন ধরেই শিব ভাবছিল তনুর মাকে একটা চিঠি লিখবে। এ যেন টেলিপ্যাথি হয়ে গেল। শিবের মন প্রথমটায় খুব নেচে উঠেছিল। এক ধরনের আনন্দ। নিজেকে তিরস্কার করে সামলে নিল।

ড্রাইভার স্যুটকেস হাতে ভেতরে আসছে। শিব হাসছে। হঠাৎ কোনও কথা বলতে পারছে না। কি বলবে ভেবে পাচ্ছে না। 'আসুন, আসুন' বলতে পারে কিন্তু পারছে না। ছেলেমানুষী লজ্জা, আনন্দ, ভীষণ ভালোলাগা, সব মিলেমিশে প্রায় বোবা। ভদ্রমহিলার ঋজু ব্যক্তিত্ব তাকে স্তব্ধ করে দিয়েছে। শিব চিরকালই ধীর–স্থির, ঠাণ্ডা প্রকৃতির মানুষ।

অবশেষে অনেক চেষ্টায় বললে, 'রাখুন, ভাড়া আমি দিয়ে দিচ্ছি।'

তনুর মা ভেতরে আসতে আসতে বললে, 'সমস্যা মিটে গেছে। এক টাকার নোট আজকাল সহজে পাওয়া যায় না। কি যে হয়েছে! কেমন আছেন আপনি?'

শিব কেমন আছে, একথা বহুদিন কেউ জিজ্ঞেস করেনি। একটু থতমত খেয়ে বললে, 'ভালই আছি।'

মহিলা শিবের মুখের দিকে এক পলক তাকিয়ে বললে, 'সেরকম তো মনে হচ্ছে না। পায়ে ব্যাণ্ডেজ কেন?'

'ব্যাণ্ডেজ? ও হ্যাঁ ব্যাণ্ডেজ। কাঁচে কেটে গেছে। আপনি কেমন আছেন? ভালো তো?'

'ধরে নিন ভালই আছি।'

বারান্দায় উঠে এসে মহিলা কৃষ্ণর সামনে দাঁড়িয়ে বললে, 'দাদা না ! কত দিন পরে দেখা হল ! আপনি ঠিক সেই রকমই আছেন। কোনও পরিবর্তন হয়নি। এভার ইয়াং। এভার ব্রাইট।'

মহিলা চাকা-লাগান স্যুটকেস হিড় হিড় করে টানতে টানতে ভেতরের ঘরের দিকে এগোচ্ছে। কৃষ্ণ বললে, 'তনু কিন্তু নেই। এখানে আর থাকে না।'

মহিলা বললে, 'জানি।'

কৃষ্ণ ফিসফিস করে শিবকে বললে, 'তখন থেকে বলছি, দাড়িটা কামা। দাড়িটা কামা। দাড়ি না কামালে বিশ্রী অসুস্থ, অসুস্থ, অশৌচ অশৌচ দেখায়।'

শিব হেসে বললে, 'এই বয়েসে আবার বিশ্রী সুন্দর : তিন কাল গিয়ে এক কালে ঠেকেছে। তুমি বোসো। আমি দেখি, ওনার কি চাই না চাই।'

'আমি উঠি এখন। তুই যে কি করবি, আমার মাথায় আসছে না। চা, জলখাবার, দুপুরে রান্না। বউগুলো সব পটাপট মরে গিয়ে এমন বিপদে ফেলে যায় ! একটু চিন্তাভাবনা করে না। ফিরে তাকাবার প্রয়োজন বোধ করে না। মরেই যদি যাবি, তো হাত ধরে সংসার করতে নামিয়েছিলে কেন ? ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন।'

কৃষ্ণ ধীরে ধীরে বারান্দা থেকে নেমে এল বাগানে। 'আরে ব্যাটা। রঙ্গনের ডালে এ কি কাণ্ড ! মৌচাক। আস্ত একটা মৌচাক। মাই গুডনেস। শিবটার কি বরাত ! এমন একটা দুর্লভ জিনিস পেয়ে গেছে।'

কৃষ্ণ হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে। চাকটা আরও বড় হবে। চারপাশে মধু জড়ান মাছি বিনবিন করছে। এক একটা চাক ছেড়ে পোঁ করে উড়ে যাচ্ছে। এক একটা পোঁ করে উড়ে এসে চাকে লেগে যাচ্ছে।

'কি মজা রে ভাই ! একবার হাত দোবো !'

কৃষ্ণ এ-পাশে, ও-পাশে ফিরে তাকাল। কেউ কি দেখছে ! না, এই সামান্য অপরাধের কেউ সাক্ষী থাকবে না। বাগানের কোণে শুকনো পাতার গাদায় সাদা একটা বেড়াল মজাসে ঘুমোচ্ছে। 'বেশ আছে সব। মনের আনন্দে। যত যন্ত্রণা, ঈশ্বর সব ঠেলে দিয়েছেন মানুষের দিকে ! একটু বুদ্ধি যোগ করে, কি বিপদেই না ফেলেছ ভগবান !'

কৃষ্ণ উদাস হয়ে গেল। ধীরে ধীরে এগোতে লাগল গেটের দিকে। 'বুদ্ধি দিয়েছ বেশ করেছ। একটু চৈতন্য দিতে কি হয় ? ধন, দৌলত মানুষের হাতে। সে তো মানুষে মানুষে দেনা-পাওনা। কিন্তু চৈতন্য তো তোমার হাতে ! তুমি বাবা মায়ের বাড়া। এক চিলতে আচার দিলে, তারপর এমন হাত গুটিয়ে নিলে ! সারা দুপুর ঘ্যানঘ্যান করেও হাত গলে আর বেরুলো না। শেষে চড়চাপড়। মায়ের খেলা বোঝা ভার !'

কৃষ্ণ রাস্তায়। লোকে এখনও অবাক হয়ে তাকায়। উপযুক্ত পোশাক পরিয়ে দিলে রাজা। চলনে কি আভিজাত্য ! আজ তিন-চার দিন হল কৃষ্ণর মনে একটা গানের লাইন ঘুরপাক খাচ্ছে : মন্দিরে তোর নাই কো মাধব ॥ শাঁক ফুঁকে গোল করলি পোদো ॥ সেইটাই গুনগুন করতে করতে চলেছে। কোনও দিকে দৃক্‌পাত নেই।

তনুর মা চাকা-লাগানো স্যুটকেসটাকে মেঝেতে উল্টে ফেলে তালা খুলতে খুলতে বললে, 'খুব আশ্চর্য হয়েছেন, তাই না ?'

শিব বললে, 'কেন ?'

'হঠাৎ চলে এলুম। বিনা নোটিসে।'

'তা কেন ? আপনার আসা আমার কাছে আশার আলো। মনে ঝড় বইছে। আপনি এলেন, এবার হয়তো একটু শান্ত হবে।'

'আপনি মনে মনে আমাকে স্মরণ কবছেন, আমি সে সংকেত পেযেছি। ভেতবেব তাব বেজেছে। অমিতাভ আমাকে চিঠি দিযেছে। যাক সেসব কথা পবে হবে। আগে আমি চান কবে আসি। এ-দেশেব ট্রেন-জার্নি ক্রমশ এত কুৎসিত হযে উঠছে। দেশ এগোচ্ছে না পেছচ্ছে। ওভাব-পপ্যুলেশান, ইনডিসিপ্লিন, ম্যাল-অ্যাডমিনিস্ট্রেশান। নাঃ, এদেশে আব বসবাস কবা যাবে না।'

কথা বলতে বলতে স্যুটকেস থেকে একে একে প্রযোজনীয জিনিস বেব কবছে। টুথপেস্ট, ব্রাশ, সাবান, তোযালে, জিভছোলা।

শিব বললে, 'সবই তো ছিল এখানে। শুধু শুধু বোঝা বাড়িযেছেন।'

মহিলা শুনতে পেল না। আগেব প্রসঙ্গই মাথায ঘুবছে, 'সর্বস্তবে দুর্নীতি। কবাপসানে শেষ কবে দিলে। যাদেব ওপব শাসনেব দাযিত্ব তাবা সব ঘুমিযে পড়েছে। এই ডেমোক্রেসি একটা ফাবস। একজন বেনিভোলেন্ট ডিকটেটাব চাই। উঠতে বসতে চাবকাও। ওই মহামানব আসে। আসে আসে কবে আব কতকাল অপেক্ষা কবা যায। যাক গে। যা হচ্ছে হোক। কেটে এসেছে, কি বলেন? আব কদিনই বা বাঁচব? আমায আবাব এক জ্যোতিষী বলেছেন, দীর্ঘ আযু। সেঞ্চুবিও কবে ফেলতে পাবি। কি সর্বনাশ!'

স্যুটকেসেব ডালা খোলাই বইল। তনুব মা চানঘবে ঢুকে গেল। ডালা খোলা স্যুটকেসেব দিকে তাকিযে শিব বসে বইল কিছুক্ষণ। সোনাব হাতঘাড় মিটমিট কবছে। সোনালী চশমা। স্যুটকেসেব ভেতব থেকে মিষ্টি একটা গন্ধ উঠছে।

জীবন-ক্লান্ত শিব। সব উৎসাহ হাবিযে ফেলেছে। কোথাও কখনো থেবড়ে বসলে আব উঠতে ইচ্ছে কবে না। নাঃ, বসে থাকলে চলবে না। উঠতে হবে। দীর্ঘ পথশ্রমে ক্লান্ত। চা কিছু খাবাব। কি দেওযা যায মহিলাকে।

শিব উঠে পড়ল। আচ্ছা দেবী তো অনেক দিন আসেনি। তোতাও আব আসে না। কি হল কি? অসাবধানে কিছু কি বলে ফেলেছে? বযেস হলে মানুষেব যা হয। যাক গে কিছুই আব এখন মনে পড়ছে না। যে আসে আসবে। যে আসবে না আসবে না।

হঠাৎ চানঘবেব দবজা খুলে গেল। তনুব মা গলা বেব কবে বললে, 'আপনি বাথরুমে ঢুকবেন না। আমি আসছি।'

শিব অবাক হযে চান ঘবেব বন্ধ দবজাব দিকে তাকিযে বইল। কি আশ্চর্য! শিবেব ভাবনা মহিলা কি ভাবে পড়ে ফেলল! শিব দেযালে টাঙানো স্ত্রীব ছবিব দিকে তাকিযে বইল কিছুক্ষণ। জীবনে দু'জন মহিলা। পুত্রবধূব কথা ধবছে না। দুজনে দু বকম। স্ত্রী সুধাব তেমন ব্যক্তিত্ব ছিল না। মাটিব তাল। যেমন আকৃতি দেবে। এমন প্রখবা ছিল না সুধা। তনুব মা দীর্ঘাঙ্গী, ধাবালো। অন্যেব ওপব অতি সহজেই প্রভাব বিস্তাব কবতে পাবে। শিব বান্নাঘবে ঢুকে গেল। বড় এলোমেলো হযে আছে। চানঘবে কুলকুল কবে জল বযে যাবাব শব্দ হচ্ছে।

এন এইচ. থার্টিফোব ধবে ছোট্ট একটা গাড়ি চলেছে ফুবফুব কবে। মবিস এইট। এই ধবনেব গাড়ি আজকাল তেমন দেখা যায না। চালক বড় ক্লান্ত। কপালে ঝুলে এসেছে এলোমেলো চুল। বাতাসে এ পাশ ও পাশ কবছে। জলো হাতঘাড়ব দিকে তাকাল। বেলা এগাবোটা। বিকেলেব মধ্যেই শিলিগুড়ি পৌঁছে যাবে। সেখানে শর্মাব গ্যাবাজে গাড়ি বেখে যে কোনও একটা হোটেলে উঠবে।

পাঁচ কিলোমিটাব যাবাব পবই জোলোব প্ল্যান বদলে গেল। শর্মাব গ্যাবেজে গাড়ি বাখবে না। সে যে শিলিগুড়ি এসেছে কাকব না জানাই ভালো। ববং আব একটু কষ্ট কবে সে দার্জিলিং চলে যাবে। সেখানেই কোনও অখ্যাত হোটেলে উঠবে। তিনজন লোকেব সঙ্গে তাব বোঝাপড়া ছিল। একজন পবেশ সাহা। তাব সঙ্গে বোঝাপড়া শেষ। আসাব দিন বাতে সাহাব

গুদামে বেশ জমিয়ে আগুন ধরিয়ে এসেছে। মাখোমাখো করে। চোরাই টায়ার আর তেল। সব শেষ। ইনসিউর করা ছিল না। সাহাকে আবার উঠতে হলে অনেক স্টিম চাই। তার আগে কেস সামলাক। জলোর কাঁধে পা রেখে টঙে উঠেছিল। তারপর জলোকেই ফিনিশ করার তালে ছিল। সাধারণ মানুষ জানে না। তলে তলে মাফিয়া রাজত্ব দেশ ছেয়ে ফেলেছে। মানুষ কাটা আজকাল পাঁউরুটি কাটার মতো। ধরো আর ছুরি চালাও। পরেশচন্দ্র সাহা। এম· এ পাশ নাচিয়ে মেয়ে বিয়ে করেছে। এইবার নাচ দ্যাখো পরেশচন্দ্র। জলোকে ছেড়ে ভোলাকে ধরেছিলে! এইবার ভোলেবাবা তোমাকে পার লাগাবে!

সুনীত বোস, তুমি দার্জিলিঙে কমলালেবুর রস খাচ্ছ। খাও। কিন্তু মানুষ অমর নয়! কিছু কিছু দেনাপাওনা থাকে, জীবন দিয়ে শোধ করতে হয়। প্রতিশোধ সঙ্গে সঙ্গে নিতে নেই। প্রথমে শত্রুকে আলগা দিতে হয়। এক বছর, দু'বছর, তিন বছর। যখন সে প্রায় ভুলেই গেছে, হাসছে, খেলছে, খাচ্ছে–দাচ্ছে, দেহসুখ ভোগ করছে, ঠিক সেই সময় অদৃশ্য গর্ত থেকে নিয়তির মতো বেরিয়ে আসবে কেউটে। একেবারে শিরে ছোবল! সুনীত বোস, কার যে কখন দিন শেষ হয়!

জলো একটা সিগারেট ধরাল। উপন্যাসের যেমন অধ্যায় থাকে, এক একটা চ্যাপটার শেষ হয়ে আর একটা শুরু হয়, জীবনও তাই। অতীতটাকে টেনে এনে বর্তমানের কোনও একটা জায়গায় খতম করে দিতে হয়। আবার সময় চলতে থাকে অতীতের দিকে। হাইওয়ের সামনে আছে, পেছন আছে। সময়ের পথের সামনেটাই আছে। পেছনটা পড়ে আছে অতল খাদে।

জলো অ্যাকসিলারেটারে চাপ দিল। গাড়ির গতি বাড়ল। বাঃ রে বাঘের বাচ্চা! যন্ত্রকে যত্ন করলে সহজে বিশ্বাসঘাতকতা করে না। যন্ত্র তো মানুষ নয়! হঠাৎ দাদা- বউদির কথা মনে পড়ছে। ধাপ্পা দিয়ে পালিয়ে এসেছে। উপায় ছিল না। অতীতটাকে সম্পূর্ণ মুছে ফেলতে না পারলে নতুন ভাগ্য তৈরি করা যায় না। শিব-মাস্টারমশাই ক্লাসে পড়াতে পড়াতে প্রায়ই বলতেন, বেরি দি পাস্ট। অতীতটাকে কবরে পাঠাবার কফিন চাই। তিনটে মানুষ সেই কফিন। তিনটে মানুষকে সরাতে পারলেই অতীত মুছে যাবে। যেমন বলে না, রাতটা পার করে দিতে পারলেই ভোর হয়ে যাবে!

সিগারেটে শেষ টান মেরে জলো ছুঁড়ে ফেলে দিল। রোদের আঁচলে প্রকৃতি কাঁপছে। প্রাণহীন, নির্দয় পিচের রাস্তা মাইলের পর মাইল খুলেই চলেছে। কড়া সবুজপাতা রোদে ক্লান্ত হয়ে অধোমুখ। মাইলের পর মাইল ফাঁকা জমি। কখনও কখনও জঙ্গল, আসছে আর ছুটতে না পেরে পিছিয়ে পড়ছে। হঠাৎ বাঁ-পাশে একটা সুন্দর শীতল দীঘি ভেসে উঠল। ভাঙা পাঁচিল। অতীত সৌধের জীর্ণ কঙ্কাল হাহা করছে। একটা দুটো চুনবালি খসা পিলার অনমনীয় চরিত্রের বিশাল মানুষের মতো শূন্যতায় সঙ্গীহীন।

বেশ ছায়াছায়া মনোরম। জলো রাস্তার একেবারে বাঁদিক ঘেঁষে গাড়ি থামাল। দীঘি আর ভাঙা ঘাট বড় টানছে। সুন্দর এক অতীত যেন বসে আছে ওখানে উদাস শিশুর মত। জলে ছোট ছোট যে তরঙ্গ খেলছে তা যেন ওই শিশুটির ছোঁড়া ছোট ছোট ঢিলের আঘাতে। একটা পাখি কোন ঘুপচিতে বসে আপনমনে মন-কেমন-করান শিস দিয়ে চলেছে এক টানা।

জলো দীঘির ভাঙা ঘাটে ছায়া দেখে বসল। স্থির জলে গাছের ছায়া নেমেছে স্নানে। চারপাশে যেন অতীতের নেশা ঝিমঝিম করছে। কতকাল আগে, কাদের বসবাস ছিল এখানে! ইতিহাসে তো সাধারণ মানুষের স্থান থাকে না। থাকলে জানা যেত। নদীর মতো জনপদ কেন সরে গেল এখান থেকে? বাড়িটা বেশ বড়ই ছিল। যাঁরা বাস করতেন তাঁদের বিত্ত, প্রতিপত্তি অবশ্যই ছিল। তারপর যা হয়। বুদবুদ ফেটে যায়।

আলো, ছায়া, ছায়া, আলো। দিন শেষের খেলা চলেছে চারপাশে। ছোট্ট একটা ঢিল তুলে জলের দিকে ছুঁড়ে দিল। তরঙ্গের বৃত্ত ঘুরে ঘুরে পারের দিকে চলেছে। মাথার ওপর অচেনা

আকাশ। মন বসে না। ফিরে ফিরে আসে।

হঠাৎ বউদির কথা মনে পড়ছে। সে এখন কি করছে ? দাদা কি আজ অফিসে গেছে ? দাদা অফিসে গেলে বউদি একা আছে। পোড়ো বাড়িতে হলুদ একটা শাড়ি পরে এ-ঘর ও-ঘর করছে। আর তা না হলে শুয়ে আছে। বউদির মন নিশ্চয়ই খুব খারাপ। কী আশ্চর্য ব্যাপার ! এই এত বড় পৃথিবী, এত যেখানে আকর্ষণ, সেইখানে, এই একটা বিন্দুর মত মানুষ, বসে আছে দীঘির পারে, আর বহুদূরে বিন্দুর মতো আর একটা মানুষ বসে আছে পোড়ো বাড়ির একটা ঘরে। ভাবের সুতোয় বাঁধা। এইটাই তাদের জগৎ। বাইরেটা অচেনা। কোন্ ঘুড়ি কার হাতের সুতোয় উড়ছে জানা নেই। অচেনা আকাশে হারিয়ে না যাবার এই তো বাঁধন ! জলোর মনে হল সুতো ধরে একবার টান মারে ! বউদি নড়ে উঠুক। জানা জগতে এমন কোনও কাঁচি নেই, যা দিয়ে এই বাঁধন কাটা যায় !

জলো জলের কিনারায় নেমে গেল। ইচ্ছে, মুখে চোখে একটু জলের ঝাপট মারবে। অস্ফুটে মন্ত্র উচ্চারণের মতো সিপসিপ শব্দ হচ্ছে। ছোট ছোট গেঁড়ি আর গুগলি শুয়ে আছে শীতল আরামে। জলে নিজের মুখের প্রতিবিম্ব। সেইদিকে তাকিয়ে আরও মন কেমন করে উঠল। বউদিকে ছেড়ে একা এই পৃথিবীতে থাকবে কি করে ! দিন যদিও কাটে, রাতে হুহু করে ভেতরটা। জোরে আগুন জ্বললে যেরকম শব্দ হয় সেইরকম শব্দ হয় ভেতরে।

‘বড় দুর্বল আমি। আমার দ্বারা বড় কিছু হবে না। উঠোনের পাশে সাঁঝবেলার কৃষ্ণকলি, নয়নতারা। লতানে লাউগাছে পাতার ক্ষীর-ক্ষীর গন্ধ। তারা-ফোটা আকাশ। আমার বউদি, আমার দাদা, ছোট ছোট আনন্দ। দুঃখ সুখ। এই আমার জগৎ। এইখানে এসেছি। এইখান থেকেই চলে যেতে চাই। এইসব গেঁড়ি আর গুগলির শীতল শান্তি, জলে-ঘেরা ছোট্ট পরিসর, ফিসফিস কথা, পাশফেরা আপনমনে। আর কিছু কেন চাই ?’

গাড়ির মুখ ঘুরিয়ে ঊর্ধ্বশ্বাসে কলকাতামুখো হবার ইচ্ছে হল জলোর। দীঘির বাতাসে গরম আব ঠাণ্ডার আমেজ। ঘুম নামছে চোখে। জলোর চোখে জল এসে গেল।

তেড়ে উঠে পড়ল। নিয়তি কাজ করছে। যে পথে যেতে চায় যেতে পারে না। যে পথে ফিরতে চায় ফেরা যায় না। গলায় দড়ি বাঁধা পশু। অদৃশ্য হাত টানতে টানতে যেদিকে নিয়ে যায়।

জলোর মবিস এইট আবার ছুটতে শুরু করল। উত্তরমুখো। সূর্যাস্তের আকাশ আগুনে লাল



॥ বত্রিশ ॥

শিবের বাড়ির পেছনের বাবান্দা। পশ্চিম আকাশে বিদায়ী সূর্যের শেষ লাল সঙ্কেত। গাছের পাতা যেন অসংখ্য কালো কালো টিপ। ঝিরি ঝিরি কাঁপছে। সেন্টার টেবিলে সুদৃশ্য পটে ভিজছে সুগন্ধী দার্জিলিং চা। তনুর মা সুপ্রভা আর শিব মুখোমুখি।

খাটো ফুরফুরে চুলে আঙুল চালাতে চালাতে সুপ্রভা মাপা একটা হাই তুলল।

‘খুব ঘুমিয়েছি। ডিপ স্লিপ। বেশ ঝরঝরে লাগছে।’

চিনির পটে চামচে গুঁজতে গুঁজতে সুপ্রভা বললে, ‘ক’ চামচে ?’

'দু চামচে দিন।'

পটের ঢাকনা খুলে চামচে গোলাতেই হাল্কা মিষ্টি চায়ের গন্ধ ভুর ভুর করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে শিবের মনে পড়ে গেল অতীতের কথা। যেন শীতে সপরিবারে বেড়াতে গেছে সাঁওতাল পরগণা। হলুদ রঙের একটা ভিলা। পেছনের বারান্দা। সামনে বাগান। গোলাপের জলসা। শিব, কৃষ্ণ, সুধা, কুমকুম। অমিতাভ সবে হামা দিতে শিখেছে। বউদির তখন সুস্থ অবস্থা। দূরে ত্রিকূট ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসছে। বিপিন মালী বাগানের বেদীতে বসে লণ্ঠনের কাঁচ পরিষ্কার করছে। ইঁদারায় বিপিনের বউ জল তুলছে বাবুদের জন্যে। লাটাখাম্বা কাঁদছে। পাহাড়ের দিক থেকে শীত আসছে হিল হিল করে। এসব তো মিথ্যে নয়। হয়েছিল একদিন। সুখের নাটকের একটি দৃশ্য। চলমান ক্যামেরায় ধরা থাকলে আজও পর্দার বুকে সচল, শব্দময় ছায়া দেখা যেত।

'নিন, চা খান। কি ভাবছেন অত।'

'না, কিছু না। অমিত কি লিখেছে চিঠিতে!'

'লিখেছে, আপনার মেয়ে সন্তানসম্ভবা। এখানে এসে আপনাকে থাকতে হবে। আমি অফিসের কাজে ভারতের বাইরে চলে যাচ্ছি। কবে ফিরব জানি না।'

'যাচ্ছে কোথায়?'

'সুইডেন।

আমি তো কিছুই জানি না। এখান থেকে চলে গেছে নতুন অ্যাপার্টমেন্ট পেয়েছে। তনুর ছেলেমেয়ে হবে। কিছুই জানি না। ওদের ওখানে যাবার আগে সোজা আপনার কাছে। মেয়ে-জামাইয়ের সংসারে আয়া হয়ে থাকা সম্ভব নয় আমার পক্ষে। আমি তনুকে নিয়ে যাবো আমার ওখানে। পুনেতে। অসম্ভব ভাল জায়গা। ভালো হাসপাতাল। ভালো ডাক্তার। আপনার সমর্থন আছে তো?'

'আমার সমর্থন? আমি একটু সরে আসতে বাধ্য হয়েছি। ওদের ব্যাপারে আমার কোনও মতামত নেই। আপনি এসে গেছেন। যা ভাল বুঝবেন, যাতে ভাল হয় তাই করবেন।'

'তনু কি আপনার অসম্মানজনক কিছু করেছে?'

'তনুর কোনও তুলনা হয় না। সে যে আপনার মেয়ে। গোলমাল আমার ছেলেটিকে নিয়ে। লেস সেড দি বেটার। আপনি অন্য প্রসঙ্গ করুন। ছেলে বড় হয়ে গেলে, প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেলে বন্ধন এই ভাবেই ছিঁড়ে যায়। পৃথিবীর নিয়ম। উল্টোটা ব্যতিক্রম।'

'আমি তনুকে নিয়েই যাব। পাঁচ-সাত বছর একভাবে পড়ে আছে।'

'আপনি কবে যাবেন ওখানে?'

'ভাবছি কাল সকালে যাব। এমন সময়ে যাব, যে সময় অমিতাভ বেরিয়ে যাবে। তনুর সঙ্গে আগে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই। আমি আপনাকেও নিয়ে যাব।'

'আমাকে? না না, আমাকে আর জড়াবেন না। পৃথিবীটা বিশেষ সুবিধের জায়গা নয়। এত ঘোর-পাঁচ। আমার আর ভালো লাগে না।'

'মানুষ নিয়েই পৃথিবী। আমরাও সেই মানুষের মধ্যেই পড়ি। আমরা আমাদের মত চলব। কে কি বললে, কে কি ভাবলে, বয়েই গেল।'

'নিজের ছেলেকেই সব চেয়ে বড় ভয়। বড় বিশ্রী মন নিয়ে এসেছে।'

'তার মানে!'

'আপনি অন্য প্রসঙ্গ করুন। পরচর্চা হয়ে যাচ্ছে।' কৃষ্ণর গলা শোনা গেল, 'কই রে, কোথায় সব গেলি? সাড়া শব্দ নেই।'

'পেছনের বারান্দায় চলে এস দাদা। চা খাবে এস।'

'আমার চা করেছিস? আমার কথা তোর মনে আছে?'

'তুমি ঘড়িটা দেখ। আমার চা তৈরি আর তোমার আসা যেন অঙ্কের মিল।' সুপ্রভা উঠে দাঁড়িয়ে, তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার এগিয়ে দিতে দিতে বললে, 'বসুন দাদা। বসুন।'

'তুমি তো একেবারে আলো করে আছ! তোমার পাশটিতে বসি। যদি একটু আলোকিত হওয়া যায়। অন্ধকার ঘনিয়ে আসছে ধীরে।'

'কি যে বলেন দাদা! ক'চামচে ?'

'কি ক'চামচে ?'

'চায়ের চিনি ?'

'চামচে দুই দাও। দুধ দিও না।'

শিব বললে, 'দুপুরে খুব ঘুমোলে ?'

'আরে, না রে, বেশ শুয়ে আছি। মিঠে ঘুম আসছে। হঠাৎ একটা বাচ্চা মেয়ের গলা, কই ছবিদাদু, তুমি আমায় ছবি এঁকে দিলে না ? ধড়মড় করে উঠে বসলুম। কেউ কোথাও নেই। কুমু খিলখিল হাসছে। আশ্চর্য ব্যাপার! কুমুই যদি বলে থাকে, জানল কি করে, তোতা আমায় ছবি আঁকতে বলেছিল। পৃথিবীর গোপন রহস্যে একবার যদি ঢুকতে পারতুম রে শিব। কি যে কোথায় হয়ে আছে!'

'আবার শুয়ে পড়লে ?'

'পাগল! বহু দিন পরে রঙ তুলি নিয়ে বসলুম। বসলে কি হবে, কুমুর বায়না শুরু হল। আমাকে গান শোনাও। নাম গান করো। সারাটা দুপুর হরেকৃষ্ণ, হরে রাম করে কেটে গেল।'

সুপ্রভা বললে, 'বাঃ। বেশ ভালই কাটল তাহলে।'

'তোমরা কি করলে ?'

আমি খুব ঘুমোলুম, আর বেয়াইমশাই লেখাপড়া করে কাটিয়ে দিলেন।'

'বাঃ। তাই এত ফ্রেশ দেখাচ্ছে তোমাকে!'

'আপনারা গল্প করুন, আমি একটু জলখাবার তৈরি করি।'

'কি করবে ?'

'ভাবছি পাকোড়া করব।'

'একেবারে, একেবারে সঠিক পড়ে ফেলেছ আমার মনের ইচ্ছে। চল শিব আমরা তাহলে বসি একটু। দাবা তা না হলে রাগ করবে।'

'চলো। হয়ে যাক এক দান।'

অন্ধকার নেমে গেছে। জলোর মরিস-এইট শিলিগুড়ি ঢুকলো। অসম্ভব জ্যাম। ইঞ্চি ইঞ্চি করে গাড়ি এগোচ্ছে। শিলিগুড়িতে সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে সোজা পাহাড়। শিলিগুড়িতে পড়ে থেকে লাভ নেই। শর্মার সঙ্গে দেখা করেও লাভ নেই। ব্যাটা স্মাগলার।

স্টিয়ারিংএ জলোর হাত খেলে ভাল। পাশ কাটিয়ে, পাশ কাটিয়ে ব্রিজের প্রায় শেষে এসে গেছে; আর একটু এগোলেই জট ছেড়ে যাবে। রাতটা এখানের কোনও হোটেলে কাটালেও হয়। এই গাড়ি নিয়ে রাতে পাহাড়ে ওঠা যাবে কি ? ফগলাইট নেই। হ্যাণ্ডব্রেক নেই।

জলো প্রাচী হোটেলের সামনে গাড়ি রেখে ভেতরে ঢুকলো। গরম একটু নরম হয়েছে। চোখ বুজিয়ে ভবিষ্যতটা একবার ভেবে নিল। ভবিষ্যতের বদলে ভেসে উঠল কলকাতার বাড়ি। উঠোন। দালান। বউদি। তাড়াতাড়ি চোখ খুলে ফেলল। বউদির চেহারা সামনে এলেই দুর্বল হয়ে পড়ছে। এ সময় দুর্বল হওয়া চলবে না। চরম অমানুষ হয়ে তারপর মানুষ হতে হবে। জলোর শেষ খেলা। দুটো শয়তানকে শেষ করে ছুটি।

'বাবুকে দোতলার তের নম্বর ঘরে নিয়ে যাও।'

'তেরো ?'

'কেন, আনলাকি থার্টিন বলে ভয় পাচ্ছেন ?'

'অনেকটা তাই। ভাগ্যের সন্ধানে বেরিয়েছি!'

'তাহলে তিনতলার সাতাশে নিয়ে যাও।'

'বাঃ চমৎকার ঘব। দক্ষিণাও কম নয়।' জানালার সব পর্দা টেনে টেনে সরিয়ে দিল একপাশে। এখন একটু আকাশ চাই।

'চা, কফি কিছু চাই?'

'চা আনো। গরম পাকোড়া পাওয়া যাবে?'

'যাবে।'

'নিয়ে এসো।'

কৃষ্ণ পাকোড়ায় কামড় মেরে বললে, 'উত্তম, অতি উত্তম! সুপ্রভা, তোমার হাতটি একেবারে শিল্পীর হাত। হ্যাঁ গা নাম ধরে ডাকলুম বলে অসন্তুষ্ট হওনি তো।'

'আমি তো আপনাকে দাদাই বলি।'

'আর বুঝলে কি না, আপন করে নিয়ে বেঁচে থাকতে ভালই যে লাগে। একা একা বাঁচা যায়! বলো? আমরা তো বড়লোক নই গো, যে অহঙ্কার নিয়ে টঙে উঠে গুম মেরে বসে থাকবো! শিবের ঝাল লেগেছে। লঙ্কা চিবিয়েছিস?'

'মনে হচ্ছে।'

'খা খা ঝাল খা। বুদ্ধি খুলবে। দেখিস চাল এলোমেলো করিসনি। জীবনের চালে আমরা অনেক ভুল করে বসে আছি। দাবার চালে ভুল করিসনি। হ্যাঁ গো, তোমার কই? আমরা দু'জনেই তো সব সাবড়ে দিলুম। আর এক রাউণ্ড চা খাওযাবে তো?'

'নিশ্চয়।'

'আচ্ছা শিব, কুমু শেষ রান্না কত বছর আগে করেছে? সেই আমরা সব একসঙ্গে বসে খেলুম।'

'তা ধরো, দশ-বারো বছব তো হবেই।'

'পাগলামির লক্ষণটা কি ছিল বল তো? যাকগে ওসব কথা আলোচনা না করাই ভাল। জীবন যখন যে ভোগ সামনে এগিয়ে দেবে হাসিমুখে গ্রহণ করো। কি বলো সুপ্রভা! তুমি তো জ্ঞানী। সাধিকা। সদ্‌গুরু আশ্রিতা।'

'লজ্জা দেবেন না।'

'আরে না না, আমার কাছে তোমার লজ্জা কিসের! ভীষণ একটা ইচ্ছে হচ্ছে। তোমরা কিছু মনে করবে?'

'বলুন না!'

'আমাকে তুমি অনেক দিয়েছ। অঢেল দিয়েছ। খান চারেক চট করে কুমুকে খাইয়ে আসবো! একসময় এই সব ভাজাভুজি খেতে ভীষণ ভালবাসত। এখন কে-ই বা করে দেয!'

'ওগুলো আপনি খান। আমার ওখানে আরও আছে। দাদা আমি নিয়ে যাব। আপনি বসুন না।'

'তুমি পারবে না গো! এমন আদুরী, একটু একটু করে আমি খাইয়ে না দিলে সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেবে। এখন ও যেন আমার মেয়ে। পাগলী মেয়ে। শিব, চাল এলোমেলো করবি না। আমি আসছি। এখুনি এসে যাব বুঝলি!'

'ওগুলো আপনি খেয়ে নিন। আমি গরম ভেজে আনছি।'

'আমার জন্যে গোটা চারেক রাখো। এসে খাবো। অতি উত্তম হয়েছে। পুরস্কার একটা ছবি।' বয়েসের তুলনায় কৃষ্ণ অনেক সক্ষম। ছফুট লম্বা মানুষটা খাড়া হেঁটে চলে গেল। শিব বললে, 'এমন ভালবাসা দেখা যায় না। আমি অন্তত দেখিনি।'

'শিল্পীর পক্ষেই সম্ভব। উনি ফিরে এলে চা চাপাব, কেমন। আপনি বসুন। আমি গোটা কয়েক কাজ সেরে আসি।'

'নিশ্চয় রান্না!'

'আমার রাঁধতে আর খাওয়াতে ভীষণ ভালো লাগে।'

'আপনার মানসিকতার মানুষ ক্রমশ কমে আসছে।'

'তা হয়তো আসছে। তবে মানুষের মধ্যে অন্য সব নতুন নতুন গুণও ফুটছে। দৈহিক ক্রমবিবর্তন তো আর সম্ভব নয়, এখন যা হবে সব মানসিক। বসুন আপনি। আমি আসছি।'

সামনে দাবার ছক। সাদা,কালো ঘুটি,মুখোমুখি। বিবদমান। প্লেটে গোটা দুই পাকোড়া। শিব হাসছে। মেঘলা ভবিষ্যতে হঠাৎ একদিনের রোদ উঠেছে ঝলমলে। যা আসে! যেভাবে আসে! দয়ার দান। প্রত্যাশা নিয়ে বেঁচে থাকার বয়েস চলে গেছে। চলুক, এই ভাবেই চলুক।

কৃষ্ণ দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে ডাকলে, 'কই গো, কুমুরানী! লুকোলে কোথায়!'

দরজার পাশে লুকিয়ে ছিল কুমু। খিল খিল হেসে বেরিয়ে এল। এই হাসি শুনলে কৃষ্ণর কেমন যেন ভয় লাগে। নিয়তির হাসির মতো।

'ওরে দুষ্টু মেয়ে। নাও, বোসো এই চেয়ারে।' কৃষ্ণ কুমুকে চেয়ারে চেপে বসিয়ে দিল। 'খাবে নাকি? তোমার প্রিয় জিনিস? গন্ধ পাচ্ছ?' কৃষ্ণ স্বাভাবিক ভাবেই সব কথা বলে। বুঝুক আর না বুঝুক। কিছু তো বোঝেই। মানুষ কেন, কি ভাবে পাগল হয়! পাগল হলে মনটা কোথায় যায়! হয়তো গবেষণা হয়েছে, আরো হবে, কৃষ্ণর কিছুই জানা নেই।

নাও, হাঁ করো।' কুমুর মুখে আধখানা পাকোড়া ভরে দিল।

'কেমন লাগছে গো?'

কুমু পাখির ছানার মতো হাঁ কবল। পাগলদের বয়স বাড়ে না। বরং কমতে থাকে। কুমুকে অসম্ভব সুন্দর দেখতে হয়েছে। তেলা চকচকে ত্বক। গৌরবর্ণ। ঠোঁট দুটো লাল টুকটুকে। কৃষ্ণ আর আধখানা ভরে দিল মুখে। কুমু ডান হাত দিয়ে কৃষ্ণর গলা জড়িয়ে ধরল। কৃষ্ণর সেই এক চিন্তা. কে আগে যায়! কৃষ্ণ আগে গেলে কুমুর কি হবে! আর আধখানা ভরে দিল কুমুর মুখে।

'তোমাকে একদিন রাবড়ি খাওয়াতে হবে। সাত্যকিটা দুম করে মারা গেল। তা না হলে ছবিগুলো সব বিক্রি হয়ে যেত! কিছু টাকার খুব প্রয়োজন। টানাটানি করে বাঁচা যায় না।'

কুমু মুখের একটা শব্দ করল।

'কি হল গো?'

'জল। জল দাও। আমি জল খাব।'

স্নানের পর বেশ আরাম লাগছে।

কোমরে হোটেলের দেওয়া বিশাল তোয়ালে জড়িয়ে, পরিষ্কার ধবধবে বিছানায় জলো শুয়ে আছে চিত হয়ে। পাখা ঘুরছে ফন্‌ফন্‌ করে। সোজা হাওয়া এসে পড়ছে ভুঁড়ির ওপর। ভীষণ একা মনে হচ্ছে নিজেকে। সৎই হোক আর অসৎই হোক, মানুষ সঙ্গী চায়। স্নেহ চায়। ভালবাসা চায়। মানুষ তো আর গাছ নয়। গাছ হল যোগী। ধুধু ফাঁকা মাঠ। একটি মাত্র গাছ। একা দাঁড়িয়ে আছে শাখাপ্রশাখা বিস্তার করে। গাছ তোমার বয়েস কত? বলবে হয়তো একশো বছর। এক একটা গাছ যেন ইতিহাস! কত দেখেছে! কত শুনেছে! কত সয়েছে!

জলো উঠে পড়ল। আর সময় হবে না। 'বউদিকে চিঠিটা লিখেই ফেলি।'

টেবিলে হোটেলের প্যাড। ল্যাম্পটা জ্বেলে জলো চেয়ারে বসে পড়ল।—

শ্রদ্ধেয়া বউদি,

যেখানে যাচ্ছি, সেখানেই তুমি। আশ্চর্য,দাদাকে তেমন মনে পড়ছে না। কেন বলো তো! তুমি যে আমার মা। কত রাত আমার, তোমার কোলের কাছে শুয়ে কেটেছে। লোকে অন্য মানে করবে। একমাত্র তুমিই আমাকে জানো আর আমিই তোমাকে জানি। তবে এও জেনো, আমার দাদার মতো স্বামী তুমি জীবনে পাবে না। অভিমানী রামচন্দ্র। আর আমি তোমার দেবর লক্ষ্মণ। তুমি তো জননী সীতা। লোকের কথায় কান দিও না বউদি। আমাদের দুঃখ-সুখ আমাদেরই। আমরা বাঁচি মরি কারুর কিছু যায় আসে না। অন্যের সঙ্গে সব সম্পর্কই স্বার্থের সম্পর্ক। চুকেবুকে গেলে কেউ কারুর খোঁজ রাখে না।

তুমি আমার ওপর রাগ কোরো না ভাই। আমি চলে না এলে যে কোনও দিন মারা পড়তুম। এখনও যে বাঁচব, এমন কথা জোর করে বলতে পারি না। তবে আমার ভীষণ বাঁচার ইচ্ছে। তোমাদের সঙ্গে একসঙ্গে হেসে কেঁদে বাঁচতে চাই। আমার ভাগ্যকে আমি অবশ্য তেমন বিশ্বাস করি না। জীবনের প্রথমদিকের ভুল পরেরদিকে আর শোধরান যায় না। জীবনের ফাঁদ বড় মারাত্মক। বউদি তুমি আমার মায়ের মতো। আমার জন্যে তুমি প্রার্থনা কোরো। আমার যা পরিকল্পনা তা যদি সফল হয়, তাহলে জানবে বাকি জীবন আমরা তিনজন রাজার মতো বাঁচব। আর যদি সব ভেস্তে যায়, তাহলে আমি তোমার ছেলে হয়ে জন্মাব। তোমাকে জড়িয়ে ধরে তোমার বুকের কাছে শুয়ে থাকব বর্ষার রাতে। দাদা আমার বাবাই। তুমি আমার বাবাকে দেখনি। ঠিক দাদার মতই দেখতে ছিলেন। আর একটু ফর্সা, আরও স্বাস্থ্যবান। দাদাকে দাদার ওই হীন চাকরিটা ছাড়াতে হবে। ওতে মন ছোট হয়ে যায়। দাদা বড় উদাসী। তা না হলে আজ কোথায় উঠতে পারত। তুমি দাদার ঘুম ভাঙাও।

এইবার কিছু কাজের কথা লিখি—

আমার বিছানার তলায় ব্যাঙ্কের একটা পাশ বই পাবে তোমার নামে। কিছু টাকা জমিয়েছি। দরকার মতো খরচ কোরো। সৎ রোজগার। বেশ কিছু টাকা ফিক্সড করা আছে। আর এক বছর পরে তুলতে পারবে। ওই টাকায় বাড়িটা নতুন কোরো। ধরো আমি যদি ফিরতে পারি, তখন গিয়ে যেন দেখি ঝকঝকে তকতকে ছবির মতো একটা বাড়ি।

আমার কাছে কেউ কিছু পাবে না। যদি চাইতে আসে ভাগিয়ে দেবে। পুলিস যদি আমার খোঁজ করে, বলবে জানি না। বলবে হাওয়া হয়ে গেছে।

স্বরূপানন্দ আশ্রমে প্রত্যেক মাসে পঞ্চাশটা করে টাকা প্রণামী পাঠাতুম। পারলে পাঠিয়ে দিও। রোজ অতিথি সেবা হয় তো। বেশ খরচ।

আমার আর একটা অনুরোধ—দেবীদির মেয়ে তোতাকে তুমি এক জোড়া পায়জোড় গড়িয়ে দিও। দেবীর মেয়ে প্রকৃতই দেবী। আর তুমি! তুমি সব সময় সুন্দর হয়ে থাকবে সেজে-গুজে। কপালে টিপ পরবে বড় করে। ভোরের সূর্যের মতো। আর তোমার সেই বিখ্যাত আমের আচার তৈরি করে রাখবে। হঠাৎ কোনও দিন দুপুরে আমি তো ফিরেও আসতে পারি।

সাবধানে থেকো বউদি। দাদাকে খুব ভালবাসবে। আমাদের বাড়িটা আবার আমাদের সেই ছেলেবেলার মতো হয়ে যাবে। ঘরে ঘরে আলো জ্বলবে। হাসি খুশি গান। সব হবে। তুমি ভেবো না। সময় কি শুধু সামনে চলে—পেছনেও চলে। তুমি আমার প্রণাম নিও। তোমার পা দুটো আমার চোখের সামনে ভাসছে। দাদাকে আমার প্রণাম দিও।—ইতি তোমার জলো।

চিঠি শেষ করে জলো কলিংবেলের দিকে হাত বাড়াল। ডাক টিকিট লাগানো একটা খাম চাই। হোটেলে সবই থাকে। বয় এসে দাঁড়াল সামনে। 'একটা খাম আনতে পারো! টিকিট লাগানো। আর খাবার দাও।'

'ঘরেই খাবেন?'

'হ্যাঁ।'

'শুধু খাবার?'

'হ্যাঁ।'

ছেলেটি চলে যেতেই জলো ছেলেমানুষের মতো বিছানায় লাফিয়ে পড়ল ঝপাং করে। মাথার তলায় দুহাত রেখে আবার চিত। বয় এসে টেবিলের ওপর একটা খাম রেখে গেল। সে চলে যেতে না যেতেই অদ্ভুত একটা ভয়ের ভাব এল মনে। শীতল একটা ভীতি।

জলোর মনে হল শিলিগুড়ি জায়গাটা তার পক্ষে মোটেই নিরাপদ নয়। কলকাতার অপরাধ জগতের মাথাটা পড়ে আছে শিলিগুড়িতে। অপরাধী ভাগতে চাইলে পুলিস যেমন সব স্টেশানকে অ্যালার্ট করে দেয়, অপরাধীরাও সেইরকম সব ঘাঁটিকে সজাগ করে দেয়।

জলো উঠে বসল। জলোর ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় খুব সজাগ। এর আগেও সে বহুবার প্রমাণ পেয়েছে। একবারও জানাতে ভুল করেনি। জলো যেন চোখের সামনে সব দেখতে পাচ্ছে। শর্মার গ্যারেজের বাঁপাশে তামাং-এর দোকানে চারটে ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। বেশ 'হাই'। ব্রিজের এ-মুখে ও-মুখে দুটো দুটো চারটে। কলকাতা-শিলিগুড়ি টেলিফোন চালাচালি হচ্ছে।

অনেক টাকার হোম করে এসেছে জলো কলকাতায়। সহজে ছাড়বে! কালীপুজো তো হবেই। নরবলি ছাড়া পুজো হয়! পুজো ছাড়া ডাকাতের ভাগ্য খোলে! জলোর ভেতরটা ক্রমশ টাইট হতে শুরু করেছে। এলানো ভাবটা আর নেই। ভাগ্যিস পরিকল্পনা পরিবর্তন করে এখানে চলে এসেছে। শর্মার গ্যারেজে গেলে এতক্ষণ আর আস্ত থাকতে হত না। কিমা করে তিস্তায় ফেলে দিত। জলোর গাড়িটাও নজরে পড়ার মতো। অ্যামবাসাডার ফিয়াট চোখে পড়ে বলেই চোখ এড়িয়ে যায়। মরিস দেখলেই নজরে পড়বে। অবশ্য সে যে মরিসে আসতে পারে, এখানকার ঘুঘুদের বুঝতে বুঝতেই বেশ কিছুটা সময় চলে যাবে।

নাঃ, রাত গড়াবার আগেই শহর ছাড়তে হবে। বেশ বুঝতে পারছে জাল ক্রমশই গুটিয়ে আসছে চারপাশ থেকে। বোকা একগুঁয়ে হলে মরতে হবে জানোয়ারের মতো। জলো বাঁচতে চায়। জলো জাঙ্গিয়ার ওপর প্যাণ্ট চাপিয়ে নিল। একটা টি শার্ট। সঙ্গে আর কিছু নেই। একেবারে নাঙ্গাবাবা। চুল আঁচড়াবার ধরনটা ইচ্ছে করে পাল্টে নিল।

ঘরের টেবিলে খেতে বসে হঠাৎ মনে হল শেষ আহার না কি। চিন্তাটা ঝেড়ে ফেলল। দুর্বল হলে চলবে না। সেই কোমল, কাঁপা কাঁপা আলোয় দিদিমার গল্প শোনার পৃথিবী হারিয়ে গেছে। এই ঘাতকের পৃথিবীতে বাঘ কি সিংহের মত, নয় সাপের মত বাঁচতে হবে। বাঘ সিংহের সংখ্যা কমে আসছে। সাপের সংখ্যা কমার নয়। অতর্কিতে বিষাক্ত ছোবল। এই হল বাঁচার কৌশল। সাংঘাতিক দিন অতি সাংঘাতিক রাত কিভাবে আসে কিভাবে যায়। মায়ের কোলের কাছে ককিয়ে কেঁদে ওঠে শিশু। স্বামীর আলিঙ্গন থেকে ছিনিয়ে নিয়ে যায় স্ত্রীকে। বাথরুমে পুড়ে মরে স্ত্রী।

অন্যমনস্ক জলো কোনও রকমে খাওয়া শেষ করল। হোটেলের রান্না খাওয়া যায় না। ভীষণ কমার্শিয়াল। বিছানায় আবার চিত হয়ে শুয়ে সিগারেট ধরাল। ঠোঁটের কোণে মুচকি হাসি। প্রবণতা স্বভাব সহজে বদলান যায় না। বিপদের গন্ধে কেমন ধীরে ধীরে পুরনো জলো আবার জেগে উঠছে।

'না, এভাবে হবে না। হিংসায় হিংসারই স্রোত বইবে। পাগলের মত প্রতিশোধ নিতে ছুটছি। কি হবে। একটা কি দুটো লোককে মেরে পৃথিবীর কোনও মঙ্গল হবে না। প্রতিশোধ নেওয়াই হবে। নিজের অহঙ্কার শান্ত হবে। তারপর, ওরা আবার প্রতিশোধ নেবে। এই চলুক। বছরের পর বছর। যুগের পর যুগ।'

জলো পরিস্থিতিটা নতুন আলোতে ভাবতে লাগল। একেবারে বিচ্ছিন্ন হতে হবে। পারবে কিনা জানে না। তবু চেষ্টা করতে হবে। জলো উঠে গিয়ে টেবিলে বসল। টেবিলের ওপর তাড়াতাড়ি দুটো দেশলাই কাঠি ফেলে একটা ক্রশ তৈরি করল। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম। কোনদিকে যাবে? কোন দিকে গেলে ভাল হবে। 'মা, আমাকে তুমি ভালবাসতে। তোমাকে

যখন ভালবাসতে শিখলুম তখন তুমি ছবি হয়ে গেছ। মা তুমি আমাকে বলে দাও কোন দিকে যাব ? টাকা পয়সা চাই না। খুব হয়েছে। নোংরা জিনিস। ডারটি কয়েনস। মানুষকে ভয় দেখিয়ে আর আনন্দ পেতে চাই না। ক্ষমতা ! রাশিয়ারও ক্ষমতা আছে, আমেরিকারও ক্ষমতা আছে। পাঞ্জার লড়াই। হাত আর হেলে না। জোড়া পাঞ্জা ওপরে স্থির। আকচাআকচি। দাঁতে দাঁত। কি হবে ক্ষমতা। মা আমি শান্তি চাই। তোমার ছেলে হতে চাই।'

জলো তাকিয়ে আছে আড়াআড়ি কাঠির দিকে। উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম। হঠাৎ জলোর মনে হল পূব। পূবদিকে গেলেই মঙ্গল হবে। 'তুই পূবদিকে যা জলো'।

'অ্যাপোলো' নার্সিংহোমের সামনে গাড়ি দাঁড় করাতে না করাতেই সাত–আটটা লোক জ্ঞানেশের গাড়ি ঘিরে ফেলল। জ্ঞানেশের পাশে পার্বতী। কি হচ্ছে বোঝার আগেই অকথা, অশ্লীল গালাগাল। প্রথমেই ডাণ্ডা পড়ল গাড়ির সামনের কাঁচে। ঝুরঝুর করে ঝরে পড়ল মিছরির দানার মতো।

জ্ঞানেশ সহজে কাবু হবার ছেলে নয়। মেরে মরো এই তার জীবনের নীতি। দরজাটা আগেই লক করে দিয়েছিল। পার্বতীও কম যায় না। তার দিকের কাঁচ তুলে দিয়ে দরজা লক করে ফেলেছে। জ্ঞানেশ ব্যাপারটা বুঝতে না পারলেও পার্বতী পেরেছে। ওরা তক্কে তক্কে ছিল। পার্বতীকে সহজে হাতছাড়া করতে চায় না। একটা মেয়ের অনেক দাম। সেই দাম দেবার লোকের অভাব নেই।

গাড়ির চালে চাকায় পাশে পেছনে দুমদাম লাঠি পড়ছে। জ্ঞানেশের মুখে একটা ঘুসি পড়েছে। জ্ঞানেশ বিদ্যুৎগতিতে স্টার্ট দিল। সামনে পেছনে গাড়িটাকে বারকতক ঝাঁকানি মারতেই আক্রমণকারীরা একটু দূরে দূরে সরে গেল।

চিৎকার আর গালাগালে জ্ঞানেশ কিছুই আর শুনতে পাচ্ছে না। নাকটা মনে হয় ফেটে গেছে। ঠোঁটের ওপর কি যেন সুড়সুড় করছে। জ্ঞানেশ ব্যাকগিয়ারে যত জোরে পারে পেছনদিকে চালাতে লাগল গাড়ি। বেশ বুঝতে পারছে ছিটকেছাটকে পড়ছে কেউ কেউ। সামনের ভাঙা উইণ্ড স্ক্রিনের দিকে লাঠি উঁচিয়ে তেড়ে আসছে দুজন। বীভৎস মুখ। জ্ঞানেশের মনে হল আব বাঁচার কোনও আশা নেই, তবু শেষ চেষ্টা।

এবার সে এঁকেবেঁকে প্রচণ্ড গতিতে সামনে এগোবে। ইলেকট্রিক হর্ন টিপে জ্ঞানেশ একটু বাঁ, একটু ডান, একটু বাঁ এইভাবে পুরো ডানদিকে কাটিয়ে বাঁদিকের রাস্তা ধরে সোজা ছুটল। পার্বতীব দিকের কাঁচ ভেঙে গেছে। হর্ন আব তীব্র হেডলাইট জ্ঞানেশের দুই হাতিযার।



॥ তেত্রিশ ॥

আহারাদি শেষ। শিব আর সুপ্রভা সামনের বারান্দায়। আকাশে আধখানা চাঁদ। মেঘের ভেলায় ভেসে চলেছে। সাদা সাদা ফুলে গাছ ছেয়ে গেছে। কি সমারোহ ! সুপ্রভা চুলে চিরুনি চালাচ্ছে। ঝাউয়ের পাতায় বাতাস চলার শব্দের মতো শব্দ হচ্ছে।

সুপ্রভা মৃদু গলায় বললে, 'আমার কথা শুনুন। কথা শুনতে হয়। সব সময় নিজের খেয়ালে

চলা উচিত নয়।'

'কার ভরসায় বাড়ি ফেলে যাই ! জীবনের সব সঞ্চয় ঢেলে দিয়েছি এর পেছনে। যক্ষের মত আগলে যাই।'

'এই তো কয়েক পা দূরে দাদা রয়েছেন। তা ছাড়া আপনি বলছিলেন দেবী বলে ওই মেয়েটিকে এ বাড়িতে রাখবেন। তাও তো হতে পারে।'

'সে খুব বুদ্ধিমতী, আত্মাভিমানী মেয়ে। এই বাড়ি নিয়ে আমার সিদ্ধান্তের কথা বলার পর থেকে সেও আসে না, তার মেয়েটাও আসে না। কি জানি কি মানে করলে ! আমি তো সহজ সরল মনে সব কথা বলে ফেলি। হয়তো অন্য রকম মানে করলে। আমারই ভুল হয়েছে। কাছে টানতে চাইলেই কি মানুষ কাছে আসে। নিজের ছেলে-বউই দূরে চলে গেল। আমি আর ভাবতে পারি না।'

'একটা মাস আপনি আমাব কাছে থাকুন। বড় অপূর্ব জায়গা ! শান্ত নিরিবিলি। পাশেই আনন্দময়ী মায়ের আশ্রম। একদিনে আপনার মনের বিষণ্ণতা কেটে যাবে।'

'দেখুন অনেক কিছু ভাবার আছে। তনু আর আমি কাছাকাছি থাকা ঠিক নয়। তনু আমাকে অসম্ভব ভালবাসে। অমিতাভ সেই ভালবাসার কদর্থ করেছে। যার সঙ্গে তনুকে সারা জীবন কাটাতে হবে তার বিরাগভাজন না হওয়াই ভালো। আমি কে ? আমি আর ক'দিন।'

'সকলের সব ভাবনাকে প্রশ্রয় দিলে সংসার স্তব্ধ হয়ে যাবে। জোর বাতাসের ঝাপটায় সব উড়িয়ে দিন। আমাদের ভেতরে আগুন আছে। সেই আগুনে সব পুড়িয়ে ফেলুন। আমরা যত টলব আমাদের তত টলাবে।'

'তা অবশ্য ঠিক।'

'দুষ্ট একটা আবর্তের মধ্যে সংসার পড়ে আছে। এখানে খুঁচিয়ে আনন্দ। কাঁদিয়ে আনন্দ। একজন আর একজনের ওপর চেপে বসতে পেরেছে, এই তার আনন্দ।'

'তা ঠিক। এ তো এক দীর্ঘ কারাবাস ! নিগৃহীত হবার জন্যেই ফিরে ফিরে আসা।'

'আমার একটা ছোট্ট বিলিতি ধরনের কটেজ হয়েছে। চারপাশ সবুজ। বিশাল বিশাল গাছের ছায়া-ঢাকা লম্বা একটা পথ দু'দিকে চলে গেছে। বেড়াতে বেড়াতে আপনি ছোট হতে হতে এক সময় দিগন্তে মিলিয়ে যাবেন। মাঝে মধ্যে ওই রাস্তায় ছবির স্যুটিং হয়। মন্দ লাগে না দেখতে। হিরো ছুটছে। ভিলেন ছুটছে। গাড়ি গাড়িকে তাড়া করছে। ঘোড়া ছুটছে ঘোড়ার পেছনে। একদিকে ভোরের সূর্যোদয়। আর একদিকে সূর্যাস্ত। এ আকাশ, ও আকাশ, মাঝখানে আমরা। চলুন চলুন। মনটাকে একটু ছুটতে দিন। খুলতে দিন।'

'বলছেন ?'

'আমার অনুরোধ। আমি আপনাকে ভীষণ ভালবাসি।'

'আমিও হযতো বাসি।'

'আমি বুঝতে পারি। আপনি জীবনের কাছে হেরে যাচ্ছেন দেখলে সহযোদ্ধা হিসেবে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। কই, আমি তো হেরে যাইনি ! জীবন আপনার চেয়ে আমাকে অনেক বেশি বিপদে ফেলার চেষ্টা করেছে। পারেনি। আমি বাঁচব। আমার মতো বাঁচব। রাজার মতো বাঁচব। ইট খাওয়া কুকুরের মতো কেঁউ কেঁউ করব না.।'

'আপনি প্রভু সীতারামদাস ওঙ্কারনাথজীর ক্ষেপার ঝুলি পড়েছেন ?'

'অন্য লেখা পড়েছি। ক্ষেপার ঝুলি পাইনি বলে পড়া হয়নি।'

'অনেকক্ষণ সঙ্কীর্ণ কথা হল। আসুন এবার একটু বিষয়ান্তরে যাই। একটা অংশ, ছোট্ট একটা অংশ পড়ে শোনাই।'

'এখানে তো আলো নেই।'

'দেখুন না আলো এখুনি জ্বলবে। আমার ব্যবস্থা আছে।'

শিব ঘর থেকে একটা টেবিল ল্যাম্প এনে বারান্দার পয়েন্টে লাগিয়ে দিল। দূর থেকে দেখলে বড় মনোরম দৃশ্য। বিলেত-টিলেত মনে হতে পারে। গভীর দুটি বেতের বাগান-চেয়ারে শিব আর সুপ্রভা পাশাপাশি। মাঝে সেন্টার টেবিলে নীল শেডে ঢাকা আলো। চাঁদের আলোয় দুধ-সাদা বাগান-পথ। সাদা সাদা ফুলে বাগান ছেয়ে আছে। শান্ত নিরিবিলি, বড় অন্তরঙ্গ একটি দৃশ্য। সুপ্রভার মুখের একপাশে আলো পড়েছে। তীব্র ধারালো মুখ।

শিব বই খুলতে খুলতে বললে, 'পড়াশোনার মত জিনিস নেই। একটা অন্য আবহাওয়া তৈরি হয়ে যায়। হাবোড়তাবোড় গুচ্ছের বই পড়ার চেয়ে নির্বাচিত কয়েকটি বইকে জীবনসঙ্গী করে নিতে হয়। মন-মেজাজ ঘুরে যায়। এই তেল, চাল, ডাল, আলুপটলের জগৎ, পেটমোটা হাঙরের মতো আর গিলতে পারে না।'

'বই আর প্রকৃতি, এই দুটিকে ঠিক মত ধরতে পারলে আমাদের বসবাস সহজ হয়ে যায়।'

'আমার কেবলই তুলসীদাসের সেই কথাটি মনে পড়ে, সব ছাড়োয়ে, সব পাওয়ে। সব যদি ছাড়া যেত। নাঃ, সে আর হল না! সীতারামদাসজীর এই অংশটি শুনুন। শুনলে ভেতরটা ছটফট করে উঠবে :

> কৃষ্ণচন্দ্রের কারাবাসের কথা শুনে বড় দুঃখ হল।
>
> জেলের কষ্ট—ঘানি টানা, গম পেশা, মাটি কাটা। কাজের বিন্দুমাত্র শৈথিল্যে চাবুকের দ্বারা প্রহার। পোড়া ভাত, পোড়া রুটি, পরের পোষাক, পরের কম্বল তাতে কত দুর্গন্ধ! এই রকম কত কষ্ট সহ্য করতে হয়েছে।
>
> এই সব কথা মনের ভেতর তোলপাড় করতে করতে দেখলাম—আমারও জেল হয়েছে। একটা পচা, গলা ঘরে আমায় আটকে রেখেছে, নটা দরজা দিয়ে অবিরত ক্লেদ নির্গত হচ্ছে। —গেলুম, প্রাণ যায়! এ কি! এ কি! এ যে আমি আমাকে ভুলে যাচ্ছি। জেলখানায় ঢুকে ঘরখানাকেই আমি মনে হচ্ছে। ঘর আমি এক জিনিষ নয়, তথাপি এই ২৪ উপাদানে তৈরী আশ্চর্য ঘরকে আমি মনে হচ্ছে। এক মাগী আমার পাহারায় আছে। দিবারাত্র খাটছি তবু মারছে। গেলুম গেলুম— দেখ পিঠে কত দাগ হয়েছে, ওগো আর মেরো না, একবার দুবার নয়—আশী লক্ষ বার তোমার প্রহার সহ্য করেছি। কখন কামের চাবুক মারছ, কখন ক্রোধের, কখন লোভের চাবুক মারছ, কখন মোহের, কখন মদের, কখন মাৎসর্য্যের চাবুক মারছ। দেখ দেখ তোমার প্রহারে আমার পিঠটা রক্তাক্ত হয়ে গেছে—কত যুগ-যুগান্তর আমি কাঁদছি। ও কি খাবার আমায় দিচ্ছ—পচা গলা নারী দেহ! ও খাবার তো একবার নয়—বহুবার খেয়েছি, ও নিয়ে যাও— ও নিয়ে যাও। ও কি খাবার আনছ—পুত্রকন্যা, গৃহদ্বার, আত্মীয়স্বজন! নিয়ে যাও—নিয়ে যাও, ও খাবার আমি খেতে চাই না। ওই সব পোড়া ছাই-ভস্ম খাইয়ে খাইয়ে আমাকে ভুলিয়ে রেখেছ! ওগো তুমি আমায় কি খাওয়ালে! আমি আমাকে হারিয়ে জেলখানা হয়ে গেলুম। আমি যে আমি—আমি যে জেলখানা নই।

সুপ্রভা বললে, 'কে যেন আসছে?'

শিব বই থেকে চোখ তুলল, 'এত রাতে কে বলুন তো?'

'সঙ্গে একজন মহিলা।'

জ্ঞানেশ সামনে এসে দাঁড়াল। নাকে প্ল্যাস্টার। কপালে প্ল্যাস্টার। পার্বতীর হাতে ব্যাণ্ডেজ।

শিব আতঙ্কের গলায় প্রশ্ন করলে, 'এ কি? কি করে এলে? মারামারি?'

'একটু ঝামেলায় পড়ে গিয়েছিলুম মাস্টারমশাই। গাড়িটা ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। আমাদের চেয়ে বেশি আহত হয়েছে গাড়িটা।'

'কি ঝামেলায় পড়লে বলো তো?'

'সে আর আপনার শুনে কাজ নেই। ঘোলাটে যুগের ঘোলাটে ব্যাপার। আজ রাতের মত

পার্বতীকে আপনি এখানে রাখুন। তা না হলে বেচারার জীবন বিপন্ন।'
সুপ্রভা বললে, 'সমস্যাটা কি ?'
জ্ঞানেশ বললে, 'পার্বতী একটা ভাল আশ্রয় খুঁজছে। যে আশ্রয়ে থেকে ও সৎভাবে জীবন কাটাতে পারে।'
'পার্বতী কে ?'
'অতীত ছেড়ে দিন। বর্তমানে ও আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে। আর ওর চারপাশে অপেক্ষা করে আছে অন্ধকার এক জগৎ!'
'ও আমার সঙ্গে যাবে ?'
'কোথায় ?'
'অনেক দূরে ? পুনে।'
শিব বললে, 'জ্ঞানেশ তুমি চেন এঁকে ? তনুর মা।'
'আচ্ছা!' জ্ঞানেশ নমস্কার করল।
সুপ্রভা বললে, 'পার্বতী, তুমি যাবে আমার সঙ্গে ?'
পার্বতী জ্ঞানেশের পাশটিতে মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে আছে। কিছুই তার নেই। থাকার মধ্যে আছে সুঠাম এক দেহ। জলে পড়ে আছে। ঝাঁক ঝাঁক হাঙর তেড়ে আসছে ছিঁড়ে খাবার জন্যে। কোথাও একটা স্বপ্ন আছে। এক ছিটে শুভ সংস্কার।
'কি, যাবে ?'
পার্বতী দৃঢ় স্বরে বললে, 'হ্যাঁ যাব মা।'
'খাটতে পারবে ?'
'পরীক্ষা করে দেখবেন।'
'নিরামিষ খেতে হবে।'
'কোনও ব্যাপার নেই। খানাকে বাত ছোড়িয়ে।'
'বহত্ আচ্ছা। সিনেমা দেখা চলবে না।'
'ও ভি ঠিক হ্যায়।'
'যে কাজ বলব, সেই কাজই করতে হবে, হাসি মুখে।'
'ও ভি ঠিক হ্যায়।'
'চলে যাও ভেতরে। তোমার ভার আমি নিলুম। হাত ভেঙেছে না কেটেছে ?'
'কেটেছে।'
'ওষুধ ?'
জ্ঞানেশ বললে, 'সঙ্গে আছে। আমি তাহলে যাই এখন। জ্বর আসছে।'
'কাল তোমার খবর নোব।' শিব উঠে দাঁড়াল, 'কি বিশ্রী ব্যাপার দেখ তো!'
'বেঁচে থাকলে, কত কি হবে মাস্টারমশাই! আর কি সে-যুগ আছে!'
গেট পর্যন্ত জ্ঞানেশকে এগিয়ে দিয়ে এসে শিব আবার বেতের চেয়ারে বসে পড়ল। রক্তারক্তি দেখলে ভেতরটা কেমন হয়ে যায়। চাপা আলোয় শিবের গৌরবর্ণ মুখ মায়াময় দেখাচ্ছে। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে, 'ঠিকই, অসারে খলু সংসারে সারমেতচ্চতুষ্টয়ম্। কাশ্যাং বাসো সতাং সঙ্গো গঙ্গামভঃ শম্ভুসেবনম্॥ আহা! অসার সংসারে চারটি মাত্র সার—কাশীবাস, সাধুসঙ্গ, গঙ্গাজল, শম্ভুসেবা। নাঃ, চলুন, আমিও আপনার সঙ্গে যাব। বাস্তু ঘুঘু হয়ে আর কতকাল পড়ে থাকব।'
'এই কথাটাই আপনাকে বোঝাতে চাইছিলুম। কোটর ছেড়ে বেরিয়ে আসুন। এখনও কত কি করার আছে!'
'ঠিক বলেছেন। মাঝে মাঝে ঘুম এসে যায়। সীতারামদাসজীর এই কবিতাটিতে বড়

উদ্দীপন হয় :

নিত্য মুক্ত বুদ্ধ তুমি অনন্ত অব্যয়।
রবি শশী তারা তুমি—তুমি গ্রহচয় ॥
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ওই তোমারে ঘেরিয়া।
ঘুরিতেছে কত যুগ নাচিয়া নাচিয়া ॥
হে চিন্ময় মহা জ্যোতিঃ ভুলিয়া স্বরূপ।
জীব সাজে কর খেলা—বড় অপরূপ !
দেহ অভিমান ত্যজি, স্বরূপে আপন।
কর অভিমান তুমি, যাইবে বেদন ॥
জাগরে নিদ্রিত জীব জাগ একবার।
জাগিলে পাবিরে তুই শান্তি পারাবার ॥
জয় গুরু গুরু জয়—অনিবার বল।
রবে না ভাবনা কিছু, পাবি প্রেম ফল ॥'

'বাঃ সুন্দর। সুরে বসিয়ে ধ্রুপদ হিসেবে গাওয়া যায়। পুনেতে গিয়ে চেষ্টা করা যাবে। আপনি বসুন। আমি ভেতরে যাই। দেখি মেয়েটা কি করছে।'

সুপ্রভা উঠে পড়ল। শিব সুইচ টিপে আলো নেবাল। চমৎকার চাঁদের আলোয় চরাচর ভেসে যায়। শিব একই সঙ্গে সুপ্রভা আর সুধার কথা ভাবছে। সুপ্রভা যেন বাতাসের মত সহজ, স্বচ্ছন্দ। কোথাও কোনও জড়তা নেই। যা ধরে, যাকে ধরে, একেবারে হাতের মুঠোয় ধরে। বয়েস ক্রমশ বাড়ছে না কমছে বোঝাই যায় না। মেয়েলীপনা নেই বললেই চলে। কথাবার্তা,চালচলন, ভাবভঙ্গী একেবারে খাড়া, স্ট্রেট। 'ঘুরে আসা যাক দিনকতক ! দেখাই যাক না কি হয় !'

মাথাটা পেছন দিকে এলিয়ে দিয়েছে শিব। ঘুম ঘুম লাগছে। হাল ছাড়া নৌকোর মত জলে যেন ভাসছে। হঠাৎ সাত্যকির কথা মনে পড়ছে। কার যে কখন শেষ লেখা থাকে ! কোথায় গিয়ে ফুরিয়ে যাবে, জানার উপায় নেই। মাটির গভীরে, কাঠের কফিনে সাত্যকি কেমন শুয়ে আছে ! এত চাঁদের আলো, এই ফুল ফোটার আয়োজন, সাত্যকি আর দেখবেও না, শুনবেও না।

শিবের মাথাটা ক্রমশই হেলে যাচ্ছে পেছন দিকে। সুপ্রভা মাথায় আলতো হাত রাখতেই শিব সোজা হয়ে বসল। সুপ্রভা হাত না সরিয়ে বললে, 'ঘুম পেয়ে গেছে। ইজি চেয়ার পেতে দোব ?'

মাথায় রাখা সুপ্রভার হাতের গোল কবজি নিজের ডান হাতের মুঠোয় ধরে শিব বললে, 'বয়েস হচ্ছে তো, সারা দিনের পর এই সময়টায় ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাতাস বয়, একটু ক্লান্ত হয়ে পড়ি। কি চাপিয়ে এলেন ?'

'ভাত।'

সুপ্রভা পাশের চেয়ারে বসল। গুনগুন করে ভজন গাইছে— 'হে গোবিন্দ, হে গোপাল।'

'পার্বতীকে কোথায় রেখে এলেন ?'

'ওকে চানে পাঠিয়েছি। পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না হলে কিছু করান যাবে না।'

'কি বুঝছেন ?'

'খারাপ না। চাপা আগুন আছে ভেতরে। তবে শিক্ষা নেই। আনকাট। কাটতে হবে। তা না হলে জেল্লা দেবে না।'

সুপ্রভা গুন গুন করতে করতে ভেতরে চলে গেল। ভেতর থেকে ছোটখাট সাংসারিক শব্দ ভেসে আসতে লাগল। শিবের মনে হচ্ছে তার মনের পেছনের দিকের দরজাটা যেন খুলে

গেছে।

কাউন্টারে চাবি জমা দিয়ে, দেনাপাওনা মিটিয়ে জলো বেরিয়ে এল পথে। এপাশ, ওপাশ তাকাল। সন্দেহজনক কিছু চোখে পড়ল না। তবু কেমন যেন মনে হচ্ছে। কে যেন বলছে, 'সতর্ক হও, সতর্ক হও'। জলো টুক করে ঢুকে পড়ল গাড়ির সামনের আসনে। স্টার্ট করে সামনে এগোতে গিয়েই চমকে উঠল। স্টার্ট বন্ধ করে দিল। চারটে চাকারই হাওয়া কে বা কারা খুলে দিয়ে গিয়েছে।

জলোর স্নায়ু এখন টান টান স্প্রিং-এর মতো হয়ে গেছে। পরেশ সাহা কলকাঠি তাহলে নেড়েছে ' সুনীত বোসের সঙ্গে হাত মেলানোও অসম্ভব নয়। মাফিয়াদের যৌথ পরিবার বেশ শক্তিশালী। জলো রাস্তার দিকে সতর্ক নজর ফেলল। সব স্বাভাবিক। দোকানপাট খোলা। ফটফট আলো। লোকজনের আসা-যাওয়া।

পেছন দিক থেকে একটা মিনিবাস আসছে। জলোর মস্তিষ্ক খুব দ্রুত কাজ করছে। সিদ্ধান্ত নিতে এক সেকেণ্ডও দেরি হল না। বেরিয়ে এসে দরজাটা লক করল। গাড়িতে পিঠ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মিনিটা সামনে আসতেই লাফ মেরে ঢুকে গেল ভেতরে। বেশ ভিড়। পাশ কাটিয়ে কাটিয়ে একেবারে পেছনে। জলো যেন শিশির ভেতর ক্যাপসুল। মানুষের তুলো দিয়ে ঠাসা।

মিনি উর্ধ্বশ্বাসে ছুটেছে জলপাইগুড়ির দিকে। দেখতে দেখতে পেছন আরও পেছনে চলে যাচ্ছে। পথের পাশে থাক পড়ে মরিস-এইট। জলপাইগুড়িতে অক্ষত পৌঁছতে পারলে থাকার অনেক জায়গা আছে। প্ল্যান্টার্স ক্লাবে রাতটা কাটাতে পারে। বাসন্তী আছে। সেখানেও থাকা যায়। কোনও রকমে একবার ভুটানে ঢুকতে পারলে, সুমিতা আছে গ্যাংটকে।

ঠাঁই আছে। দপ করে ফুরিয়ে না গেলে আবার শুরু থেকে শুরু করার সুযোগ মিলতেও পারে। জলো হঠাৎ বসার আসন পেয়ে গেল।

মিনি হু হু ছুটছে। জলোর স্নায়ু ধীরে ধীরে শিথিল হয়ে আসছে। ছেলেবেলার একটা ঘটনা মনে পড়ছে। মাছ কিনে বাড়ি ফিরছিল আপন মনে। হঠাৎ একটা চিল এসে ছোঁ মারল। শালপাতায় মোড়া মাছ ছড়িয়ে পড়ল পথে। কোনও রকমে কুড়িয়ে উঠে দাঁড়াতেই আবার ছোঁ। সেদিন কি ভাবেই না চিলের আক্রমণ বাঁচিয়ে মাছ নিয়ে বাড়ি ফিরেছিল! এই মারে। বুঝি এই মারে!

জীবন নিয়ে আজও সেই অবস্থা।

মিনি ছুটছে। দুপাশে জঙ্গল। চাঁদের আলোয় ঝলমল করছে। ঠাণ্ডা বাতাসের ঝাপটা।

দেবী জানলার ধারে ছোট টেবিলে বসে চিঠি লিখছে। মন-মেজাজ ভীষণ খারাপ। তোতা ঘুমিয়ে পড়েছে। একটু আগে ভীষণ বায়না করছিল। ধৈর্য রাখতে পারেনি। আচমকা গালে দুটো চড় মেরেছিল। মেয়ের কান্না আর থামে না। ফোঁপাতে ফোঁপাতে এক সময় ঘুমিয়ে পড়েছে। দেবী আর পারছে না। চারপাশ থেকে লোভের হাত এগিয়ে আসছে। মেয়ে থেকে মেয়েমানুষ করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে পুরো দমে।

সামনে পা ছড়িয়ে দেয়ালে পিঠ রেখে দুর্গা সমানে ঢুলছে। আহা। সারাদিন বেচারা খুব খাটে।

দেবী লিখছে:

স্নেহের সুস্মিতা,

তুই আমাকে ভুলেছিস। আমি তোকে ভুলিনি।

তিন মাস আগে তোর চিঠি পেয়েছি। তারপর সব চুপচাপ। ভালই। সুখে আছিস। সুখে

থাক। দেবীদির কথা মনে রেখে কাজ কী ? তোর ওপর সত্যিই আমার খুব অভিমান হয়েছে। ভেবেছিলুম লিখব না কিছু। পারলুম না। মনের কথা কাকে জানাব বল ? কে আছে আমার ?

শোন, চাকরিটা মনে হয় ছাড়তেই হবে আমাকে। আমি কিছুতেই নিচে নামতে পারব না। আগের চিঠিতে তোকে বলেছিলুম, আমাদের অফিসের বড় কর্তার নেকনজরে জীবন অতিষ্ঠ হয়ে গেল। লোভ আর ভয় দুটোই দেখাচ্ছে। বিপত্নীক। একটি ছেলে। একটি মেয়ে। ভালো স্কুলে, হস্টেলে থেকে পড়াশোনা করে। ভদ্রলোককে দেখতে ডনজুয়ানের মতো। সাজের খুব ঘটা। চড়া বিলিতি সেন্টের খুশ্‌বু। তরল পদার্থ ভালই চলে। অনবরত ঘরে ডেকে পাঠাবেন কাজের ছুতো করে। আবোলতাবোল বকবেন। আর বলবেন, চলো না দিনকতক বেড়িয়ে আসি কোথাও। অফিসে এই নিয়ে কানাকানি, হাসাহাসি। আমি ভাল করে কারুর দিকে মুখ তুলে তাকাতে পারি না। সব দৃষ্টিতেই নোঙরা একটা ইশারা। হয় আমাকে চাকরি ছাড়তে হবে, না হয় ছাড়তে হবে ধর্ম। বেপরোয়া হয়ে যেতে হবে। আমার পক্ষে তা সম্ভব নয়।

এ পাড়ায় যে মানুষটিকে আমি পিতার চেয়েও শ্রদ্ধা করতুম, ভালবাসতুম, তাঁর কাছ থেকেও সরে আসতে হল। ভদ্রলোকের সংসার ভেঙে গেছে। ছেলে-বউ বৃদ্ধকে ত্যাগ করে সরে গেছে। দেবতুল্য সেই মানুষটি আমাকে তাঁর বাড়িটি দান করে দিতে চান। এ এক বিশ্রী প্রস্তাব। ছেলে তার বউ নিয়ে সরে গেছে। বিশাল চাকরি। সাজান ফ্ল্যাট। তা হোক না। অধিকার তো তার। বৃদ্ধের হঠকারিতার তো অন্য অর্থ হবে ! প্রাণের টানে তাঁর সেবা করি। তারই কত কদর্থ ! পাড়ায় কান পাতা যায় না। বলে, বুড়োকে ভজাবার চেষ্টা করছে বিধবা মাগী। পুরুষের আবার বয়েস আছে ! সব বয়েসেই মেয়েছেলে চাই। কি বলব বল ? এবার আমি সত্যিই পাগল হয়ে যাব। ঈশ্বরের কাছে রোজই আমার প্রার্থনা—বুড়ি করে দাও। কুৎসিত করে দাও। যৌবন এক জ্বালা। মাছির ভ্যানভ্যানানিতে তিষ্ঠনো দায়। এখান থেকে আমাকে সরতে হবে। কোথায় যাই বল তো ! কার কাছে যাই ? মেয়েটাকে নিয়ে সমস্যায় পড়ে গেছি। বড় হচ্ছে। মানুষ করতে হবে।

শোন, এক মাস ছুটি নিয়েছি। ভাবছি তোর কাছে গিয়ে দিন কতক থাকব। বিরক্ত হবি না তো ! অনেক পরামর্শ আছে তোর সঙ্গে। অনেক কাজের কথা। ভাবছি মেয়েটাকে তোর কাছে রেখে আসব। তোর স্কুলেই পড়বে। এ পাড়াটা সুবিধের নয়। দিনকাল খুব খারাপ। তোর উত্তর আসার আগেই আমরা বেরিয়ে পড়ব। ভালবাসা নিস। ইতি তোর দেবী।

ঘন ঘন বোমার শব্দে দেবী চমকে উঠল। খুব কাছেই কোথাও হাঙ্গামা শুরু হয়েছে। রাস্তায় ছোটাছুটি। দোকানপাটের ঝাঁপ টানছে। দেবী চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল। দুর্গার ঘুম ছুটে গেছে। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে আছে খোলা জানালার দিকে।

'দিদি কি হচ্ছে গো ? ভারত জিতেছে বুঝি ?'

দেবী জানালা দিয়ে উঁকি মারছে বাইরে। দেখতে পাচ্ছে, ভুতো আসছে। একটু করে ছুটছে, আবার দাঁড়াচ্ছে। আবার ছুটছে। দেবী ডাকল, 'ভুতো, এই ভুতো !'

ভুতো উঠে এল সামনের রকে।

'কি হয়েচে রে ?'

'টেরিফিক কাণ্ড। জলোদার বাড়ি অ্যাটাক করেছে।'

'কে জলো ?'

'ওই যে গো যার দাদা শশধর। তোমার বাড়িতে আসত। মায়ের ভোগে পাঠিয়ে দিয়েছে।'

'কাকে ? জলোকে ?'

'না না, শশধরকে।'

'সে কি রে ?'

দেবীর শরীরে একটা কাঁপুনি ধরে গেল। যেন শীত করে জ্বর আসছে। ভুতো রক থেকে রাস্তায় লাফিয়ে পড়ে যেদিক থেকে এসেছিল সেই দিকে দৌড়ল। দেবী জানালাটা বন্ধ করে টেবিলের সামনে চেয়ারে বসল। গুম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। 'কি সর্বনাশ! একটা নিরীহ, পরোপকারী লোক। কি আশ্চর্য!'

চিঠিটার তলায় কাঁপা কাঁপা হাতে লিখল :

পুনশ্চ : সুস্মিতা, এইমাত্র কি সব হয়ে গেল এখানে। আমি কালই রওনা হবার চেষ্টা করছি। না, কাল কি করে হবে। ধর পরশু। তুই ওখানে আমার যদি যাহোক একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারিস তাহলে আমি আর নরকে ফিরতে চাই না।—দেবী।

ঊর্ধ্বশ্বাসে একটা জিপ ছুটে গেল। যা হয়। সর্বনাশ হয়ে যাবার পর শুরু হয় পুলিশের ছোটাছুটি। শশধর! দেবী কেঁদে ফেলল। হঠাৎ মনে হল, ভুতো কতটুকু জানে? শশধরকে কেন মারবে? সে কি সমাজবিরোধী! বাউণ্ডুলে মানুষ। কতক্ষণ বাড়ি থাকে? সব বাজে কথা। মাস্তানে মাস্তানে হচ্ছে। পুলিস তো বলেইছে, কাঁটা দিয়ে কাঁটা তোলা।

দেবী দুর্গাকে বললে, 'নে ওঠ! রাত হয়েছে। এখুনি হয়তো আলো নিববে। আয় খাওয়ার পাট চুকিয়ে নি।'

আবার গোটা দুই বোমার শব্দ। আর একটা গাড়ি গেল। পাড়া নিস্তব্ধ। একটু আগে কোথাও গান বাজছিল। থেমে গেছে।



॥ চৌত্রিশ ॥

সকাল। মেঘলা মেঘলা। ভিজে ভিজে বাতাস ছেড়েছে। সুপ্রভা ভোরে উঠেই চলে গেছে। স্যুটকেস রেখে গেছে। সাইড ব্যাগে টুকিটাকি কিছু নিয়ে গেছে। যাবার সময় শিবকে বলে গেছে, প্রস্তুত থাকবেন। তনুকে নিয়ে প্রথমে এখানে আসব, তারপর প্লেনে যাব আমরা। ট্রেনে বড় সময় লাগে। রিজারভেশানের ঝামেলা।

প্লেনে শিব এই প্রথম চাপবে। ছেলেমানুষের মতো আনন্দ হচ্ছে। যাক যাবার আগে দেহ তবু পাখি হয়ে ওড়ার স্বাদ পাবে। অনেক খরচ। সুপ্রভা কি করে সামলাবে! ভাবতে বারণ করেছে। ঠিক আছে, ভাববে না।

পার্বতী চা এনেছে। সামনের টেবিলে রেখে গেল। পার্বতী কথা বলে কম। সব সময় হাসি লেগে আছে মুখে। কোথায় ছিল। কোথায় এসে গেল। আবার যাবে কোথায়!

কৃষ্ণ আসছে। ফর্সা কপালে রক্তচন্দনের টিপ। মন যা দেখে দেখে অভ্যস্থ হয়, আজীবন তাই দেখতে চায়। কৃষ্ণকে রোজ সকাল সন্ধে দেখতে না পেলে মনে হয় শূন্য জীবন। বাগানের গাছপালা। রোজ দেখা চাই। দোতলার বারান্দা থেকে পশ্চিমের আকাশ দিনান্তে একবার দেখা চাই। রোজ সকালে যে দুধ দেয় তার সঙ্গে একটু বকবক করা চাই।

কৃষ্ণ চেয়ার ঠেলে বসতে বসতে বললে, 'বাঁশি কেন উদাস এমন!'

'নাও, চা খাও।'

'চা তো খাবই রে ভাই। তোর চোখ দুটো বেশ লাল হয়েছে। রাতে ভাল ঘুমোসনি বুঝি!'

'ঘুমিয়েছি। তিন চার বার ভেঙেও গেছে। একের পর এক স্বপ্ন। খুব ছটফটে রাত গেছে।'

'স্নান করে আয়। ভালো লাগবে।'

'বুঝলে দাদা, দিনকতক ঘুরেই আসি।'

'কোথায় যাবি ?'

'ওই যে তোমাকে বলছিলুম, সুপ্রভা বারে বারে অনুরোধ করছেন। পুনে। জায়গাটা নাকি অসাধারণ সুন্দর। শান্তির একটা আশ্রয়ও আছে।'

'যা যা ঘুরে আয়। মাঝে মাঝে বাইরে যাওয়া ভাল। মন ভাল হয়।'

'প্রথমে বেশ উৎসাহ লাগছিল। প্লেনে চাপার আনন্দে ভেতরটা লাফাচ্ছিল। এখন আবার খারাপ লাগছে।'

'কেন রে ভাই ?'

'তোমাকে ছেড়ে কোথাও আর যেতে ইচ্ছে করে না। এই সকাল, সন্ধে, দুপুর। কত কথা। কত খেলা !'

'হ্যাঁ রে। তাই তো। এটা তো ভেবে দেখিনি। তুই চলে গেলে, আমি কি করব রে! মরে যাব যে রে! কত দিন থাকবি ?'

'মাস খানেক। কি বলো! এক মাসের বেশি থাকা যায় না। পাগল হয়ে যাব।'

কৃষ্ণ কিছুক্ষণ গুম মেরে বসে রইল। তারপর বেশ জোর গলায় বললে, 'যা ঘুরেই আয়। পুনেতে আমি বেশ কিছু কাল ছিলুম। বড় সুন্দর যায়গা। যা ঘুরেই আয়। এক মাস তো।'

'তুমি বাড়িটা দেখবে তো!'

'হ্যাঁ রে, নিশ্চয় দেখব। সকাল, সন্ধে। সে তুই ভাবিসনি। সন্ধেবেলা আলো জ্বেলে চুপচাপ বসে থাকব।'

'বাগানটাও একটু দেখো। সপ্তাহে একবার পরান এসে পরিষ্কার করে দিয়ে যায়। তোমাকে ঝ্যাঁটা কোদাল ধরতে হবে না।'

'আরে তাতেও আমি পেছপা নই। এই দ্যাখ, এখনো হাতের গুলো দেখ, ঠেলে উঠছে।' পর পর দু'কাপ চা খেয়ে খানিক গল্পগুজব করে কৃষ্ণ চলে গেল। যাবার সময় বাগানটা একবার ঘুরে গেল। কাঠবেড়ালির লুকোচুরি চলেছে।

শিবের আজ আর কিছুই করার নেই। একেবারে অবসরভোগীর জীবন। পার্বতীই সব করছে। পাশবই আর চেকবই নিয়ে শিব বেরিয়ে পড়ল। ব্যাঙ্কে যাওয়া দরকার। বেশ কিছু টাকা পয়সা সঙ্গে নিতে হবে। তা ছাড়া পাশবইটা অনেক দিন জমা দেওয়া হয়নি।

পাড়াটা বেশ থম থম করছে। মাস্তানরা আবার জেগে উঠেছে। বেশ সব ঘুমিয়ে পড়েছিল। যখন হয় তখন হয়। মানুষ আজকাল কোনও কিছুই গ্রাহ্য করে না। একটা শিশুও আজকাল কত বেপরোয়া। পেছন থেকে একটা গাড়ি আসছে। শিব পাশে সরে গেল। আপন খেয়ালে আছে। গ্রাহ্য করেনি। হঠাৎ গাড়ির ভেতর থেকে চিৎকার ভেসে এল, 'দাদাই। দাদাই।'

'তোতার গলা না !'

দশ বারো হাত তফাতে গাড়িটা থামল। বাঁ দিকের দরজা খুলে নেমে এল দেবী। লাফিয়ে নামল তোতা। তোতা ছুটে এসে শিবের কোমর জড়িয়ে ধরল।

'কোথায় চললে তোমরা ? তোমরা আর আস না ! হ্যাঁ মা, কোনও অপরাধ করিনি তো !'

দেবী পায়ের ধুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল। চোখে জল। কি উত্তর দেবে ? পৃথিবীর নোঙরা কথা কি আর শোনাবে ঋষির মতো এই মানুষটিকে !

'বাবা, আমরা দিন কয়েকের জন্যে বাইরে যাচ্ছি।'

'আচ্ছা। বেড়াতে যাচ্ছ। বেশ বেশ। ফিরবে কবে ?'

'এক মাস।'
'আমিও কাল যাচ্ছি।'
'কোথায় যাচ্ছেন বাবা ?'
'পুনে।'
'আমরা আসি বাবা !'
'এসো এসো। বেশ আনন্দে থেকো। দুর্গা। দুর্গা।'
ওরা গিয়ে গাড়িতে উঠল। তোতা জানালা দিয়ে তাকিয়ে আছে। গাড়ি সরে যাচ্ছে দূরে। পথের বাঁকে মিলিয়ে গেল।
শিব হাঁটতে হাঁটতে ভাবছে, এই এক একটা সময় আসে। যখন সবাই চলে যেতে চায়। বসবাস যেন হাটের মতো। এই খুব জমজমাট। এই আবার ফাঁকা, ভোঁভাঁ।

বেলা তিনটের পরই শিব আর পার্বতী গোছগাছ শুরু করে দিলে। বেশি তো কিছু নেবার নেই। একজন মানুষের বিশেষ কিছুই তো লাগে না। দীর্ঘকাল বাঁচার ফলে অনেক অপ্রয়োজনীয় অনুষঙ্গের আবর্জনা জমে ওঠে জীবনের চারপাশে। না হলেও চলে। ফেলতেও মায়া লাগে। এই আর কি। এই সব নিয়ে বাঁচতে বাঁচতে মরে যাওয়া।
পার্বতীর মহাচিন্তা, বেড়ালগুলোর কি হবে ? একেবারে বাচ্চা সবে চোখ ফুটেছে।
শিব বললে, 'এই বাড়িতেই থাক। সকাল, বিকেল দাদা তো আসবে। তখন একটু দুধটুধ দিয়ে যাবে।'
সন্ধের মুখে গোছগাছ সব শেষ হয়ে গেল। দোতলার ঘরের জানলা, দরজা, ছাদের দরজা, সব বন্ধ করা হল। তালাও পড়ে গেল। বাইরে থেকে কেউ যেন না ঢুকে পড়ে।
শিব বাগানে। বড় মায়া। কে বলেছে শুধু গাছেরই শিকড় নামে। মানুষেরও অসংখ্য অদৃশ্য শিকড় নেমে আসে, সংসারের গা বেয়ে বটগাছের মত। পাঁচিলের কোণে অন্ধকার, ছায়াময় অংশে সার সার ক্যাকটাস আর ফার্ন বসিয়েছিল। গোড়ায় গোড়ায় নুড়ি বিছিয়ে বেশ একটা পরিবেশ তৈরি করেছিল। এক রকমের খেলাই বলা চলে।
শিব গাছগুলোর সামনে উবু হয়ে বসে আছে। ছোট ছোট পোকা লাফাচ্ছে এখানে ওখানে। একটা দোয়েল বাসায় ঢোকার আগে দিন শেষের গান কণ্ঠভরে গেয়ে নিচ্ছে। একটা কাঠি দিয়ে শিব নুড়িগুলোকে খোঁচা মারছে। নাড়াচাড়া করছে। ভিজে ভিজে মাটি মাটি গন্ধ বেরোচ্ছে। 'কেন যে এত মন খারাপ হচ্ছে কে জানে ! একেই বলে ভেতো বাঙালী।'
ভাবতে ভাবতে শিব সারা বাগানটা একবার ঘুরে এল। সুধা পুঁতেছিল পোস্টমাস্টার ক্রোটন। কি বড় হয়েছে ! কি বাহার ! গাছটার দিকে শিব এমন ভাবে তাকিয়ে রইল যেন সুধাকেই দেখছে। শিব হয়তো আরও কিছুক্ষণ বাগানেই থাকত। সামনের দরজার কড়া নড়ে উঠল।
শিব শুনতে পাচ্ছে, 'কাউন' বলে পার্বতী দরজা খুলল। তারপর চাপা একচিলতে চিৎকার। বেরোবার আগেই থেমে গেল। যেন চাপা পড়ে গেল।
'কি হল ? ডাকাতি, গুণ্ডামি ! একালে সবই সম্ভব।'
পেছনের বাগান থেকে শিব তাড়াতাড়ি ঘর পেরিয়ে সামনের বারান্দায় ছুটে এল। সদর হাট খোলা। কেউ কোথাও নেই। সামনের রাস্তায় গাড়ির স্টার্ট নেবার শব্দ। শিব ছুটে গেটের কাছে গেল। একটা গাড়ি চলে যাচ্ছে। লাল রঙ।
শিব চিৎকার করল. 'পার্বতী !'
গাড়ির ভেতর থেকে জ্বলন্ত একটা সিগারেটের টুকরো শিবের গায়ে এসে পড়ল। ছ্যাঁক করে উঠেছ। পাগলের মতো হয়ে গেছে। কি করবে ভেবে পাচ্ছে না। রাস্তায় নেমে ছুটে গেল

সামনের দিকে উদ্‌ভ্রান্তের মতো। গাড়ি তখন কোথায়! শেষ বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেছে।

রাস্তার পাশে শিব কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল বোকার মতো।

দিনটা ভারি সুন্দর। ঝন ঝন করছে।

গেটের সামনে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তনুর আপত্তিতে শেষ পর্যন্ত ট্রেনে যাওয়াই স্থির হয়েছে।

পার্বতী নেই। এসেছিল। সামান্য দু-একটা স্মৃতি ফেলে রেখে চলে যেতে বাধ্য হয়েছে। শিব জ্ঞানেশের কাছে ছুটেছিল। জ্ঞানেশ প্রায় শয্যাশায়ী। বিরক্ত। বলেছে, যার যা ভাগ্য। কিছু করার নেই।

স্রোতে ভেসে যেতে হবেই। চেষ্টা করেছিলুম। মার খেয়েছি। বাঁচাতে পারিনি। মিটে গেছে।

শিব তর্ক করেনি। কথা বাড়ায়নি। সত্যিই তো, পৃথিবীর সব অনাচারের প্রতিকার কি সম্ভব! তনু আর কৃষ্ণ গাড়িতে মালপত্র তোলার তদারকি করছে। তনুকে তো বেশ সুস্থই দেখছে শিব। সুপ্রভার বয়েস যেন বছর বারো কমে গেছে।

তেমন বেশি কিছু মোটঘাট নেই। কৃষ্ণ বিশাল বড় একটা ফ্লাস্কে চা করে এনেছে। ট্রেনে সবাই খাবে। ট্রেনের চা তেমন সুবিধের নয়।

গাড়িটা ট্যাক্সি নয়। প্রাইভেট কার। সুপ্রভার এক ছাত্রীর বাবা, কলকাতার ব্যবসাদার— গাড়িটা তিনিই দিয়েছেন। টিকিটের ব্যবস্থাও তিনি করে দিয়েছেন।

সুপ্রভা, তনু একে একে কৃষ্ণর পায়ের ধুলো নিল। শিব নিচু হচ্ছিল, কৃষ্ণ খপ করে দু'হাত ধরে বিরাট বুকে জড়িয়ে নিল।

কৃষ্ণর নিঃশ্বাস পড়ছে জোরে জোরে। কথা বলতে পারছে না। আবেগে ভেতরটা কেমন করছে। অনেক রকম আশঙ্কা। অদ্ভুত একটা শূন্যতার বোধ। এই ভাইটাই তো ছিল একমাত্র সঙ্গী। 'কি নিয়ে থাকবো! আর কি দেখতে পাবি আমায় ফিরে এসে!' কৃষ্ণ ভাবছে, আর শিবের চোখের দিকে তাকিয়ে আছে এক দৃষ্টিতে। শিবেরও সেই এক অবস্থা। কথা বলতে গেলেই সে যে ভেতরে ভেতরে কাঁদছে তা ধরা পড়ে যাবে। দাদার চোখের দিকে তাকিয়ে আছে।

সুপ্রভা মৃদু গলায় বললে, 'আসুন।'

তনু শিবের হাত ধরল।

সবাই গাড়িতে উঠে পড়েছে। স্টার্ট নিচ্ছে গাড়ি। শিব দেখতে পাচ্ছে কৃষ্ণ দাঁড়িয়ে আছে সদরের পইঠেতে। হাতের আঙুলে দুলছে বাড়ির চাবি। কৃষ্ণের ঠোঁটে হাসি। চোখে জল। শিব হাত নাড়ল। গাড়ি ধীরে এগোচ্ছে। এ পাশের জানলায় শিব, ওপাশে সুপ্রভা। মাঝে তনু। ড্রাইভার অ্যাকসিলারেটারে চাপ দিয়েছে।

হঠাৎ শিব বললে, 'থামান। থামান গাড়ি।'

গাড়ি থামল। সুপ্রভা বললে, 'কিছু ভুলে এলেন!'

'হ্যাঁ। ব্যাক করুন। অসুবিধে হবে?'

ড্রাইভার ব্যাক করে গাড়িটাকে আবার গেটের সামনে নিয়ে এল। শিব নামছে। কৃষ্ণ বললে, 'এই দ্যাখো, কি আবার ভুললি?'

'তোমাকে।'

'তার মানে?'

'অসম্ভব, তোমাকে ছেড়ে আমি থাকতে পারব না। আপনারা যান।'

সুপ্রভা নেমে এল, 'সে কী! আপনি এত দুর্বল!'

শিব একটা মনের মত সিদ্ধান্তে আসতে পেরে শক্তি, আনন্দ, দুই-ই ফিরে পেয়েছে। হাত জোড় করে বললে, 'বেয়ান, এইখানেই আমার গত পঞ্চাশ বছরের বসবাস। এইখানেই উপন্যাসের শুরু আর এইখানেই শেষ।'

কৃষ্ণ আনন্দে হাসছে। আঙুলের চাবি বন বন ঘুরছে। তনুকে নিয়ে সুপ্রভা চলে যাচ্ছে। উপায় কি? গাড়ি চলে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। পথের বাঁকে।

সন্ধেবেলা। কৃষ্ণ হাসছে হাহা করে। সামনে দাবার ছক।

'বুঝলি শিব, এই ভাবেই লেখা হবে আমাদের ইতিহাস। একদা এক শহরে—দুই বৃদ্ধ ছিল—তাদের দু'জনকে কেউ আলাদা করতে পারেনি। শুধু মৃত্যু এসে . । নে, নে, চাল দে। চাল। চালে ভুল করিসনি।'
